ভারতীয় অর্থবিদ্যা

[প্রথম খণ্ড]

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন
এম্. এ. ; এম্. এস্-সি. ইকন্ (লণ্ডন) ; ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল
প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

প্রকাশক
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে—
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

চতুর্থ সংস্করণ
মার্চ — ১৯৬০

মুদ্রাকর :—
শ্রীলালমোহন দত্ত
সাধনা প্রেস
৩।১।১ ঘোষ লেন
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বি. এ. এবং বি. কম্ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারতীয় অর্থবিদ্যার উপর পাঠ্যপুস্তক ‍াতীয় গ্রন্থের অভাবই আমাকে বর্তমান রচনায় প্রণোদিত করে। এই প্রসংগে ইহাও ‍ল্লেখযোগ্য যে, বহু অধ্যাপক বন্ধু এ-বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন ও বহু ‍াত্রছাত্রী আমাকে অনুরোধ করিয়াছে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সংগে ‍ংগেই ইহা একরূপ পুরাতন হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক ত্রুটি দূরিকরণের কোন উপায় ‍াই। তবুও বলিতে চাই যে, ছাপাখানার পর্যায় অবধি যতদূর সম্ভব ততদূর বিষয়বস্তুর ‍রিবর্তনশীলতার সহিত সংগতি রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বর্তমান গ্রন্থে বিষয়বস্তু আলোচনা সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-‍্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করিবার চেষ্টা করিয়াছি কারণ ইহাই আমাদের বর্তমান অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তথ্যাদি বিশ্লেষণের সময় আমি যথাসম্ভব ‍বশেষ দৃষ্টিভংগি পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি; গ্রন্থখানি যাহাতে ব্যক্তিগত মতবাদে ‍ারাক্রান্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। প্রচেষ্টার ত্রুটি এবং গ্রন্থখানির উন্নয়নের ‍ন্য সহকর্মী অধ্যাপকগণের সকল প্রকার মতামত সাদরে আহ্বান করিতেছি।

সিটি কলেজ, কলিকাতা
৩রা আগষ্ট, ১৯৫৫

অরুণকুমার সেন

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

একরূপ অল্প সময়ের ব্যবধানেই গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যেই ‍ারতীয় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর যে-পরিবর্তন ঘটিযাছে তাহা একরূপ অবর্ণনীয়। এখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে, তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকার্যও একপ্রকার ‍ায এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রিপোর্ট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। স্বভাবতই এই সকল ‍রিবর্তনের ভিত্তিতেই বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জনাকায করিতে হইয়াছে।

বর্তমান দিনে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা একপ্রকার নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে ‍লা হয়। এই আলোচনা এখন অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়। ‍র্তমান সংস্করণে এই রীতিও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার যে-সকল সহকর্মী ‍ন্ধু তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ‍ধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিটি কলেজ, কলিকাতা
৭ই মার্চ, ১৯৬০

অরুণকুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র

(Nature and Scope of Indian Economics)

আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় অর্থবিদ্যা। অনেকে প্রশ্ন করেন, "ভারতীয় অর্থবিদ্যা আবার কি বস্তু?" ব্রিটিশ মার্কিন ফরাসী অথবা চৈনিক অর্থবিদ্যা বলিয়া ত' কোন শাস্ত্র নাই। অর্থবিদ্যা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূল তত্ত্বগুলি সর্বত্রই প্রযোজ্য। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে অথবা শিল্পোন্নত ও কৃষিপ্রধান সমাজের মধ্যে পার্থক্যের কারণে অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্নতার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের মূল প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া সকল দেশেই ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের সূত্রগুলি মূলত একই হয়। সুতরাং 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়া কোন পৃথক্ শাস্ত্রের কল্পনা করা অযৌক্তিক। ভারত ত' আর সৃষ্টি-বহির্ভূত দেশ নয়!

'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটির প্রাচীন ব্যাখ্যা

যাঁহারা 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, উপরি-উক্ত যুক্তি যেমন সত্য ইহাও তেমনি অনস্বীকার্য যে দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেদে অর্থনৈতিক সমস্যারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই পার্থক্য যদি বিশেষ গভীর হয় তবে সাধারণ অর্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলির বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। এই দিক দিয়াই বিচারপতি র‍্যাণাডে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে তিনিই সর্বপ্রথম কথাটি ব্যবহার করেন।

পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের সমাজ-জীবনের মধ্যে পূর্বতন বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

ভারতে বিদেশী শাসকবর্গের নীতি ছিল পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার সূত্রগুলিকে এই দেশে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করা। র‍্যাণাডে প্রমুখ মনীষিগণ ইহার মধ্যে পাইয়াছিলেন অমংগলের সুস্পষ্ট ইংগিত। সুতরাং তাঁহারা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। র‍্যাণাডে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সকল দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ; প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা (religious indifference)। অপরদিকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ পরিবার, প্রথা (custom) এবং একরূপ ধর্মান্ধতা। ভারতে ব্যক্তি নয়—পরিবারই সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্র; প্রতিযোগিতা নয়—প্রথাই এদেশে অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্থলে আছে এক অনন্যসাধারণ

সমাজ ও ধর্মবোধ (socio-religious outlook)। পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যা যে-যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিয়া অর্থবিদ্যার যে-শাস্ত্র চর্চা করা হইবে তাহা 'একান্তভাবেই ভারতীয়' হইবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যা 'একান্তভাবেই ভারতীয়' হইবে

র‍্যাণাডের উপরি-উক্ত প্রতিবাদের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর বলা যায় না যে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের আর্থিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গভীর। বর্তমানে যৌথ পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে; প্রথা আজ আর বর্তমানে আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না বলিলেই চলে—তৎপরিবর্তে সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে প্রতিযোগিতা; লোকের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে বস্তুবাদী (materialistic) জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা। উপরন্তু, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে-বিরাট নগরিকরণ (urbanisation) ঘটিয়াছে তাহার ফলে পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধিত হইয়াছে অভূতপূর্ব ঐক্য; এবং সাম্প্রতিক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ঐক্যসূত্রকে করিয়াছে দৃঢ়তর। সুতরাং বর্তমানে এরূপ কোন ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার কল্পনা করা যায় না যাহা 'একান্তভাবে ভারতীয়ই' হইবে। বলা যায়, যেমন 'ভারতীয় পদার্থবিদ্যা' বা 'ভারতীয় রসায়ন' বলিয়া কোন নূতন বিজ্ঞান থাকিতে পারে না, তেমনি 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়াও কোন বিশেষ শাস্ত্রের কল্পনা করা যায় না। অবশ্য ইহা সত্য যে এখনও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলিকে ভারতের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা যে কোন দেশের বেলাতেই সত্য। সকল দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু না-কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, র‍্যাণাডেও 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে সম্পূর্ণ কোন নূতন শাস্ত্রের চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইংগিত দেন নাই। পরিবর্তিত আকারে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলিকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ একই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথকভাবে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং করিতে বলিয়াছিলেন।*

বর্তমানে 'একান্তভাবে ভারতীয়' কোন বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না

* অবশ্য অধ্যাপক ওয়াদিয়া, মার্চেন্ট প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ মনে করেন যে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি এক নূতন শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহার করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইঁহাদের মতে, এ্যাডাম স্মিথ ম্যালথাস রিকার্ডো মিল প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে-অর্থবিদ্যার পরিস্ফুটন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে নূতন অর্থবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে 'সোবিয়েত অর্থবিদ্যা' বলিয়া অভিহিত

এইভাবে র‍্যাণাডে, রমেশ দত্ত প্রদর্শিত পথে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চা সুরু হয় এবং পরে উহা একরূপ এক পৃথক্ শাস্ত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করে। এই পৃথক্ শাস্ত্র হইল জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের আর্থিক অবস্থা ও সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা। এই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী, কোনমতেই তত্ত্বগত নহে।

বর্তমানে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে কি বুঝায়

ইহাকে ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার (applied economics) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ন্যায় ভারতীয় অর্থবিদ্যার চর্চাও ফলপ্রদায়ী বা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়াই এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য। ইহা অতীতের পটভূমিকায় সমস্যাগুলির উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা প্রধানত ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহকে লইয়া

ভারতীয় অর্থবিদ্যাকে 'ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা' বলিযাও অভিহিত করা যায়

গঠিত এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে বলিয়া এই পর্যালোচনাকে বর্তমানে অনেকে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা'র পরিবর্তে 'ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা' (Indian Economic Problem) বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত' এই শাস্ত্র'এই নূতন নামই গ্রহণ করিবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র (Scope of Indian Economics)ঃ ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই বুঝায়। এই আলোচনা বিশেষ গভীর ও ব্যাপক। ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদান, ভারতের জনগণ, ভারতের কৃষি ও শিল্প, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতি, ভারতে সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন, ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবস্থা, ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় আয়-ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহাদের সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধানের ইংগিত দিতে হইবে।

সম্প্রতি অর্থ-ব্যবস্থার নূতন রূপান্তর হেতু ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহা হইল স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা (*laissez faire* economy)

করিতে কোনই আপত্তি নাই। নয়া চীনের অর্থবিদ্যা আবার এই সোবিয়েত অর্থবিদ্যা হইতে কিছুটা পৃথক্। সুতরাং নয়া চীনের নিজস্ব অর্থবিদ্যা আছে। জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ লিষ্ট (List) জার্মেনীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন অর্থবিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব, 'একান্তভাবে ভারতীয়' কোন অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ সংগতভাবেই থাকিতে পারে।

হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় (planned economy) রূপান্তর। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতের প্রায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে আনয়ন করা হইতেছে। ফলে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটিতেছে। পদে পদে এই হস্তক্ষেপের অনুসন্ধান করিয়াই ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে পর্যালোচনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত আর একটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত আছে। ইহা হইল ভারতের অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার (underdeveloped economy) সম্যক উন্নয়নের প্রশ্ন। ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ। এই অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বর্তমানে আবার অর্ধোন্নত দেশগুলির কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা একরূপ বিশ্বজনীনভাবে চলিতেছে। সুতরাং এই প্রচেষ্টার সহিত ভারতও সম্পর্কিত—ইহাতেও ভারতের ভূমিকা রহিয়াছে। ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে এ-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত জড়িত আর একটি বিষয়

ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Indian Economics)ঃ ভারতের বিভিন্ন ও জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ করিতে হয় বলিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনায় ভারতবাসীর দিক দিয়া কাম্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। ভারতীয়গণের মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-শিক্ষার স্থান নিশ্চয়ই রহিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে-ভারতীয় সম্যক অবহিত নহে অনেকে তাহাকে প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করিতেই চাহেন না।

১। ইহাতে কাম্য শিক্ষার প্রসার ঘটে

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতার পরে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতেছি। এ-চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না যদি না ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আপামরসাধারণের সম্যক জ্ঞান থাকে। সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের আদর্শের আপেক্ষিকই হয়। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শবাদী জনসাধারণের। এ-দিক দিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা চর্চার গুরুত্ব যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলিবে।

২। স্বাধীন ভারতে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনেও ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার ফল পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে কৃষির ক্ষেত্রে সম্যক সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল কার্যই সহজে সম্পাদিত হইতে পারে।

৩। ব্যবহারিক জীবনেও এই চর্চার ফল পরিলক্ষিত হয়

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চাকে সম্প্রসারিত করিবার। আজ শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলকেই ভারতের আর্থিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহাদের সমাধানকল্পে নির্দেশিত পথ দিয়া ব্যক্তিগতভাবে চলিতে হইবে এবং অপরে যাহাতে চলে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই পদ্ধতিতেই নিহিত আছে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি যাহার জন্য শত-সহস্র দেশপ্রেমিক স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss tho nature and scope of Indian Economics. (১-৪ পৃষ্ঠা)
2. What is the utility of tho study of Indian Economics ? (৪-৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ

(The Physical Environment)

অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influences of Physical Features upon Economic Life): যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকের উপরই প্রকৃতির পরিবেশের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, ভৌগোলিক পরিবেশই অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। দেশের জলবায়ু ও শ্রমের দক্ষতা খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি নিরূপণ করে; বৃষ্টিপাত কোন্ কোন্ শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করে; নদী ও সমুদ্রোপকূল বহুল পরিমাণে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে; এবং এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা দেশের শিল্পবাণিজ্য, সরকারী আয়-ব্যয়, সরকারী অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি সকলই নিরূপিত, নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব রহিয়াছে

অপরদিকে, আবার ইহাও সত্য যে দিন দিন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং ফলে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। সমুদ্র আজ আর অজানা নাই বা থাকিবে না; পর্বতের বাধা আর অলংঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না; বিভিন্ন স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতাকে ইতিহাসের ঘটনায় পরিণত করিয়াছে; অরণ্যের

তবে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে

কবল হইতে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষি-জমির সীমাবদ্ধতাকে দূর করা হইতেছে; এক দেশের মাটিকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করিয়া এবং অন্যভাবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে; ভূগর্ভে প্রোথিত কয়লা ও তৈল উত্তোলন করা হইতেছে; নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া নৌবাহ্য খাল খনন, বন্যা-নিরোধ প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইতেছে; ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই

কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় কোনদিনই হইবে না। মানুষের কলাকৌশল এড়াইয়া যাইবার অদ্ভুত শক্তি প্রকৃতির আছে। প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্যের ফলে মানুষের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইতে পারে। সমুদ্রে বরফ জমিয়া সমুদ্রপোতের পথ রোধ করিতে পারে; ভূমিকম্পে বাঁধ ভাঙিয়া যাইতে পারে বা নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে পারে; বরুণ-দেবতার কৃপণতার ফলে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতির উপর মানুষ যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আংশিক মাত্র; এবং এই কারণেই কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় ঐ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের আলোচনাও করিতে হয়।

এই কারণেই প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি সকলই অল্পবিস্তর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন এ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতের আয়তন ও অবস্থান (Size and Location of India) ঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল একটি বিরাট উপদ্বীপ। বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়ন অবিভক্ত ভারতবর্ষ হইতে আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও উহাকে বিরাট দেশ বলিয়া অভিহিত করিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন হইল ১,২৬০ হাজার বর্গমাইলের কাছাকাছি।* ভূখণ্ডের আয়তনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী।

এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ—ক্ষুদ্র দেশ মাত্র নহে

তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন হইল গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ১৩ গুণ এবং উপরি-উক্ত আয়তন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাংগেরী, রুমানিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল ও ডেনমার্কের সমষ্টিগত আয়তন অপেক্ষাও বড়। সুতরাং এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ—ক্ষুদ্র দেশ মাত্র নহে।

জনসমষ্টির দিক দিয়া দেখিলে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। একমাত্র চীন প্রজাতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র জনসংখ্যায় ভারতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই; সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ ভারতেই বাস করে। সুতরাং বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ একরূপ বৃহৎ হইতে বাধ্য।

* India—1959

ভারত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বংগোপসাগর, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চালান ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতের উপকূল-রেখাও বিশেষ দীর্ঘ। পরিমাণ ৩,৫০০ মাইলের উপর। কিন্তু ইহা অভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা বিশেষ কম। ফলে বহু ব্যয়ে নদীমুখে কলিকাতার ন্যায় বন্দর নির্মাণ করিতে হয় এবং উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অবস্থানগত সুবিধা এবং অভগ্ন উপকূল-রেখাজনিত অসুবিধা

প্রাকৃতিক বিভাগ (Natural Divisions): ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল।

তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ

(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (The Mountain Zone of the Himalayas): পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা দ্বারা সীমানির্দিষ্ট হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত চারিটি ভাগে বিভক্ত—যথা, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবংগের উত্তরাঞ্চল এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চল। পূর্বে এই অঞ্চলকে খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে কয়লা পেট্রোল জিপসাম পাথুরে লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রভূত পরিমাণে ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে।

১। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও উহার গুরুত্ব

ভারতের আর্থিক জীবনেও হিমালয়ের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। হিমালয় ভারতের জলবায়ুর নিয়ামক। হিমালয় দ্বারাই মৌসুমী বায়ুর গতিপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এই নিত্যবহ নদনদীগুলি হিমালয়ের তুষারগলা জলে পরিপুষ্ট। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজ দ্রব্য চা হিমালয় অঞ্চলেই অধিক উৎপন্ন হয়। চা ছাড়াও এই অঞ্চলে ধান্য, ইক্ষু ও নানাপ্রকার শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। জীবজন্তু ও বনসম্পদে হিমালয় অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দূরদূরান্তর হইতে পর্যটককে আহ্বান করিয়া আনে। দার্জিলিং মুসৌরী সিমলা নৈনিতাল শ্রীনগর উপত্যকার ন্যায় রমণীয় শৈলাবাসগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

(২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল (The Indo-Gangetic Plain): উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্রটা, পশ্চিমবংগ ও বিহারের হিমালয় অংশ বাদ দিয়া সমগ্রটা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নিম্নভূমিসমূহ এবং রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল লইয়া সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল গঠিত। দৈর্ঘ্যে ১,৫০০ মাইল

এবং প্রস্থে ১৫০-২০০ মাইল এই অঞ্চল সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখার দ্বারা বিধৌত। এই নদনদীগুলির পলিমাটি দ্বারাই এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চল বিশেষ উর্বর। কৃষির দিক দিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

২। সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল ও ইহার গুরুত্ব

(৩) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল** (**The Deccan Plateau**)ঃ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চল (The Peninsular Plateau) নামেও অভিহিত। সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল এবং এই মালভূমির মধ্যে আছে অসংখ্য পর্বতমালা। ইহাদের মধ্যে আরাবল্লী বিন্ধ্য সাতপুরা মাইকাল অজন্তা প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এক দিকে আছে পূর্বঘাট এবং অপরদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। নর্মদা তাপ্তী গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি নদনদী এই মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হয় আরব সাগর না-হয় বংগোপসাগরে পড়িতেছে। ধান্য তৈলবীজ জোয়ার বাজরা ভুট্টা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। লৌহ-মাক্ষিক অভ্র চুনাপাথর বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও এ-অঞ্চল সমৃদ্ধ।

কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India)ঃ ভারতের মৃত্তিকাকে একরূপ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পলিমৃত্তিকা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক মৃত্তিকা এবং প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা।

পলিমৃত্তিকা বা পলিমাটি (**Alluvial Soil**)ঃ বিভিন্ন নদীর গতিপথে যুগ যুগ ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়া যে-মাটি গঠিত হয় তাহাকে পলিমাটি বলে। সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমি, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের উপকূল অঞ্চল এবং আসামের সুরমা উপত্যকা প্রধানত এই মৃত্তিকায় গঠিত। পলিমাটি দ্বারা গঠিত মোট ভূমির পরিমাণ ৩,০০,০০০ বর্গমাইল বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই মাটি নরম, জলবহ (porous) এবং নানা রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া ইহাতে নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়।

পলিমৃত্তিকার গুণ

কৃষ্ণ মৃত্তিকা (**Black Soil**)ঃ কার্পাস তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া কৃষ্ণ মৃত্তিকাকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। বোম্বাই-এর অধিকাংশ অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কিয়দংশে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে আর্দ্রতা ধারণ করিতে পারে বলিয়া এই মৃত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিলেই চলে। কার্পাস ছাড়াও গম জোয়ার বাজরা প্রভৃতি শস্য এই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ মৃত্তিকার ফসল

গৈরিক মৃত্তিকা (**Red Soil**)ঃ মাদ্রাজের অধিকাংশ অঞ্চল, বোম্বাই-এর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বিহারের সাঁওতাল পরগণার প্রায় সমগ্রটা, পশ্চিমবংগের বীরভূম প্রভৃতি

জিলা এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক সমৃদ্ধি এবং গভীরতার দিক দিয়া এই মৃত্তিকায় ঐ সকল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অবশ্য প্রভূত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। আর্দ্রতা ধারণের উপযোগী নয় বলিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য এই মৃত্তিকায় বিশেষ জলসেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

গৈরিক মৃত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা (Laterite Soil) ঃ অনেকক্ষেত্রে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাকে গৈরিক মৃত্তিকা (Red Soil) হইতে পৃথক্ করা হয় না। কারণ গৈরিক মৃত্তিকাও একরূপ প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা। গৈরিক মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা হইল উদ্ভিদ-ক্ষার, চুন প্রভৃতি রাসায়নিক গুণবিহীন মৃত্তিকা। ইহা উড়িষ্যা, বোম্বাই, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কোন কোন অংশে এবং মালাবার উপকূলে পাওয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথবা জলসেচের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে সেই সকল স্থানে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাতেও শস্য উৎপন্ন হয়।

গৈরিক মৃত্তিকা ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পার্থক্য

সম্প্রতি বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হইতে ভূ-গঠনের প্রকৃতি বা মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি লইয়া বিশেষভাবে গবেষণা করা হইতেছে। ভারতের কৃষি-বিদ্যালয়ে (Agricultural Institute) ভারতের মৃত্তিকার একখানি মানচিত্রও প্রস্তুত করা হইয়াছে।

অন্যান্য অর্থ নৈতিক সমস্যার ন্যায় ভারতে মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্যাও একটু বিশেষ ধরনের। অন্যান্য অনেক দেশের মৃত্তিকা আর্দ্র ; কিন্তু ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। সুতরাং ভারতে মৃত্তিকা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা হইল জলসেচের সমস্যা। অন্যান্য অনেক দেশে এই সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে হয় না ; ফলে তাহারা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়।

ভারতের মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্যা

জলবায়ু (Climate) ঃ সামগ্রিকভাবে ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের (monsoon-tropical) জলবায়ু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই বর্ণনা ভারতের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ইংগিত দেয় না। ভারত বিশাল দেশ ; ইহাকে উপমহাদেশ বলিয়াই অভিহিত করা হয়। অবস্থানের দিক দিয়াও ভারত কোন একটি বিশেষ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ভারতের জলবায়ুর সামগ্রিক বর্ণনা বা সামগ্রিক আলোচনা একরূপ অস্পষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণে ভারতকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ইহার জলবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু

ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু ; কিন্তু সমতলভূমিতে উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু দৃষ্ট হয়। আবার আগ্রা জিলা, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতির ন্যায় ভারতের বহু স্থানের

জলবায়ু হইল চরমভাবাপন্ন। পশ্চিম রাজস্থানে গ্রীষ্মে উষ্ণতা ৪৮° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বেও উঠে, আবার জানুয়ারী মাসে ৪.৫° সেন্টিগ্রেডের নিম্নেও নামিয়া আসে। পার্বত্য অঞ্চল ও সমভূমির মধ্যে পার্থক্যের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে উষ্ণতা ১.৭° সেন্টিগ্রেডের নিম্নেও নামিয়া আসে এবং দ্বিতীয়োক্ত কয়েকটি অঞ্চলে উষ্ণতা ৫০° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বেও উঠে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ুর বিশেষ তারতম্য

বৃষ্টিপাতের বেলাতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের থর মরুভূমিতে গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল মাত্র ৫ ইঞ্চি; কিন্তু চেরাপুঞ্জিতে ইহা হইল ৪৩০ ইঞ্চি বা ততোধিক।

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য

জলবায়ুর এইরূপ অনন্যসাধারণ তারতম্যের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপজীবিকা এবং এমনকি দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ভেরা এ্যানস্টী (Dr. Vera Anstey) ভারতে জলবায়ুর অর্থনৈতিক প্রভাবকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: জলবায়ুর তারতম্যের জন্য ভারতে কাশ্মীরের লোমশ পাহাড়ী ছাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্থানের উষ্ট্র এবং বংগদেশের ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন জীবজন্তু, উত্তরাঞ্চলের গম এবং দেবদারু বৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উপকূলভূমির ধান্য ও নারিকেল বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যাদি, এবং বংগ, বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ কয়লা খনি হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূরের স্বর্ণখনি ও পাঞ্জাবের লবণ পর্বত প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

জলবায়ু তারতম্যের ফল

ভারতীয় জনগণের কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ু কতখানি প্রভাব বিস্তার করে ইহা লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, উষ্ণ জলবায়ু প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভবে সহায়তা করিলেও, পরবর্তীকালে ইহার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। উষ্ণ জলবায়ু শারীরিক কর্মদক্ষতাকে হ্রাস করে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। অপর দিকে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিকতর শারীরিক কর্মদক্ষতা সম্ভব হয় বলিয়া এইরূপ জলবায়ুকে সর্বদাই আর্থিক সমৃদ্ধির সহায়করূপে দেখা গিয়াছে। এই যুক্তিকে বর্তমানে অবশ্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। অতীতে ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে সভ্যতা উন্নতির যে শিখরে উঠিয়াছিল তাহা হইতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, উষ্ণ জলবায়ু সর্বদাই সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। বর্তমানেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্মদক্ষতায় ভারতীয় শ্রমিক ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমজীবী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তবে উষ্ণ জলবায়ু অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা যে সামান্য বৃদ্ধি পায় সে-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

ভারতীয়গণের কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ুর প্রভাব

বৃষ্টিপাত (Rainfall) ঃ বৃষ্টিপাত জলবায়ুর অন্যতম উপাদান হইলেও ভারতীয় অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়—কারণ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যে-সকল ভৌগোলিক বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে বৃষ্টিপাতই সর্বপ্রধান। অধ্যাপক জাথার ও বেরীর (Profs. Jather and Beri) ভাষায় বলা যায়, ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর অন্য কোথাও বৃষ্টিপাত অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিককে একপভাবে প্রভাবান্বিত করে না।

ভারতীয় অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার স্বতন্ত্র আলোচনার প্রযোজনীয়তা

ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয় মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। এইজন্যই ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু বলা হয়। মৌসুমী বায়ু বলিতে বুঝায় আর্দ্রতা বহনকারী বায়ুপ্রবাহ। আর্দ্রতা বহন করে বলিয়া এইরূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়। ভারতে এইরূপ বায়ু দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হয়; এবং ফলে ইহা দুই নামে পরিচিত—উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গুরুত্বই অধিক কারণ ইহাই ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ভারতে মৌসুমী বায়ু

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে ঃ গ্রীষ্মকালে উত্তর উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ফলে ভূ-ভাগের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ বিশেষ কমিয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়, সেইদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বাতাস বহিতে থাকে। এই বায়ুস্রোত সমুদ্রের উপর দিয়া আসে বলিয়া জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আর্দ্র বা বৃষ্টিবাহী হয়। ভূ-খণ্ডের উপরে আসিয়া ইহা পর্বতমালার সহিত সংঘর্ষের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

১। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও ইহার গুরুত্ব

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দুইটি স্রোত আছে ঃ বংগোপসাগরীয় স্রোত এবং আরব সাগরীয় স্রোত। প্রথমোক্ত স্রোতটি প্রথমে পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া আসামের পর্বতমালার দিকে ধাবিত হয় এবং সেখান হইতে আসাম ও পশ্চিমবংগের প্রায় সবত্র বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া গাংগেয় সমতলভূমি ধরিয়া, পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত বা আরব সাগরীয় স্রোতের প্রথম সংঘর্ষ হয় পশ্চিমঘাট পবতমালার সহিত। তাহার পর ইহা দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় শীতকালে। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার গতিপথে বংগোপসাগরের কিয়দংশ ছাড়া আর কোন জলভাগ পড়ে না। সুতরাং ইহা বংগোপসাগরের উপর দিয়া দাক্ষিণাত্যে আসার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া ভারতের দক্ষিণ-পূব উপকূলে শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়।

২। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু

বলা হইয়াছে যে, ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ সংঘটিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। মৌসুমী বায়ুর বৈশিষ্ট্য হইল যে, পর্বতমালার সহিত প্রথম

সংঘর্ষের সময় ইহা সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং পরে ইহা যত অগ্রসর হইতে থাকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তত কমিতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় আসামের উপত্যকা এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে। তারপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিতে কমিতে রাজস্থানে আসিয়া একেবারে হ্রাস পায়।

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়:

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতের আঞ্চলিক বিভাগ

(১) **আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল ১০০ ইঞ্চির উপর। আসামের উপত্যকা অঞ্চল এবং পশ্চিমবংগের উপকূল ভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) **নাতি-আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চির মধ্যে। পশ্চিমবংগ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৩) **শুষ্ক অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বৎসরে ৪০ ইঞ্চির কম গড় বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজস্থানের অনেকস্থানে বৎসরে গড়ে ৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়।

শুধু যে আঞ্চলিক বণ্টনেই বৃষ্টিপাতের এইরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, বৃষ্টিপাতের সময়েরও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে ইহার প্রবাহে বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে পারে। অনেক সময় আবার কোন কোন অঞ্চলে প্রথমে প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া সে-অঞ্চলে আর দেখা নাও দিতে পারে। এরূপ ঘটিলে কৃষককে একবার শস্যক্ষেত্রের দিকে আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতে হয়।

বৃষ্টিপাতের সময়গত অনিশ্চয়তা

মৌসুমী বায়ুর ফলাফল (**Economic Effects of the Monsoons**): ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। ভারতের মাটি শুষ্ক বলিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এখনও পর্যন্ত ভারত পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সুতরাং এখনও পর্যন্ত কৃষক জলের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল। কিন্তু এমন বৎসর বড় একটা দেখা যায় না যখন ভারতের কোন-না-কোন অঞ্চলে হয় অতিবৃষ্টি না-হয় অনাবৃষ্টি ঘটে। বলা যায় যে, ভারতীয় মৌসুমী বায়ু প্রাচ্য দেশীয় রাজন্যবর্গের মতই স্বৈরাচারী; ইহা সম্পূর্ণভাবে নিজের খেয়ালখুশী মত চলে। কোন বৎসর হয়ত' ইহা বৃষ্টিপাত একরূপ নাও ঘটাইতে পারে; কোন বৎসর হয়ত' দেশ বা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে পারে। কোন বৎসর ইহা অতি শীঘ্র, কোন বৎসর বা অত্যধিক বিলম্বে ঘনঘটা করিয়া আসিতে পারে। মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীর এই ধরনের যে-কোনরূপ প্রকাশের ফলে দেশের অর্থনৈতিক

ক। অর্থনৈতিক জীবনের অনিশ্চিয়তা মৌসুমী বায়ুরই অনিশ্চয়তার ফল

জীবন নোঙরহীন হইয়া সম্পূর্ণভাবে অজানার উজানে চলিতে থাকে। বস্তুত, ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের অস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তা বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তারই ফল।

বৃষ্টিপাত আশানুরূপ না হইলে:
১। কৃষকের ক্ষতি
২। শিল্পে কাঁচামালের অভাব

যদি বৃষ্টিপাত আশানুরূপ বা সময়মত না হয় অথবা যদি ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় তাহা হইলে শস্যের ক্ষতি হয় বলিয়া প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। শস্যের ক্ষতি হইলে কাঁচামালের যোগান কমিয়া যায় বলিয়া ভারতীয় শস্যজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পক্ষে এই শিল্পগুলিকে চালু রাখার জন্য বাহির হইতে কাঁচামাল আনয়ন করার প্রয়োজন হইতে পারে।

৩। খাদ্যাভাব

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভারতে খাদ্যাভাব সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও ভারতে খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং স্বাভাবিক বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই সরকারকে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। ইহার উপর যদি কোন কারণে আবার শস্যহানি ঘটে তবে দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য সরকারকে বাহির হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য বন্ধ রাখিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি (reserve of foreign currency) ইহার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অর্থে না কুলাইলে ঋণ করিয়াও আমদানি করিতে হইবে; এবং বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। মূলধন-দ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় আমদানি পরিহার করিয়াও বুভুক্ষা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

৪। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস
৫। যানবাহনের চাহিদা হ্রাস
৬। অন্যান্য শ্রেণীর আয় হ্রাস

শস্যোৎপাদন ব্যাহত হইলে প্রথমেই শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবীর আয় কমে। কৃষিজীবীর আয় কমিলে শিল্পজাত দ্রব্যেরও চাহিদা কমে; ফলে শিল্পপতি, শিল্প-শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আয়ও কমে। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমিলে যানবাহনের চাহিদাও কমে। ফলে যাহারা জীবিকার জন্য যানবাহনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের আয়ও কমে। এইভাবে প্রধান প্রধান সামাজিক শ্রেণীর আয় কমিলে উকিল ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি সমাজের বাকী শ্রেণীর আয় কমিতে বাধ্য।

৭। সরকারের আয়-হ্রাস ও ব্যয়বৃদ্ধি

সকল শ্রেণীর আয় যখন কমে তখন বিভিন্ন কর হইতে প্রাপ্য এবং রেলপথ, ডাক-বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সেবামূলক কার্য হইতে লভ্য সরকারী আয়ও হ্রাস পায়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতীয় কৃষিজ পণ্য এক বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া আছে বলিয়া শস্যের ক্ষতি হইলে রপ্তানি শুল্ক হইতে আয় কমিয়া যায়, এবং রপ্তানির উপরই আমদানি নির্ভর করে বলিয়া আমদানি শুল্ক হইতেও আয় কমে। শস্যের ক্ষতি হইলে শুধু যে সরকারী আয়ই কমে তাহা নহে, দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, উপযুক্ত বণ্টনের জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (system of control and rationing) করিতে হয় বলিয়া ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে।

ভারত ও রাজ্যসরকারসমূহের আয়-ব্যয় মৌসুমী বায়ুর উপর এত বেশী নির্ভরশীল যে, ভারতীয় বাজেটকে ভারত সরকারের অন্যতম ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব স্যর ফ্লীটউড উইলসনের (Sir Fleetwood Wilson) ভাষায়, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা (a gamble in rains) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা

উপরন্তু, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব যে সকল ভৌগোলিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌসুমী বায়ুকে সর্বপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়াই পশ্চিমবংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশের লোকবসতি এত ঘন এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। ভারতের অধিবাসিগণের অদৃষ্টনির্ভরশীলতা যে কতকাংশে মৌসুমী বায়ুর জন্য—ইহাও বলা চলে। মৌসুমী বায়ুর আগমন-প্রত্যাগমনের সময়ের পরিবর্তন অথবা ইহার পরিমাণভেদের ফলে কৃষকের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বৎসর যদি সুবৃষ্টি হয় তবে সে আশানুরূপ ফসল ঘরে তুলিতে পারে। তাহার অদৃষ্ট যখন এরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অদৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য। আবার যখন কৃষকের ভাগ্যের সহিত জনসংখ্যার অপরাপর অংশের ভাগ্য বিজড়িত তখন ইহা বলা যায় যে, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অতিমাত্রায় অদৃষ্টনির্ভরশীল হইতে শিখাইয়াছে।

মৌসুমী বায়ুর দ্বারা লোকবসতির বণ্টন নির্ধারিত হইয়াছে

খ। মৌসুমী বায়ুর জন্যই ভারতীয়গণের অদৃষ্টনির্ভরশীলতা

উপসংহার ঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিন অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া আনিতেছে। পূর্বে যে-সকল ভৌগোলিক বিষয় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, বর্তমানে তাহাদের মধ্যে অনেককে অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধিসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে মৌসুমী বায়ুর বেলায় দেখি যে, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দূরিকরণের জন্য বহু নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে। এই সকল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (River Valley Projects) হইতে জলসেচ ছাড়াও বন্যা নিরোধ, আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার প্রভৃতি ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এই দিক দিয়া বহু কিছু করা হইলেও ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় বিশেষ কিছু করা এখনও সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য ভৌগোলিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধুমাত্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও বহুদিন সময় লাগিবে।

মৌসুমি বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে বহুদিন লাগিবে

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the extent to which economic life in India has been affected by geographical features (৬-১৪ পৃষ্ঠা)

2 What are the monsoons ? Describe their influence on the economic life of India [B Com 1947] (১১-১৪ পৃষ্ঠা)

3. Describe the important variety of soils in India and point out their suitability for the growth of particular kinds of crops [B Com 1941] (৮-৯ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো বলিতে কি বুঝায়

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও উহার অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা যায়।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কতকগুলি দেশে শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ফলে সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক প্রসারের দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, স্বভাবতই সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়া সকল দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (highly developed) দেশ বলা হয়, এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক। দ্বিতীয়ত, ইতালী, হাংগেরী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের অর্থনৈতিক প্রসার অতি উচ্চস্তরে না পৌছাইলেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহারা অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এই সকল দেশে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন।

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেশগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়

এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে 'অনুন্নত দেশ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'অনুন্নত' শব্দটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থাকায় বর্তমানে অর্থবিদ্যাবিদগণ এই সকল দেশকে অর্ধোন্নত দেশ (underdeveloped countries) বলিয়া অভিহিত করেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্যতম আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশ যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে * এখন আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে অর্ধোন্নত দেশের লক্ষণ কি কি? এই সকল দেশের কাঠামো কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নয়ন সাধনেরই বা পন্থা কি? আমরা এই সকল আলোচনা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব।

বিভিন্ন লেখক অর্ধোন্নত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই তর্ক-বিতর্কের ভিতর না যাইয়া সংক্ষেপে অর্ধোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে পারা যায়: অর্ধোন্নত দেশ হইল সেই দেশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্য এবং যাহার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (potentiality) রহিয়াছে। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে-সকল দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় নিম্ন সে-সকল দেশকেই বুঝাইবার জন্য আমরা অর্ধোন্নত দেশ কথাটি ব্যবহার করি।† ভারতের দৃষ্টান্ত লইলেই এ সংজ্ঞার অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৭২ টাকা; অপরদিকে ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ছিল ৯,৭৩১ টাকা, ইংল্যাণ্ডে ৪,২৮৭ টাকা এবং কানাডায় ৬,৭৪২ টাকা। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং জনবলের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আমরা এই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে লোকের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জীবনযাত্রার মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে। সুতরাং বর্তমান মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা এবং আর্থিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইল অর্ধোন্নত দেশের দুইটি প্রধান লক্ষণ।

অর্ধোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায়

অর্ধোন্নত দেশের দুইটি লক্ষণ

* Pant A. Samuelson—Economics, An Introductory Analysis.

† *Measures For The Economic Development of underdeveloped countries*—**Report by a Group of Experts appointed by the Secretary General of the United Nations.**

অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Structural Features of an Underdeveloped Economy): অর্ধোন্নত দেশগুলির দিকে তাকাইলে উহাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়।

(১) শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগ লোক কৃষিজীবী এবং মাত্র ১০·৫ ভাগ লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত। বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহন, চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।* সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত আসে কৃষি হইতে। সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয় আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে আসে শতকরা ১০ ভাগ। বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়।

অর্ধোন্নত দেশে কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কৃষি অনুন্নতই হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থা অনুন্নত, সার ও বীজ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে দেখা যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম হয়। ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, অর্ধোন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা কৃষকের থাকে না ; সকলের উপরে থাকে জমিদার এবং তাহার পর থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে এইরূপ ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি

জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের ভূমিকা

(২) অর্ধোন্নত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (disguised unemployment)। ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রাম্য শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবারভুক্ত ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক ঐ জমিতে খাটিতেছে। এই অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনক্রমেই হ্রাস পায় না। সুতরাং এই সকল লোকদের অনাবশ্যক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কৃষিতে এই ছদ্ম বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমস্যা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে।

অর্ধোন্নত দেশে ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের আধিক্য

(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই ; বেকার, অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যা বহু। ইহাদিগকে সম্পদসৃষ্টির কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত মূলধন বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাদের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিবার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি দক্ষতার অভাব। ইহাকে অর্ধোন্নত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়।

কারিগরি দক্ষতার অভাব

* National Income Committee's Report, 1954.

(৪) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে অর্ধোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি অল্প এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়।

মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা

(৫) অর্ধোন্নত দেশে ধনবৈষম্য অতি প্রকট। একদিকে অগণিত জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটায়, অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

প্রকট ধনগত বৈষম্য

(৬) অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য।* আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশের সঞ্চয় হইতেই দেশের মূলধন গড়িয়া উঠে। সুতরাং অর্ধোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও স্বল্প হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১০-২০ ভাগ মূলধন গঠনকার্যে নিয়োজিত হয়। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের জন্য জাতীয় আয়ের সামান্য অংশই ব্যয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী মূলধন-সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা সামান্য বাড়িয়া জাতীয় আয়ের শতকরা ৮'৮ ভাগে দাঁড়ায়।

সঞ্চয় ক্ষমতা কম হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও কম

(৭) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রকৃতি হইতে অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগের উপর ব্যয় হয় খাদ্যের উপর এবং শতকরা ৬ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে।† শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলে সাধারণ লোকের ব্যয় অর্ধেকের মত হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর। খাদ্যদ্রব্যের উপর আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা সত্ত্বেও লোকে জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য জোটাইতে পারে না। ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ হইল ২,২০০ মাত্র। সাধারণ লোক শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়া অর্ধোন্নত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৮৩ জন লোক নিরক্ষর।

সাধারণ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্য যোগাইতে ব্যয় হয়

সাধারণ লোকের খাদ্য গ্রহণ ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়

অশিক্ষা ও ব্যাধির ব্যাপকতা

* 'The domestic accumulation of capital in a poor country is bound to be slow'.
—Jacob Viner.

† 'With very low living standards the bulk of the aggregate money income of the population is spent on food and relatively primitive items of clothing and household necessities.
—Paul A Barau

(৮) ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে হয়। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫-৫০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্পায়ু ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যও অর্ধোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জন্মমৃত্যুর হারের আধিক্য

(৯) অর্ধোন্নত দেশের মূলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। এই সামান্য মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্য নিয়োজিত হয় না।* ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সহজে অধিক মুনাফা শিকার করিতে চায়; সেইজন্যই ফটকা বাজার, চোরাকারবার, মাল মজুত, দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে। কিছুটা সঞ্চয় গহনাপত্রাদিতেও ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহে না, কারণ এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম অথবা অধিক ঝুঁকি থাকে। ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহারা টাকা বিনিয়োগ করে; এবং ফলে দেশের প্রকৃত মূলধন সামান্যই গড়িয়া উঠে।

অর্ধোন্নত মূলধনের বিনিয়োগ কাম্যভাবে হয় না

মূলধন-দ্রব্য অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে অধিক ঝোঁক

(১০) অর্ধোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক (colonial) ধরনের হয়। এরূপ বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে সস্তা দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। এরূপ হইবার প্রধান কারণ হইল বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং নিজ দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে ভারতকে সেদিন পর্যন্ত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানি ও যন্ত্রশিল্প নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনের

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition in Indian Economy) ঃ ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা অর্ধোন্নত হইলেও বর্তমানে উহার রূপান্তর ঘটিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে উন্নয়নমূলক রূপদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের আলোচনা দুই দিক হইতে করা যাইতে পারে—যথা, (ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এবং (খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর।

দুই প্রকার রূপান্তর

---

* **Paul A. Samuelson—Economics : *An Introductory Analysis*-এর ৭১৪-১৫ পৃষ্ঠা 'Mal-investment of savings is an important problem in underdeveloped countries.'—Measures for the Economic Development of Uuderdeveloped Countries (United Nations, Department of Economic Affairs).**

(ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from *Laissez Faire* Economy to Planned Economy) : স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই প্রতিফলন। এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়—যথা, (ক) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে অব্যাহত অধিকার, (খ) উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise), এবং (গ) ভোগ্যপণ্য-ক্রেতার স্বাধীনতা (sovereignty of the consumer)।

স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদই ছিল বহু-অনুসৃত অর্থ ব্যবস্থা। বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ নানা দিক দিয়া ইহার গুণগানও করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা দিয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরূপ বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়া। অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় যে এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে।

পরিকল্পনা-প্রবণতার কারণ

ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী থাকিলেও পরিকল্পনার জল্পনা কল্পন বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই চলিযা আসিতেছিল। ইহার মধ্যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রে কর্তৃক 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' (National Planning Committee) গঠন এবং ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পরিকল্পন ও উন্নয়ন বিভাগ' (Planning and Development) স্থাপন এব শিল্পপতিগণ কর্তৃক বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) রচনার কথা বিশেষভা উল্লেখযোগ্য।*

ভারতে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৮ সালের সরকারি শিল্পনীতি প্রস্তাবে (Industrial Policy Resolution) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার একটি রূপ।

ইহার পর ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত এবং পরবর্তী বৎসরে প্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে প্রথম পরিকল্পনা শেষ হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যও অনেক দ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের এপ্রি মাসে সরকারী শিল্পনীতির পরিমার্জনা করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপকত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়। ইহার ফলে ভারত প পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হয়।

আশা করা যাইতেছে যে এইভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সংকোচন ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ দ্বারা একদি পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হইবে। সেদি

বর্তমান রূপান্তর

* দ্বিতীয় খণ্ডে 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা হইবে সমাজতন্ত্রী ধরনের। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম দিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

(খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from Underdeveloped Economy to Developmental Economy): ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি—যথা, (ক) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, (খ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য

ভারত যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এখন দেখা প্রয়োজন যে অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ কি। অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ প্রধানত তিন প্রকার—(ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) সামাজিক, এবং (গ) অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহ অর্ধোন্নতই থাকিয়া যায়—কারণ পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাম্রাজ্যিক শক্তির স্বার্থ-বিরুদ্ধ।

অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের তিনটি কারণ

অর্ধোন্নত দেশের সমাজ বিশেষভাবে শ্রেণীবিভক্ত এবং সামন্তপ্রথা সমন্বিত হয়। এখানে ভূস্বামিবর্গ পরগাছার ন্যায় কৃষককুলের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে, শিল্পপতিগণ চরম স্বেরাচারী হয় এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ দেশের শোষণে বিদেশীকে সহায়তা করিতে থাকে। উপরন্তু বর্ণভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে কায করে।

অর্ধোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ হইল অত্যধিক হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। জনসংখ্যার আয়তন বিরাট হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং শ্রমের কাম্য সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না—স্বল্প জমি ও মূলধনের সহিত অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বভাবতই শ্রমিক পিছু উৎপাদন হয় স্বল্প।

এই অবস্থা হইতে মুক্তি—অর্থাৎ অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে (ক) অধিক মূলধন-সংগঠনের (capital formation) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (খ) শ্রমের অপব্যয় যথাসম্ভব রহিত করিয়া উহাকে উৎপাদন কাজকর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, (গ) মূলধনকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিতে হইবে, (ঘ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং (ঙ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে স্থাপিত করিতে হইবে।

অর্ধোন্নত অবস্থা হইতে মুক্তির উপায়

বর্তমান ভারতে ইহাই করা হইতেছে। তাই বলা হয় যে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা আজ আর এক দিক দিয়া রূপান্তরের পথে। এই রূপান্তর হইল অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর।

ভারত এখন মুক্তির পথে

প্রশ্নোত্তর

1. **What is meant by an underdeveloped country? In what sense is India an underdeveloped country?** (১৬-১৯ পৃষ্ঠা)

2. **What are the main features of an underdeveloped economy? Illustrate your answer with reference to India.** (১৬-১৯ পৃষ্ঠা)

3. **Briefly describe the transition in Indian Economy.** (১৯-২১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources)

অর্থবিদ্যায় যাহা সামগ্রিকভাবে 'ভূমি' (land) বলিয়া অভিহিত, সেই সকল প্রাকৃতিক দানের (Gifts of Nature) সহযোগে মানুষ সম্পদ (Wealth) সৃষ্টি করে। যে-দেশকে প্রকৃতি যে-পরিমাণে দান করিয়াছে তাহার সামগ্রিক সম্পদ (Total Wealth) সেই পরিমাণই হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় উহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন যে, ঐ দেশের মানুষ প্রকৃতির দানকে কিভাবে এবং কতটুকু পরিমাণে কাজে লাগাইয়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে এই কয় ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়: খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, বনসম্পদ এবং প্রাণিসম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): ভারতে এখনও বিস্তারিতভাবে খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার ফলে ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী দুইটি ধারণা বর্তমান আছে। অনেকের ধারণা হইল যে, ভারতের খনিজ সম্পদ একরূপ অপর্যাপ্ত; উৎপাদনজনিত ত্রুটি এবং অপারগতার জন্য ভারত খনিজ সম্পদে অন্যান্য উন্নত দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অপরদিকে, অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতকে দরিদ্র দেশসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা যায়। উৎপাদনজনিত ত্রুটি দূর করিলে এই দিক দিয়া ভারতের অবস্থার সামান্য মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে, বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এই দেশের খনিজ সম্পদকে

ভারতের খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত কিনা?

অপর্যাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না; আবার ভারতের খনিজ সম্পদ একরূপ নগণ্য—একথাও বলা যায় না। ইহা অবশ্যই সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভারতে খনিজদ্রব্যের যথাযোগ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। যে দিন উহা সম্ভব হইবে সেই দিন ভারতের খনিজ সম্পদকে 'একরূপ নগণ্য' বলিয়া কোনরূপে বর্ণনা করা যাইবে না।

'গাণ্ডোয়ানা' নামে অভিহিত ছোটনাগপুরের মালভূমিই হইল ভারতের খনিজ সম্পদের প্রধান স্থান। গঠনের দিক হইতে দেখিলে ভারতে কয়েকটি খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—যথা, লৌহ-আকর (iron ore), অভ্র, ম্যাংগানীজ, কয়লা, বক্সাইট, প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ভারতকে আবার অভ্রের একচেটিয়া উৎপাদক বলিয়াও বর্ণনা করা চলে। কিন্তু আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে ভারত নিঃসন্দেহে দরিদ্র দেশ। ভারতে তাম্র দস্তা পারদ টিন স্বর্ণ রৌপ্য চীনামাটি প্রভৃতির সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না।

কয়েকটি খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য—কয়েকটির অভাব

ভারতের খনিজ শিল্পের একটি প্রধান ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে খনি শিল্প এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের হস্তে ছিল। তাহারা প্রধানত রপ্তানির জন্যই খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিত। ইহার ফলে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে ভারতের অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদকে একপ্রকার নিঃশেষ করা হইয়াছে। স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত শিল্প ব্যবস্থায় এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই। তবে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় শিল্পের প্রয়োজনেও খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলিবে না। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে সেই উত্তরপুরুষদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের খনিজ সম্পদের ব্যবহার করিতে হইবে।

খনি শিল্পে একটি প্রধান ত্রুটি

ভবিষ্যতের নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ

ভারতের খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the Mineral Resources of India): ভারতের খনিজ সম্পদের অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল (১) জ্বালানি খনিজ, (২) ধাতব খনিজ, এবং (৩) অ-ধাতব খনিজের মধ্যে।

(১) জ্বালানি খনিজ (Fuels): ভারতের জ্বালানি খনিজের মধ্যে কয়লা এবং তৈল প্রধান। এই দুইটির মধ্যে আবার কয়লাকেই সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

কয়লা (Coal): ভারতের পক্ষে কয়লা শুধু সর্বপ্রধান জ্বালানি মাত্র নহে, ইহা এখন পর্যন্ত শক্তিরও (Power) সর্বপ্রধান উৎস। যানবাহন, কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন, নিত্য সংসারযাত্রা, প্রভৃতিতে এখনও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কয়লা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত সপ্তম স্থানাধিকারী। ভারতের কয়লা-খনির অধিকাংশই পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের 'গাণ্ডোয়ানা অঞ্চলে'

কয়লা এখনও শক্তির সর্বপ্রধান উৎস

অবস্থিত। ইহার মধ্যে আবার পশ্চিমবংগ ও বিহার রাজ্যের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো এবং গিরিডির খনি অঞ্চল হইতে মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায়। তাহার পরের স্থানের অধিকারী হইল আসাম। বোম্বাই, রাজস্থান এবং কাশ্মীরেও কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লা হইল অপেক্ষাকৃত নিরেস কয়লা।

গাণ্ডোয়ানা অঞ্চল এবং কয়লাখনিগুলির আঞ্চলিকতা

ভারতের কয়লাখনিগুলির এই আঞ্চলিকতা শিল্পোন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের জন্য পশ্চিমবংগ ও বিহারের কয়লাখনিগুলি হইতে কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে এবং সময়মত কয়লা না পৌছাইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কয়লার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে সঞ্চিতও আছে। অন্ধ্র সরকারও ঐ রাজ্যের কয়লাখনিগুলি হইতে আধুনিক উপায়ে অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কয়লা খনি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আঞ্চলিকতাজনিত ত্রুটি ও ইহার প্রতিকারের প্রচেষ্টা

ভারতের খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমস্যা হইল যে, ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক (Metallurgical) এবং 'কোক' কয়লার (Coking Coal) পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ভূগর্ভে সঞ্চিত সকল প্রকার কয়লার পরিমাণ ৬ হাজার কোটি টন হইলেও * কয়লা বোর্ড কমিটি (Coalfield Committee) দেখাইয়াছিল যে, ইহার মধ্যে 'কোক' কয়লার পরিমাণ মাত্র ২০০ কোটি টন। এই ২০০ কোটি টনের মধ্যে যতটুকু আমরা বাস্তবিকই খনি হইতে উত্তোলন করিতে পারি তাহার পরিমাণ মাত্র ১৬০ কোটি টন। ১৯৫০ সালের ধাতুনিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ কমিটির (Metallurgical Coal Conservation Committee, 1950) রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে উপরি-উক্ত অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া অর্ধেক হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ১৯৫২ সালে ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার বাৎসরিক উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952] নামে একটি আইন পাস করা হইয়াছে এবং সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বনের জন্য একজন কমিশনারের (Coal Commissioner) অধীনে কয়লা বোর্ড (Coal Board) নামে একটি বোর্ডও স্থাপন করা হইয়াছে।

কয়লা সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমস্যা ও ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা

* **India—1959**

বর্তমানে খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অবলম্বন করা হইতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) উৎপাদনকার্যে কয়লা ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে ধৌতকরণ কারখানা (coal washeries) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল। কমিটি অনতিবিলম্বে এইরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যথাসম্ভব এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভিলাই ও রুরকেলার ইস্পাত কারখানায় কোক কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য ১৯৫৮ সালে একটি জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারগালিতে (Kargali) ২·৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কয়লা ধৌতকরণ কারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বাৎসরিক ২২ লক্ষ টন। দুর্গাপুরের কারখানার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার একটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৭·২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কয়লা চুল্লী কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস হইতে এই চুল্লী কাজ সুরু করিয়াছে। ইহা দৈনিক ১ হাজার টন উৎকৃষ্ট কোক কয়লা সরবরাহ করিবে।

উৎপাদনজনিত ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

১৯৫০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালে ইহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য প্রথমে ৬ কোটি টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় যে উৎপাদন ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে।*

তৈল (Oil)ঃ ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই সামান্য। আসামের ডিগবয় হইতেই যা-কিছু তৈল পাওয়া যায়। এই সূত্র হইতে ৪ লক্ষ টন বা ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ৫ ভাগের কিছু উপর তৈল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তৈলের বাকী অংশ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি অবশ্য আসামের নাহার-কাটিয়া ও মোরাণে দুইটি বৃহৎ তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তৈল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি কূপও ইতিমধ্যে খনন করা হইয়াছে। এই দুই তৈলখনি হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন করিয়া এবং শেষ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টন করিয়া অপরিশুদ্ধ তৈল (crude oil) পাওয়া যাইবে অনুমান করা হইয়াছে। তখন ভারতের মোট প্রয়োজনীয়তার শতকরা ৪০ ভাগ আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতেই মিটিবে। ইহার উপর বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার অববাহিকা অঞ্চলে, পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে, রাজস্থানের জয়শল্মীরে এবং বর্তমান বোম্বাই-ভুক্ত ভূতপূর্ব সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধানকার্যও চলিতেছে। সরকারী বিবৃতি অনুসারে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত ক্যাম্বেতে তৈলখনির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। আশা করা হইতেছে যে ইহা হইতে লাভজনকভাবে তৈল উৎপাদন করা

তৈলের অভাব পূরণ-করণের নূতন প্রচেষ্টা

* India—1959

সম্ভব হইবে। অপরদিকে আবার ইক্ষু অপজাত (by-product) এবং কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করিয়া তৈলের এই অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্তমানে এই সূত্র হইতে ২ কোটি গ্যালনের মত তৈল উৎপন্ন হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (Standard Vacuum Oil Co.) ও ক্যালটেক্স (Caltex) এবং ব্রিটিশ কোম্পানী বার্মা শেলের (Burmah Shell) তিনটি পৃথক্ চুক্তি দ্বারা তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উহাদের মধ্যে বার্মাশেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়ামের কারখানা দুইটি বোম্বাইএর নিকট ট্রম্বেতে এবং ক্যালটেক্সের কারখানাটি অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত হইয়াছে। অপরিশুদ্ধ তৈল প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে আমদানি করা হয়। প্রথমে শোধনাগার তিনটির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ৪৩ লক্ষ টন। পরে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৫০ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বর্তমানে নাহারকাটিয়া ও মোরাণের খনির তৈল শোধন করিবার জন্য দুইটি শোধনাগার স্থাপনের জন্য একটি সরকারী কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। শোধনাগার দুইটির মধ্যে একটি বিহারের বারৌণী এবং অপরটি আসামের গৌহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আসামের শোধনাগারটি স্থাপনের জন্য রুমানিয়া সরকার দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদান করিবে।

তৈল শোধনাগার স্থাপন

(২) ধাতব খনিজ (Metallic Mineral) : ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ আকর, ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট, তাম্র, স্বর্ণ এবং ইউরেনিয়ামই প্রধান।

লৌহ-আকর (Iron Ore): লৌহ-আকরের দিক দিয়া ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ভারতের কোন কোন স্থানের লৌহ-আকর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছিও লৌহ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, এশিয়ার মধ্যে ভারতেই সর্ববৃহৎ লৌহ-আকরের খনি আছে এবং ইহার পরিমাণ এত অধিক যে হাজার বৎসরেও ইহা নিঃশেষ হইবে না। সরকারী হিসাব অনুসারে আনুমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ২,১০০ কোটি টন।

লৌহ-আকরে ভারত সমৃদ্ধ দেশ

বিহারের সিংভূম জিলা এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেওনঝর অঞ্চলের লৌহ-আকর সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, পশ্চিমবংগ, মাদ্রাজ এবং হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলেও লৌহ-আকর পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত ব্যুরোর (The Indian Mineral Resources Bureau) মতে, মাদ্রাজের সালেম ও নেলোর অঞ্চলে অফুরন্ত লৌহ-আকর ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। এগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। আনুমানিক ২,১০০ কোটি টন সঞ্চয়ের মধ্যে মাত্র ৬০০ কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।*

* **India—1959**

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ইহা অন্যতম সৌভাগ্য যে, যে-সকল অঞ্চলে লৌহ-আকর পাওয়া যায় প্রধানত সেই সকল অঞ্চলেই কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। ফলে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) সুসংগঠিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দিন দিন ইহা ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে। এ-সম্পর্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। ১৯৫০ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ টন লৌহ-আকর খনি হইতে উত্তোলন করা হয়; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৬ লক্ষ টনেরও উপর দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিগু লৌহ (pig iron) এবং ইস্পাত তৈয়ারির পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে অন্তত মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন লৌহ-আকর উত্তোলনের কথা আছে।*

ভারতে কয়লা ও লৌহ কাছাকাছি পাওয়া যায়

ম্যাংগানীজ-আকর (Manganese Ore): ম্যাংগানীজ হইল অন্যতম গঠনকারী ধাতু (Structural Metal)। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ম্যাংগানীজ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্পাত শিল্পই প্রধান। ম্যাংগানীজেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উৎপাদনের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে ম্যাংগানীজ-আকর সঞ্চিত আছে এবং এই দুই রাজ্য হইতেই দেশের মোট ম্যাংগানীজ-আকর শতকরা ৯০ ভাগের উপর উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং রাজস্থানেও এই খনিজ সম্পদ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

ম্যাংগানীজের উপযোগিতা

ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট ম্যাংগানীজ-আকরের পরিমাণ ১১.২ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ১৯৫০ সালের পূর্বে বৎসরে গড়ে ৬ লক্ষ টন করিয়া ম্যাংগানীজ-আকর উৎপন্ন হইত। ১৯৫৬ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া ১৫ লক্ষ টনের উপর দাঁড়ায়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন ম্যাংগানীজের অধিকাংশই বিদেশে চালান যাইত। বর্তমানে বহু পরিমাণে ম্যাংগানীজ ভারতীয় শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উৎপাদনের লক্ষ্য ২০ লক্ষ টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পসমূহে উত্তরোত্তর ম্যাংগানীজের ব্যবহারবৃদ্ধি

বক্সাইট (Bauxite): বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়। বোম্বাই, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে বক্সাইট পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আকর হইল মাত্র ৩.৫ কোটি টন। ১৯৫০ সালে মোট ৬৪ হাজার টন বক্সাইট উৎপাদন করা হয়। ১৯৫৫ সালে ইহা বাড়িয়া ৮১ হাজার টনে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ বক্সাইট

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা দেখ।

উৎপাদন অতি সামান্য, কারণ ইহা হইতে মাত্র ৪ হাজার টনের কিছু উপর এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইতে পারে। বক্সাইট হইতে আরও এলুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে প্রধান বাধা হইল সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িলে এই অন্তরায় দূর হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের মত বক্সাইট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে বাধা

তাম্র (Copper) : প্রধানত বিহারের সিংভূম জিলায় এবং হিমালয়ের গাড়ওয়াল অঞ্চল, কুলু উপত্যকা, সিকিম, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও রাজস্থানের কোন কোন অংশে কিছু কিছু তাম্র পাওয়া যায়। তবে বিহারের সিংভূম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের তাম্রের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব নাই, কারণ এই সকল অঞ্চলে তাম্রকে খনি হইতে উত্তোলন করার খরচ পোষায় না। পূর্বে ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধ তাম্রশিল্প ছিল, বর্তমানে কিন্তু একমাত্র বিহারের সিংভূম জিলার তাম্র কারখানা অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে। বর্তমানে ভারতে ৩.৫ লক্ষ টনের মত তাম্র উৎপন্ন হয়।

তামের উৎপাদন কমিতেছে

স্বর্ণ (Gold) : ভারতে বাৎসরিক স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ অধিক নহে। বর্তমানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়া ২.৫ লক্ষের মত আউন্সে দাড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপন্ন হয় একমাত্র মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি হইতে। বাকী অংশ আসে হায়দরাবাদের হাট্টি (Hatti), অন্ধ্রের অনন্তপুর এবং স্বুবর্ণরেখা, বৈতরণী, প্রভৃতি বিভিন্ন নদীর বালু এবং অন্যান্য খনি হইতে।

ইউরেনিয়াম (Uranium) : ইউরেনিয়াম আণবিক শক্তি উৎপাদনের কার্যে অপরিহার্য বলিয়া সম্প্রতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতে ত্রিবাংকুর-কোচিন এবং আরও কোন কোন অঞ্চলে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

(৩) অ-ধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals) :

ভারতের অ-ধাতব খনিজের মধ্যে লবণ, চুনাপাথর, অভ্র, চীনামাটি এবং জিপসাম প্রধান।

লবণ (Salt) : লবণ যে শুধু দৈনন্দিন খাদ্যের পক্ষে অপরিহার্য তাহাই নহে। কষ্টিক সোডা, বস্ত্রাদি ধৌতকরণের সোডা, প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতেও লবণের প্রয়োজন হয়। ভারতে লবণ তিনটি সূত্র হইতে পাওয়া যায়—যথা, (১) রাজস্থানের লবণাক্ত জলের হ্রদসমূহ (প্রধানত সম্বর হ্রদ) হইতে, (২) রাজস্থান ও হিমাচলপ্রদেশের লবণাক্ত প্রস্তরসমন্বিত পর্বতমালা হইতে, এবং (৩) সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে।

কিছুদিন পূর্বেও ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। সুতরাং বৎসরে ১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া এদেশের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে

হইত। বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে; এমনকি কিছু কিছু লবণ বাহিরে রপ্তানিও করিতে পারিতেছে। বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি মণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহাকে ১০ কোটি মণে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

বর্তমানে লবণ উৎপাদনে ভারত স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে

চুনাপাথর (Limestone): চুন, সিমেণ্ট, সোডা, কষ্টিক সোডা, প্রভৃতি উৎপাদন করিতে চুনাপাথরের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় চুনাপাথরের খণ্ড ইটের বদলে বাড়ীঘর নির্মাণের কার্যেও ব্যবহৃত হয়। চিনি শিল্পেও চুনাপাথরের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই পাথর বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহার বাৎসরিক গড় উৎপাদন হইল প্রায় ৬০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে।

অভ্র (Mica): পৃথিবীর মধ্যে ভারতই অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক। সমগ্র বিশ্বে বৎসরে যত পরিমাণে অভ্রের পাত (Sheet Mica) উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ আসে ভারত হইতে। বিহারের হাজারিবাগ ও গয়া জিলা-ই অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের কোন কোন অংশেও অভ্র উৎপন্ন হয়। বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টন।

ভারত অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক

অভ্রের প্রধান ব্যবহারক হইল বৈদ্যুতিক শিল্প। ভারতে যে-পরিমাণে বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অভ্রের উৎপাদন হইল অত্যধিক। সুতরাং অভ্র শিল্পকে বিশেষভাবে রপ্তানির উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান বৎসরে প্রায় ৩.৪ হাজার টন রপ্তানি করা হয়।

অভ্রের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে

চীনামাটি (China Clay): ইহা মৃৎশিল্প, কাগজ ও বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রধানত বিহারেই চীনামাটি পাওয়া যায়। চীনামাটিতে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে চীনামাটি আমদানি করিতে হয়।

জিপসাম (Gypsum): সিমেণ্ট এবং রাসায়নিক সার তৈয়ারি করিতে বিশেষ পরিমাণে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। জিপসামের মধ্যে গন্ধক থাকে। রাজস্থান ও মাদ্রাজে জিপসাম পাওয়া যায়। সিন্ধ্রি প্রভৃতিতে সার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন এবং অধিকতর সিমেণ্ট উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর ধাতু হিসাবে জিপসামের গুরুত্ব এদেশে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ ৯ কোটি টনের কাছাকাছি বলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জিপসামের উৎপাদন ৬ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ২০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

জিপসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি

খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নীতি (India's Minerals Policy) : ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র 'নীতি' ছিল—বলা চলে ; এবং ইহা হইল খনিজ মালিকদের স্বার্থে খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা প্রয়োজনমত জাতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল না।

ব্রিটিশ আমলে সরকারী নীতি

খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-পদ্ধতিও ছিল বিশেষ প্রাচীন ধরনের। অতি অল্প ক্ষেত্রেই খনিতে আধুনিক যন্ত্রিকরণের (mechanization) নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এই কারণে বহু পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতে খনিজ দ্রব্য সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও কিছু করা হয় নাই।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিবার পর পরিকল্পনা কমিশনারের দৃষ্টি স্বভাবতই এ-দিকে পড়ে। ফলে খনিজ সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গবেষণার দিক দিয়া একটি খনিজ দ্রব্য গবেষণা সংক্রান্ত ব্যুরো (Indian Bureau of Mining Research) এবং একটি জ্বালানি খনিজের গবেষণাগার (National Fuel Research Laboratory) স্থাপিত হইয়াছে।

জাতীয় সরকারের নীতি :

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি (Mineral Policy under Planned Economy) : পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ সুরু হইবার পর ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খনিজ সম্পদের বিস্তারিত অনুসন্ধান, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করে।

১। ব্যাপক নীতি গ্রহণ

এই নীতি অনুসারে জিওলজিক্যাল সার্ভে (Geological Survey of India), ভারতীয় খনি সম্পর্কিত ব্যুরো (Indian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতুনিষ্কাশন সম্পর্কিত গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory), কেন্দ্রীয় কাঁচ এবং মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান (Central Glass and Ceramic Research Institute) এবং জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Fuel Research Institute) সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া যাইতেছে।

২। গবেষণার ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি অনুসারে এবং এককভাবে সোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার

অববাহিকা অঞ্চলে, রাজস্থানের জয়শল্মীরে, পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে এবং বর্তমানে বোম্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান চালান হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানের ফলে নূতন নূতন তৈল, কয়লা, তাম্র ও জিপসামের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৩। নূতন খনিজ সম্পদের সন্ধান

১৯৪৮ সালে খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি এবং খনিজ দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন [Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948] পাস করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইয়াছে এবং এগুলিকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। সংরক্ষণ ও আধুনিকিকরণ

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয় যে, কতকগুলি খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে। এই খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ-আকর, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসা, দস্তা, তাম্র, হীরক, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হয়, এই শ্রেণীভুক্ত খনিজ শিল্পগুলি ধীরে ধীরে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) চলিয়া আসিবে এবং মাত্র সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতাই বে-সরকারী উদ্যোগ দ্বারা পূরিত হইবে।

৫। নূতন শিল্পনীতি ও সরকারী উদ্যোগের প্রসার

ইহার পর ভারতীয় সংবিধানকে সংশোধন করিয়া এই ব্যবস্থা করা হয় যে, খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অধিকারকে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত করিয়া কোন আইন পাস করা হইলে তাহা আদালত কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে না। সংবিধান সংশোধনের অব্যবহিত পরেই স্বর্ণ ও হীরক খনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং কয়লাখনির ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। অবশ্য সরকার হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ শিল্পের উন্নয়ন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার উদ্যোগই পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—বে-সরকারী উদ্যোগকে বিলুপ্ত করা হইবে না।

ইহার পর আছে খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক বোর্ড ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবহনজনিত অসুবিধা দূরিকরণের জন্য খনিজ সম্পদ পরিবহন উপদেষ্টা কমিটি (Minerals Transport Advisory Committee) গঠিত হইয়াছে। খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারী নীতি কার্যকরকরণের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Mines and Oil) সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিদপ্তর ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানি মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Steel, Mines and Fuel) সহিত সহযোগিতায় কার্য করে।

৬। আঞ্চলিক উন্নয়ন

৭। নূতন মন্ত্রিসভা

পরিশেষে, উপরি-উক্ত সরকারী শিল্পনীতিকে কার্যকর করিবার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অপর সকল

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন (National Mineral Development Corporation) গঠন করা হইয়াছে। করপোরেশনটি ১৫ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত হইয়াছে। প্রয়োজনমত করপোরেশন অধীনস্থ কোম্পানী গঠন করিয়া রাজ্য সরকার বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে এই উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দিতে পারে।

৮। জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন

উড়িষ্যার কিরিবুরুতে লৌহ-আকর উৎপাদনই হইবে করপোরেশনের প্রধান কার্য। এই অঞ্চল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন করিয়া লৌহ-আকর উৎপাদন করিয়া জাপানে রপ্তানি করা হইবে। রপ্তানিকার্য করিবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation)। লৌহ-আকর উৎপাদন করা সুরু হইবে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করপোরেশন তাম্র উত্তোলনের কার্যও আরম্ভ করিবে। তবে এই কার্যের সূচনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকেও হইতে পারে।

শক্তিসম্পদ (Power Resources): ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, কোন দেশের শক্তিসম্পদের উপাদান হইল জনশক্তি (Man power), প্রাণিশক্তি (Animal power), বনভূমি (Forests), কয়লা, তৈল এবং জলবিদ্যুৎ। কিন্তু শক্তিসম্পদের পর্যালোচনায় সাধারণত শেষোক্ত তিনটি উপাদানেরই আলোচনা করা হয়। আমরা এই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শক্তিসম্পদের পর্যালোচনা করিব। অবশ্য ভারতের প্রাণিসম্পদ ও জনসংখ্যা আলোচনা প্রসংগে জনশক্তি ও প্রাণিশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ মাত্রায় ইংগিত দেওয়া হইবে।

ব্যাপক দৃষ্টিতে শক্তি-সম্পদের উপাদান

কয়লা (Coal): ভারতের খনিজ সম্পদের আলোচনা প্রসংগে কয়লার পরিমাণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে একরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কয়লা-খনি শিল্পের আলোচনা প্রসংগে এই শিল্পের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে। এখনও পর্যন্ত ভারতে কয়লা শক্তির প্রধান উৎস বলিয়া পরিগণিত। বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন, বিভিন্ন প্রকারের কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতিতে কয়লাই এখনও পর্যন্ত প্রধান শক্তি সরবরাহকারী হিসাবে কার্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ভারতে ভাল 'কোক' কয়লা ও ধাতু নিষ্কাশনকারী কয়লার (metallurgical coal) সঞ্চিত পরিমাণ বিশেষ অধিক নহে।* সুতরাং সতর্কতার সহিত এই কয়লা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অপর দিকে অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে আণবিক শক্তির ন্যায় নূতন কোন

কয়লার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

কয়লা হইতে অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপাদন

* ২৪ পৃষ্ঠা

শক্তির আবিষ্কারে কয়লার ব্যবহার একরূপ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই আশায় বিবেচনাবিহীনভাবে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট কয়লার ধ্বংসের সপক্ষে কোনমতেই মত দেওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ একরূপ অফুরন্ত বলিয়া এই কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার সীমাহীন সুযোগ আছে বলা যায়। বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে সারা বৎসরব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য কয়লা লইতে তাপজ বিদ্যুৎ (thermal power) উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

তৈল (Oil): তৈল ও পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদের মধ্যে তৈল কয়লার পরই স্থানাধিকার করে। প্রথমে কয়লা শক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইত; পরে পেট্রোলিয়াম ইহাকে কতকটা স্থানচ্যুত করে। শিল্প-বিপ্লবের দিক হইতে দেখিলে বিপ্লব সংঘটিত করে কয়লার ব্যবহার এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে তৈল। শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ক্রমে কয়লার স্থানাধিকাব করে। ভারতে কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া কয়লার পরিবর্তে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। তবুও ভারতে নানাভাবে তৈলের যোগানের পরিমাণকে বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। তিন-চারিটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়া, আসাম ও পশ্চিমবংগের অববাহিকা ক্যাম্বে জয়শল্মীর জ্বালামুখী প্রভৃতি অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান করিয়া, নিকৃষ্ট কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) এবং ইক্ষু ভুট্টা বার্লি প্রভৃতির অপজাত হইতে শক্তি সুরা[illegible]র (power alcohol) উৎপাদন করিয়া তৈলের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবা[illegible] চেষ্টা করা হইতেছে। সরকারী হিসাব অনুসারে তৈল শোধনাগার তিনটি স্থাপনের ফলে বর্তমানে বৎসরে ৫ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange, বাঁচিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ-সকল চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় তৈলের সরবরাহ কখনও পর্যাপ্ত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, শক্তির উৎস হিসাবে তৈলকে অধিকাংশ সময় প্রধান স্থান দেওয়া যায় না। কারণ, শক্তির এই উৎস বিশেষ সুলভ নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের পক্ষে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়ন-ব্যবস্থায়, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্য কোনরূপ শক্তির উৎসের প্রয়োজন। এই শক্তি হইল জলবিদ্যুৎ—ভারতে যাহার সীমাহীন সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ব্যবহারের সীমা

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity): সাম্প্রতিক যুগের অর্থ-ব্যবস্থায় জলবিদ্যুতের ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব। উন্নত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদন, যানবাহন পরিচালন, কৃষিকার্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিকেই জলবিদ্যুৎ একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় জলবিদ্যুতের ভূমিকা

ভারতের উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, ধাতুনিষ্কাশনমূলক (metallurgical) প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহনে, দৈনন্দিন ঘরকন্নার কার্যে বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে করিবে।

শিল্প-ব্যবস্থায় কয়লা ও জলবিদ্যুতের তুলনামূলক উপকারিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, জলবিদ্যুৎ শুধু যে সুলভ তাহাই নহে—জলবিদ্যুৎ শিল্পের উপযুক্ত স্থাননির্দেশেও সহায়তা করে। ভারতের কয়লাখনিগুলি একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করার ফলে ভারতে অকাম্যভাবে শিল্পের আঞ্চলিকতা ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ছড়াইয়া (dispersal) দিয়া আঞ্চলিকতার ত্রুটি দূর করা। এই কার্য জলবিদ্যুতের মাধ্যমেই সাধিত হইতে পারে। জলবিদ্যুতের উৎপাদন-কেন্দ্র একস্থানে অবস্থিত হইলেও বহুদূরে ইহার সরবরাহের ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারকল্পে প্রতিটি গৃহে ইহা পৌঁছাইয়া দেওয়াও সম্ভব। জাপান সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে সুলভ জলবিদ্যুতের দান।

শিল্পে জলবিদ্যুতের ভূমিকা

কুটির শিল্পে জলবিদ্যুতের উপযোগিতা

কৃষির উন্নয়নেও আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। নলকূপ প্রোথিত করা এবং কূপ ও নলকূপ হইতে জল উত্তোলনের কার্যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে লাগাইয়া ভারতের শুষ্ক কৃষি-জমিতে জলসেচের সমস্যার সমাধান কতক পরিমাণে করা যাইতে পারে। কৃষির যন্ত্রিকরণ (mechanization) ব্যবস্থাতেও ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কৃষি-জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

কৃষির উন্নয়নে জলবিদ্যুৎ

যানবাহনের কার্যে জলবিদ্যুৎকে আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া শিল্প-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিবে গ্রামাঞ্চলের স্বতন্ত্র নির্জন অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং গ্রাম জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর করিয়া আধুনিক, উন্নত জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করিবে।

যানবাহনে জলবিদ্যুৎ

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য মাথা পিছু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়কে জীবনযাত্রার মানের অন্যতম সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন (Generation of Hydroelectricity in India)ঃ কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের শক্তি শাখার [Water and Power Commission (Power Wing)] হিসাব অনুসারে ভারতে বিভিন্ন উৎস হইতে আমরা ৪·১ কোটি কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন

করিতে পারি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য শুরু হইলেও এ-পর্যন্ত (১৯৫৮-৫৯) আমরা উপরি-উক্ত সম্ভাবনার মাত্র এক-দশমাংশ উৎপাদন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছি। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রহিয়া গিয়াছে। ১৯৫৮ সালের হিসাবে ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ৩৫ কিলোওয়াট মাত্র। তুলনামূলকভাবে দেখিলে নরওয়েতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৭,২৫০ কিলোওয়াট, কানাডায় ৫,৪৫০ কিলোওয়াট, ব্রিটেনে ২,০০০ কিলোওয়াট, জাপানে ৮৫০ কিলোওয়াট, সোবিয়েত ইউনিয়নে ৯৬০ কিলোওয়াট এবং সমগ্র পৃথিবীর গড় হইল ৬৭০ কিলোওয়াট।* অতএব দেখা যাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর গড় আমাদের দেশের অপেক্ষা প্রায় ২০ গুণ অধিক। ইহা ভারতের অর্ধোন্নত অবস্থার আর একটি পরিচায়ক। তবে আশার কথা যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে মাথাপিছু উৎপাদন ছিল মাত্র ১৪ কিলোওয়াট। এখন উহা ৩৫-এ পরিণত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫০-এ পরিণত হইবে আশা করা হইতেছে। সেচ-ব্যবস্থার প্রসংগে জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে।

উৎপাদনের পরিমাণ অত্যল্প

ইহা অনগ্রসরতার লক্ষণ

বনসম্পদ (Forest Resources) ঃ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃতি-প্রদত্ত আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইল ভারতের অরণ্যভূমি। প্রকৃতপক্ষে, বনসম্পদ ভারতের পক্ষে অন্যতম গর্বের বিষয়। কিন্তু অরণ্যভূমির পরিমাণ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ হইল ২.৮১ লক্ষ বর্গমাইল। ইহা মোট স্থলভূমির শতকরা ২২.৩ ভাগ মাত্র।** ইহার মধ্যে আবার শতকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল—কারণ ইহা বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই অনুপাত অত্যন্ত কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে স্থলভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইল বনভূমি ; ইহা সত্ত্বেও বনসম্পদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ঐ সকল দেশ বনভূমির আরও প্রসার করিবার পক্ষপাতী। অনেকের মতে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোট স্থলভাগের অন্তত এক-চতুর্থাংশ অরণ্য দ্বারা আবৃত থাকিবে। কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমিই—এক-চতুর্থাংশ নহে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (FAO) হিসাব অনুসারে ইন্দোনেসিয়ার স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের স্থলভাগের শতকরা ৩০ ভাগ অরণ্য দ্বারা আবৃত। বননীতির উপর সরকারী প্রস্তাব অনুসারে ভারতের মোট স্থলভাগের অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি দ্বারা আবৃত থাকিবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে

ভূমির আয়তন পরিমাণ

ভারতে অরণ্যভূমির অনুপাত অতি অল্প

* India—1959. ** India—1959.

অরণ্যভূমির পরিমাণ হইবে শতকরা ৬০ ভাগ আর সমভূমিতে উহা হইবে শতকরা ৩০ ভাগ। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে অরণ্যভূমির অনুপাত যে অতি অল্প তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের অনেক অরণ্যই নামেমাত্র অরণ্য এবং উহাদের গুরুত্ব অতি অল্প।

বনভূমির অনুপাত হ্রাসের কারণ

চিরকালই অবশ্য এইরূপ অত্যল্প অনুপাত ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দেশের বনভূমি ভারতের পক্ষে পার্যপ্ত ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরিকরণ এবং রেলপথের প্রসারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একরূপ পরিকল্পনাবিহীনভাবেই বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইয়াছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বনভূমির সংরক্ষণ ও প্রসারের দিকে হয়ত' কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইযাছিল। কিন্তু বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, কোন নীতি বা তত্ত্ব স্মরণ না রাখিয়াই অরণ্যের ধ্বংস সাধন করা হইয়াছে।

সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

অরণ্যভূমির এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতে বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা হইল বণ্টন লইয়া। বণ্টনের দিক দিয়া ভারতের অরণ্যসম্পদ বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। কোন কোন রাজ্যে এরূপ গভীর বনভূমি দৃষ্ট হয় যে তাহাকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়াই অভিহিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কেরল ও মধ্যপ্রদেশের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। এই দুইটি রাজ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। অপরদিকে রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য এবং বোম্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ এত অল্প যে ইহাকে বিপজ্জনক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। পাঞ্জাবের কোন কোন অংশে বনভূমির অনুপাত মোট স্থলভূমির শতকরা ৩ ভাগের কম; সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে ইহা শতকরা ৪ ভাগের সামান্য উর্ধ্বে মাত্র। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে বনভূমির অনুপাত ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এই সকল রাজ্যের সমভূমি অঞ্চল হইল মরুসদৃশ। আবার ত্রিপুরা এবং বর্তমানে হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুর অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত শতকরা ৭০ ভাগেরও অধিক। পশ্চিমবংগ, বিহার ও উড়িষ্যায় এই অনুপাত হইল যথাক্রমে ২০, ২০ ও ২৪।

বনভূমির বণ্টন-সংক্রান্ত সমস্যা

অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্য মরুভূমির প্রসার

বলা হইয়াছে, অরণ্যভূমির বণ্টনজনিত এই ত্রুটি হইল ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা। অন্য এক দিক দিয়া ইহাকে প্রথম ও প্রধান সমস্যারূপেও গণ্য করা চলে। ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ আধুনিক নির্ধারিত মানের তুলনায় অল্প হইলেও অত্যল্প নহে; কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা এত অল্প যে এই অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্য মরুভূমির প্রসার ঘটিতেছে। সুতরাং এ

দিকে দৃষ্টি না দিলে দূর ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণেই বণ্টন-জনিত ত্রুটি দূরিকরণকেই অনেকে ভারতে বনসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যার প্রধান সমাধানরূপে গণ্য করেন।

বনভূমির উপযোগিতা (Utility of Forests) ঃ অধ্যাপক জাথার ও বেরীর ভাষায় বলা যায়, যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় প্রকার উপযোগিতাই রহিয়াছে। প্রথমেই পরোক্ষ উপযোগিতা লইয়া আলোচনা করিতে হয় কারণ ইহা প্রত্যক্ষ উপযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে। বনভূমির প্রভাবে আবহাওয়ার চরমভাব নষ্ট হয়। বনভূমি আবার আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে বলিয়া ইহার ফলে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রিত করে। মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় নিবারণ, কৃষি-জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, বন্যার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা, পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পতন রোধ করা প্রভৃতিও বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা। বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসারও বন্ধ করে। মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বে বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যবস্থা করা যায়। বনভূমির অস্তিত্বের জন্য দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও নয়নাভিরাম হইয়া উঠে। বনভূমি দেশের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ (flora) এবং জীবজন্তুর (fauna) আশ্রয়স্থল। পূর্বে প্রতিরক্ষার দিক দিয়াও বনভূমির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বর্তমানে গরিলা যুদ্ধের (guerilla warfare) জন্যও বনভূমি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

[margin: বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা]

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা উদ্ভূত হয় বনজাত দ্রব্যাদি হইতে। প্রধান প্রধান বনজাত দ্রব্যাদি (major forest produce) বলিতে আসবাব ও ঘড়গাড়ী তৈয়ারির কাঠ, রেলপথের কাঠ, জ্বালানি প্রভৃতিই বুঝায়। বিভিন্ন শিল্পের জন্য যে-সকল কাঁচামাল বন হইতে সংগৃহীত হয় তাহাদিগকেই অপ্রধান বনজাত দ্রব্যাদি (minor forest produce) বলে। এই অপ্রধান বনজাত দ্রব্যাদির মধ্যে কাগজ শিল্পের জন্য বাঁশ ও সাপুই ঘাস, নৌকা ও দিয়াশলাই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, চামড়া শিল্পের জন্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, রঞ্জন, লাক্ষা ও ঔষধ তৈয়ারির জন্য বিবিধ পত্রগুল্মাদি, খবরের কাগজ তৈয়ারির জন্য বাঁশ প্রভৃতিই প্রধান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনী কাষ্ঠ হইতে চিনি ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা ভারতেও সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

[margin: বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা]

গোচারণ-ক্ষেত্র হিসাবে এবং গবাদি পশুর খাদ্যের যোগানেও বনভূমির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। বনভূমি হইতে এই সকল দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী, কাঠের কারবারী, পত্রগুল্মাদি সংগ্রহকারী, ঔষধ নির্মাতা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বনভূমি হইতে সরকারের সরাসরি প্রচুর আয়ও হয়।

[margin: নিয়োগের দিক দিয়া বনভূমির গুরুত্ব]

ভারত সরকারের বননীতি (Forest Policy of the Government of India)ঃ ভারত সরকারের বর্তমান বননীতি আলোচনা করিবার পূর্বে সামান্য ঐতিহাসিক পরিক্রমার অবতারণা করা প্রয়োজন। কারণ, ইহা ব্যতিরেকে বর্তমান বননীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ভারতে বননীতি বলিতে কোন কিছু ছিল না; বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইত। অরণ্যকে উৎপাদনাভিমুখী (productive) করিবার কোন ব্যবস্থাই তখন পর্যন্ত করা হয় নাই। ধীরে ধীরে সরকার ভারতের বনসম্পদের উপযোগিতা ও ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একজন বনভূমির ইনস্‌পেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হন, বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপিত হয়; বনভূমি শ্রেণীবিভক্ত হয়।

ইহার পর বনভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিদ্যালয় (Forest School) ও বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার (Forest Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সরকারী বননীতির উদ্দেশ্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বেই এই কার্য সমাধা হইলেও ইহাদিগকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বা সুপরিকল্পিত নীতি বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না। এ-পর্যন্ত সরকারের বননীতি দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হইতেছিল—(১) বনভূমি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং (২) জলবায়ুর উপর প্রভাবের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে পরস্পরবিরোধী। সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়; এবং অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইলে বনভূমির প্রয়োজনমত সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের সমবায়ে গঠিত বননীতিই বিংশ শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক অবধি কার্যকর ছিল।

ভারতীয় কৃষি-কমিশন ও বননীতির লক্ষ্য পরিবর্তন

১৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) কৃষিকার্যের দিক হইতে বনভূমির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বনভূমির সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী হইতে সুপারিশ করে। ক্রমে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির সংরক্ষণ, অরণ্যজাত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার শিল্পের প্রসার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার বিভিন্ন শিল্পে উত্তরোত্তর অরণ্যজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার লইয়া গবেষণা করিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পূর্বে এ-সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইতে থাকে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতই এদিকে পড়ে; এবং শ্রী কে. এম. মুন্সী যখন খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযানের

সংগে 'অধিক বৃক্ষ রোপণ কর' অভিযান বা বন মহোৎসব যুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের জুলাই-এ প্রথম 'বন মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা বার্ষিক কার্যসূচীতে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন কার্য করিতে থাকে, এবং কমিশন বনসম্পদবৃদ্ধিকে কৃষির উন্নয়নের অপরিহার্য পরিপূরক বলিয়া ঘোষণা করে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এক ব্যাপক বননীতি গ্রহণের জন্যও কমিশন সুপারিশ করে। এই উদ্দেশ্যে – অর্থাৎ ব্যাপক বননীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অরণ্যরক্ষক বোর্ড (Central Board of Forestry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাতীয় সরকারের বন-নীতি—বন মহোৎসব

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ

বর্তমান বননীতির মূলসূত্র

পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ ও অরণ্যরক্ষক বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক বননীতি গৃহীত হয়। দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নীতিকে পরিচালিত করা হইতেছে। প্রথমত, অরণ্যসম্পদের দীর্ঘকালীন উন্নতিবিধান করা। দ্বিতীয়ত, অদূর ভবিষ্যতে কাষ্ঠের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা হইবে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা। সংক্ষেপে ১৯৫২ সালের বননীতির মূলসূত্রগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত হইবে স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল ভূমিতে শতকরা ৩০ ভাগ।*

(২) সমপরিমাণ নূতন বনভূমির পত্তন না করিয়া বনভূমির কোন অংশের ধ্বংসসাধন করা যাইবে না।

(৩) পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়া বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৪) দুর্গম বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(৫) চারণভূমি এবং জ্বালানি কাঠ সরবরাহের জন্য গ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে সাধারণ বনভূমির পত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) বিভিন্ন শিল্পে বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং শিল্পসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরন্তু, মরুভূমি অঞ্চলে বনভূমি পত্তনের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম অংশে প্রস্থে পাঁচ মাইল এক বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া এই মরুভূমির অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা হইতেছে। এই বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২,০০০ বর্গমাইল হইবে। দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগারের সম্পূর্ণ আধুনিকিকরণ ও কার্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই

রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার বন্ধের প্রচেষ্টা

* ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা (Soil Conservation Wing) যুক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে যে-সকল মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অরণ্যভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হইল তাহাদের অন্যতম প্রধান কার্য।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যের জন্য মোট ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণের ফলে ৭৫ হাজার একর মরুসদৃশ ভূমি অরণ্য শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, বৎসরে ৩ হাজার একর করিয়া দিয়াশলাই কাষ্ঠের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে, বনভূমির মধ্যে ৩ হাজার মাইলের মত সড়ক নির্মিত হইয়াছে এবং ২০ লক্ষ একর অরণ্যভূমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা

পরিবর্তিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বনভূমির পুনর্বাসন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য ২৪·৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।* এই অর্থব্যয়ে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার (afforestation) এবং ১ লক্ষ ১৫ হাজার একরের মত জমিতে নূতন বনভূমির পত্তন করা হইবে। এই ১ লক্ষ ১৫ হাজার একর নূতন বনভূমির মধ্যে ৫০ হাজার একর জমিতে দিয়াশলাই শিল্পের জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতির মত কাঁচামাল সরবরাহকারী বৃক্ষ রোপণ করা হইবে এবং ৫০ হাজার একর জমিতে সেগুন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বৃক্ষ রোপিত হইবে। বাকী ১৫ হাজার একর নিযুক্ত হইবে গঁদ প্রভৃতির জন্য বৃক্ষ এবং ঔষধপত্রাদির জন্য গুল্মাদি রোপণে। ইহা ছাড়া বনভূমির মধ্যে ৭ হাজার মাইলের উপর সড়কের উন্নতিসাধন বা নির্মাণ করা হইবে। সম্প্রতি বনসম্পদের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। বনভূমির উন্নততর তদারক ও বনসম্পদের গবেষণাই এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। বর্তমানে মোট বাৎসরিক ব্যয় ১০ কোটি টাকার উপর। নানাস্থানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার, নূতন বনভূমি পত্তন বা পুরাতন বনভূমির সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে অরণ্যসম্পদের সম্প্রসারণ ও মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বনসম্পদ

প্রাণিসম্পদ (Animal Resources) : ভারত নানাপ্রকার বন্য ও গৃহপালিত জীবজন্তুর বাসভূমি। ভারতের ক্ষেত্রে জীবজন্তুর মধ্যে গরু ও মহিষই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে গো-মহিষে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতম দেশ।

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

১৯৫৬ সালের পঞ্চবার্ষিকী পশু আদমসুমারি অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র গরুর ১৯ ভাগ এবং মহিষের প্রায় অর্ধেক, ভারতেই আছে। সংখ্যায় ইহারা হইল যথাক্রমে ১৫.৫ কোটি ও ৪.৫ কোটি। সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের গো-মহিষ উৎকৃষ্ট জাতের নয়। দুগ্ধদান ও শক্তির উৎস—উভয় ব্যাপারেই ইহারা অন্যান্য উন্নত দেশের গো-মহিষাদির সমকক্ষ নয়। ভারতের গো-মহিষাদির প্রায় এক-দশমাংশ একেবারেই অকেজো। তবুও সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহাদের দ্বারা হল-কর্ষণ, জলসেচ ও ভারবহনের কার্য একরূপ সমাধা করা হয়; এবং ইহাদের হইতে দুগ্ধ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও বেশ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। গো-মহিষাদির পরে আছে গাধা, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি। ছাগল প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস সরবরাহ করে; গাধা ও উট ভারবাহী পশু হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে; এবং ভেড়া হইতে পশম ও মাংস পাওয়া যায়। ভারতে ভেড়া ও উটের সংখ্যা অধিক নয়।

সংখ্যায় ভারতের গো-মহিষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক

পশুপালন সমস্যা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইহার কারণ হইল পশুচারণ ভূমি ও পশুখাদ্যের অভাব, উন্নত পশুপালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সাধারণ লোকের দারিদ্র্য। পশুখাদ্যের অভাবের জন্যই ভারতের মোট গো-মহিষাদির এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের খাদ্যের অভাব মিটাইবার জন্য নূতন নূতন কৃষি-জমির সন্ধান করা হইতেছে। এ-ক্ষেত্রে পশুখাদ্যের জন্য অধিক জমি ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ লোকের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুপালন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই; ধারণা থাকিলেও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে অধিকাংশ সময় কার্যে রূপদান করিতে পারে না। কিন্তু প্রাণিসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং পশুপালন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উন্নততর পদ্ধতিতে পশুপালনের নীতি ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হইয়াছে এবং সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ (Directive Principle) অনুসারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ইহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ভারতের পশুপালন সমস্যা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬০টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়া চারণভূমির উপর হইতে চাপ কমাইবার নীতি ঘোষিত হয়। তুলনামূলকভাবে অকেজো গো-মহিষাদিকে যেখানে স্বল্পতার প্রশ্ন নাই এরূপ দূরের চারণভূমিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নাই; ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে মাত্র ২৫টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়; এবং প্রতিষ্ঠিত গো-সদনগুলিও প্রয়োজনীয় চারণভূমি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গো-সদন প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মূল গ্রাম-পরিকল্পনার (key village scheme) প্রতি। এই পরিকল্পনায় উন্নততর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রজনন

প্রথম পরিকল্পনায় গো-পালন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবস্থা

পদ্ধতিতে উন্নততর জাতের গো-মহিষাদির সৃষ্টি করা হয়। পশুখাদ্য সরবরাহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা হয়।

পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ হইল ৫৬ কোটি টাকা। ইহার দ্বারা মূল গ্রামের সংখ্যা ১,২০০-র মত বৃদ্ধি করা ছাড়াও ১,৯০০ নূতন পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পশুমড়ক নিবারণ, উন্নত শ্রেণীর পশম অধিক পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা, হাঁস-মুরগী পালনের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the mineral resources of India and point out their utility for its industrial development, [C. U. B. A. 19 7] (২২-২৯ পৃষ্ঠা)

2. Give a critical estimate of the minerals policy of the Government of India. (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

3. Indicate the importance of forests in the economic life of India. (৩৭ পৃষ্ঠা) [C. U. B. Com. 1948, '50]

4. Give an account of the forest policy of the Government of India. (৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)

5. Briefly describe the power resources of India. (৩২-৩৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

কোন দেশের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হইল উহার জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা। "প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক উপাদানগুলির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"* অতএব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরই ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহা পরিমাপের পদ্ধতি কি? বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা জাতীয় আয়কে দুইটি দিক হইতে দেখিতে পারি। একদিক দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ে যে-সমস্ত সামগ্রী ও

* Benham—Economics.

সেবামূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার নীট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়। বিদেশজাত নীট আয়কেও এই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার অপরদিক হইতে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপাদানসমূহ আয় হিসাবে যে মোট অর্থ উপার্জন করে তাহাই হইল জাতীয় আয়। উপরে যে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা সাধারণত এক বৎসরকেই ধরা হয়। যে-দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন একই ফল পাওয়া যাইবে—কারণ একই জিনিসকে আমরা দুইটি দিক হইতে দেখি। উৎপাদন-উপাদানের পারস্পরিক সহযোগে বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যের মূল্যসমষ্টি এবং উৎপাদন উপাদানের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি। তবে পরিমাপের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয়ের বিচার দুই দিক হইতে করা যায়

উপরি-উক্ত দুইটি দিক হইতে জাতীয় আয়েব পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি আছে। ইহারা হইল: (১) উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি বা চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or Final Products Total), এবং (২) উৎপাদন-উপাদানের আয়সুমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমষ্টি (Census of Incomes Method or Factor-Payments Total)।

জাতীয় আয় পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি

(১) উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ উৎপন্নের সমষ্টি—এই পদ্ধতিতে প্রথমে বৎসরে যে-পরিমাণ সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপাদিত হয় তাহার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product)। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা করা না হয়। এই কারণে মাত্র চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থমূল্যই ধরা হয়; মধ্যপর্যায়ের দ্রব্য বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না। কারণ, সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যে উহার মূল্য নিহিত রহিয়া গিয়াছে—যেমন, বস্ত্রের মধ্যেই কাঁচা তুলা বা সুতার মূল্য রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঁচা তুলা বা সুতার মূল্য পৃথক্‌ভাবে যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। এইভাবে নির্ধারিত মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে-অপচয় (depreciation) ঘটিয়াছে তাহার পূর্তির খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) পাওয়া যাইবে।

উৎপাদনসুমারি পদ্ধতি

মোট জাতীয় উৎপাদন

নীট জাতীয় উৎপাদন

উৎপাদন-উপাদানের আয়সুমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমষ্টি—এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বার্ষিক অর্থ-আয়কে যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। উপাদানের অর্থ-আয় বলিতে বুঝায়: (১) মজুরি বেতন ও ভাতা, (২) সকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট আয়, (৩) নীট সুদ, (৪) নীট খাজনা। এইভাবে জাতীয়

উৎপাদন-উপাদানের আয়সুমারি পদ্ধতি

আয় হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ঃ প্রথমত, হস্তান্তর-পাওনা (transfer payments) জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কারণ, কোন উৎপাদনকার্যের জন্য উহা উপার্জিত হয় না। যেমন, আশ্রয়প্রার্থীদের অর্থসাহায্য করা হইলে ঐ অর্থ জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হয় না, কারণ কোন উৎপাদনকার্যের জন্য উহা অর্জিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একাংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, মালিকের নিজস্ব জমি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানের আয় বাজার-মূল্যে নির্ধারিত করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, যে-সমস্ত সামগ্রী বা সেবামূলক কার্যের জন্য অর্থমূল্য দেওয়া হয় না (যেমন, গৃহিণীর কার্য, বাগানের তরিতরকারি যাহা যাহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না, ইত্যাদি) তাহা জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের মত অনগ্রসর দেশে উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে— যেমন, কৃষিজাত দ্রব্যের বিরাট অংশই কৃষকেরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্রব্য-বিনিময় চলে। সুতরাং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব একপ্রকার অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জাতীয় আয় উৎপাদন-পদ্ধতি বা আয়-পদ্ধতি যে-কোনটির সাহায্যেই পরিমাপ করা হউক-না-কেন ফল একই পাওয়া যাইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে উৎপাদনের মূল্যসমষ্টি নির্ধারণের সময় বাজার-মূল্য হইতে অপ্রত্যক্ষ করকে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় পরিমাপের আরও কতকগুলি সমস্যা: (১) জাতীয় আয় পরিমাপের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ও বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যাদির আমদানি-রপ্তানির পার্থক্যকে ধরিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এই উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে উহা আভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে; আর উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে আভ্যন্তরীণ আয় হইতে উহাকে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(২) জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয়, কিন্তু অর্থের নিজের মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত না হইলেও উহার অর্থমূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে—যেমন, কোন দুই বৎসরের উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যের পরিমাণ একই থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অর্থমূল্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় নাই। সুতরাং দুই বৎসরের প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলনা করিতে হইলে অর্থমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়া জাতীয় আয়ের অর্থমূল্য সংশোধিত করিয়া লইতে

জাতীয় আয় ও অর্থমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি

হইবে। মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিচার করিবার সময়ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থের ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (The Utility of National Income Analysis) : বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, বলা হয় কোন দেশের আর্থিক কল্যাণ জাতীয় আয়ের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু এইভাবে আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে।

১। জাতীয় আয়ের সাহায্যে জাতীয় কল্যাণ পরিমাপ করা যায়

উদাহরণস্বরূপ, হীনস্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদিতে ব্যয় করাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় আর্থিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত তাহা সম্ভব হয় না। অবশ্য স্বাস্থ্যোন্নয়নের ফলে জাতীয় উৎপাদন বা আয় কতকটা বৃদ্ধি পাইবে। আবার কোন দেশে বিশৃংখলা বা অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষার জন্য 'পুলিসী ব্যয়' অধিক হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। যাহা হউক হেবারলারের ভাষায় বলা যায়, "অন্যান্য বিষয় সমান ধরিয়া লইলে জাতীয় আয় অধিক হইলে আর্থিক কল্যাণও অধিক হইবে।" দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় হইতে কোন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার প্রকৃত

২। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে জীবন-যাত্রার মান বুঝা যায়

অবস্থা কি তাহা বুঝা যায়। এ-ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র গড়পড়তা আয়ের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কয়েক জনের হাতে গিয়া পড়িতে পারে ; মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যাধিক জনসাধারণের ভাগ্যে জুটিতে পারে। অতএব প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুবিধার জন্য জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় পৃথক্‌ভাবে দেখানও প্রয়োজন।

৩। জাতীয় আয় হইতে অর্থনৈতিক প্রসারের গতি বুঝা যায়

তৃতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কিনা ? তাহা জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে

৪। পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব

উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয় কতটা প্রভৃতি অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করিয়া সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে। এইজন্য জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) বলিয়াছে, "জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।"

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক

বিচার-বিবেচনা করিতে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, মূল্যের স্তর কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ডাঃ বাউলি (Dr. Bowly) বলেন, "দুই দেশের মধ্যে সংখ্যাসূচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কিনা এ-সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।"

৫। বিভিন্ন দেশের সহিত তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয় সহায়তা করে

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India) ঃ ভারতে জাতীয় আয় হিসাবের প্রধান অন্তরায় হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা। ফলে হিসাবে ভুল থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কে তথ্যাদি অ-পর্যাপ্ত। শিল্পের বেলায়ও পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়। মূলধন-গঠন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুষ্কর।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণে অসুবিধা ঃ

১। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব

দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট হইতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ভারতে নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন। আবার এই দেশে হিসাব-রক্ষার প্রচলন বিশেষ নাই। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহকে জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে এবং ঐ ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে চায় না। তৃতীয়ত, উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় হয় না। হয় উহা উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে অথবা উহাকে অন্যান্য দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সহিত সরাসরি বিনিময় করা হয়। এই অসুবিধার জন্য জাতীয় আয় কমিটি আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত (monetary and non-monetary sectors)—এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়াছে। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্র ভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে—কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে (household affairs) চলে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া অর্থোপার্জন করে। পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বিশেষভাবে অসংগঠিত। ফলে উহার পরিমাপ করা সহজসাধ্য নহে।

২। পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন

৩। উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে আসে না

৪। শিল্পক্ষেত্রভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন

৫। অসংগঠিত কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Estimates of National Income of India) : সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সরকার ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই। অধুনা ১৯৪৯ সালে সরকার রাজস্ব মন্ত্রিদপ্তরে

একটি জাতীয় আয় শাখা (a National Income Unit) গঠন করে। এই শাখার কর্তব্য হইল জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব রচনা করা। এই শাখাকে পরিচালিত করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে একটি জাতীয় আয় কমিটিও নিযুক্ত করা হয়। জাতীয় আয় কমিটির হিসাব আলোচনার পূর্বে জাতীয় আয়ের অন্যান্য কয়েকটি হিসাবের সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে।

রাজস্ব মন্ত্রিদপ্তরের জাতীয় আয় শাখা

জাতীয় আয় কমিটি

দাদাভাই নওরোজির প্রথম প্রচেষ্টা

জাতীয় আয়ের হিসাবের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন দাদাভাই নওরোজি। তিনি ১৮৬৭-৭০ সালের হিসাব দিয়াছেন। জাতীয় আয়ের পূর্ববর্তী হিসাবগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হইল :

হিসাবপ্রণেতা	বৎসর	বার্ষিক মাথাপিছু আয়
		টা. আ. পা.
দাভাই নওরোজি	১৮৬৭-৭০	২০—০—০
র্ড ক্রোমার এবং ব্যারবোর (Lord Cromer and Barbour)	১৮৮২	২৭—০—০
ডগ্‌বী (Digby)	১৮৯৮-৯৯	১৭—৮—৫
” ”	১৯০১	১৮—৮—১১
র্ড কার্জন (Lord Curzon)	১৯০০	৩০—০—০
াট্‌কিনসন (F. G. Atkinson)	১৮৭৫	৩০—১—০
” ”	১৮৯৫	৩৯—৮—০
যাদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪—৫—৬
াহা এবং খাম্বাটা	১৯০০-১৪	৩৬—০—০
” ”	যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়	৩৮—০—০
ণ্ডলে শিরা (Findlay Shirras)	১৯২১	১০৭—০—০
” ”	১৯২২	১১৬—০—০
াইমন কমিশন রিপোর্ট (Simon Commission Report)	১৯২৯	১১৬—০—০
: ভি. কে. আর. ভি. রাও	১৯২৫-২৬	৭৬—০—০
” ” ” ” ” ”	১৯৩১-৩২	৬৫—০—০
ার জেমস গ্রিগ্‌ (Sir James Grigg)	১৯৩৭-৩৮	৫৬—০—০
ষ্টার্ণ ইক্‌নমিষ্ট (Eastern Economist)	১৯৩৯-৪০	৭২—০—০

মাথাপিছু আয়ের কতকটা ইংগিত দিলেও এই সমস্ত হিসাবের নানাপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়াছে। বিভিন্ন হিসাবপ্রণেতা বিভিন্ন জিনিস হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর তাহা ছাড়া তাহারা যে-সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছে তাহাও নির্ভুল নয়। তবে ইহাদের মধ্যে ডাঃ রাও-এর হিসাবই অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য আয়-পদ্ধতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর ১৯৪৭-৪৮ সালের এক হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭২ টাকা।

পূর্ববর্তী হিসাবের ত্রুটি

ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করা হয় না। তখন জাতীয় আয়ের হিসাব রচনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জাতীয় আয় কমিটি (National Incomes Committee) নিযুক্ত করা হয়। কমিটি জাতীয় আয় হিসাবের জন্য আয়-পদ্ধতি (Incomes Method) এবং উৎপাদন-পদ্ধতি (Production Method)—উভয় পদ্ধতিরই সাহায্য গ্রহণ করে। কৃষি, পশুপালন, অরণ্যজাত দ্রব্য, মৎস্যচাষ, খনিজ দ্রব্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়োগ করা হয় আর বাণিজ্য, পরিবহন, শাসনকার্য, বিভিন্ন পেশা, গৃহভৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে আয়-পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রিপোর্ট দুইটি এবং ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organisation) কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য হিসাবের ভিত্তিতে গত কয়েক বৎসরের জাতীয় আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

জাতীয় আয় কমিটি নিয়োগ

কমিটি আয়-পদ্ধতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি উভয় পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে

কমিটির রিপোর্ট প্রদান

*** জাতীয় আয়ের হিসাব** (প্রচলিত দামের ভিত্তিতে)

	১৯৪৮ ৪৯	১৯৫০ ৫১	১৯৫৫ ৫৬	১৯৫৭ ৫
কৃষি (Agriculture)	(১)	(২)	(৩)	(৪)
কৃষিকার্য, পশুপালন ও আনুষংগিক কার্য—	৪,১৬০	৪,৭৮০	৪,৪১০	৫ ৫৫
অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন—	৬০	৭০	৭০	৮
মৎস্য চাষ—	৩০	৪০	৫০	৬
মোট:	৪,২৫০	৪,৮৯০	৪ ৫৩০	৫,৬২

* Estimates of National Income—published by the Central Statistic Organisation, Government of India.

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭*
খনিজ কার্য, যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প (Mining, manufacturing and small enterprises)				
খনির কার্য—	৬০	৭০	১০০	১১০
ফ্যাক্টরী—	৫৫০	৫৫০	৭৮০	৮৯০
ক্ষুদ্র শিল্প—	৮৭০	৯১০	৯৭০	৯৭০
মোট :	১,৪৮০	১,৫৩০	১,৮৫০	১,৯৭০
ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও সংসরণ (Commerce, transport and communication)				
সংসরণ—	৩০	৪০	৫০	৫০
রেলপথ—	১৭০	১৮০	২৫০	২৮০
সংগঠিত ব্যাংক ও বীমা—	৫০	৭০	৯০	১০০
অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন—	১,৩৫০	১,৪০০	১,৪৯০	১,৫০০
মোট :	১,৬০০	১,৬৯০	১,৮৮০	১,৯৩০
অন্যান্য সেবামূলক কার্য (Other services)				
বিভিন্ন পেশা ও সুকুমার বৃত্তি—	৪৩০	৪৭০	৫৬০	৫৮০
সরকারী চাকরি—	৪০০	৪৩০	৫৭০	৬০০
বাড়ীর চাকরবাকর—	১২০	১৩০	১৪০	১৫০
গৃহসম্পত্তি—	৩৯০	৪১০	৪৬০	৪৮০
মোট :	১,৩৪০	১,৪৪০	১,৭৩০	১,৮১০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Net domestic product at factor cost)—	৮,৬৭০	৯,৫৫০	৯,৯৯০	১১,৪১০
বিদেশ হইতে উপার্জিত নীট আয় (Net earned income from abroad)—	–২০	–২০	—	–১০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট জাতীয় উৎপাদন = জাতীয় আয় (Net National Output at factor cost = National Income)—	৮,৬৫০	৯,৫৩০	৯,৯৯০	১১,৪১০

উপরে প্রচলিত দামের ভিত্তিতে (at current prices) জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু মূল্যস্তর অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের

* ৪৮ পৃষ্ঠার তালিকার শেষের কলমেও ১৯৫৭-৫৮ সালের পরিবর্তে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইবে।

ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। নিম্নে দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেওয়া হইল:

জাতীয় আয় (হিসাব কোটি টাকায়)

বৎসর	প্রচলিত দামের ভিত্তিতে	১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	৮,৬৫০
১৯৫০-৫১	৯,৫৩০	৮,৮৫০
১৯৫৫-৫৬	৯,৯৯০	১০,৪৮০
১৯৫৬ ৫৭	১১,৪১০	১১,০১০

মাথাপিছু আয় (হিসাব টাকায়)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (at current prices)	২৪৬ ৯	২৬৫ ২	২৬০ ৮	২৯৪·৩
১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (at 1948-49 prices)	২৪৬·৯	২৪৬ ৩	২৭৩ ৬	২৮৪·০

উপরি-উক্ত জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব হইতে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়:

১। বৈশিষ্ট্য: জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে

প্রথমত, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল—কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (at 1948-49 prices) ভারতের নীট জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৮,৬৫০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১,০১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১৭·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে দেখা যায় যে, জাতীয় আয় পূর্বের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বাড়িয়া হয় ১১,০১০ কোটি টাকা।—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৫·১ ভাগ বৃদ্ধি

ায়। প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (at current prices) বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা হয় ১১,৪১০ কোটি টাকা; অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় শতকরা ৪.২ ভাগ বাড়িয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে াতীয় আয়ের পরিমাণ ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে—অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের মধ্যে তকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এখন পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ফলে উহা সম্ভব হইবে না সন্দেহ। যাহা হউক জাতীয় আয় খুব চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও পরিকল্পনা র্তনের ফলে উহার গতি ঊর্ধ্বাভিমুখী হইয়াছে। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালে যে-গতি দেখা াছে তাহা আশংকাজনক। নিম্নে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ʼতীয় পরিকল্পনায় তীয় আয় দ্ধর সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, যদিও মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়িয়াছে কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রার ান বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু : বার্ষিক আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল প্রায় ২৪৭ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বাড়িয়া হয় ২৮৪ টাকা। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।* পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ ারের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।** কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তে হয়, সাধারণ লোকের দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট। অন্যান্য দেশের মাথাপিছু আয়ের গ তুলনা করিলে দেখা যাইবে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অতি সামান্য। ৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৮,৭৮৪ টাকা ৪,০৫৭ টাকা।

জনসাধারণের নযাত্রার মানে ায় উন্নতি পরি- ়ত হয় নাই

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয়ের দ্বারাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝা বে না। কারণ, উহা গড়পড়তা হিসাব মাত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকিলেও বিভিন্ন বেসরকারী হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত ম্যমূলক। জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ সাধারণ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র এক- য়াংশ ভোগ করে। অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মত বিত্তশালী লোক য় আয়ের আর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। বাকিটা মধ্যবিত্তের হাতে যায়।

জাতীয় আয় ব্যবস্থার বৈষম্য

* Review of the First Five Year Plan.

** জাতীয় আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় সেই পরিমাণে নাও বাড়িতে পারে—কারণ ধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

চতুর্থত, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো যে সুসমঞ্জস নয় তাহা উপরের হিসাব হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের মোটামুটি শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি হইতে। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য বেশী। কারখানা-শিল্প জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগের মত যোগান দেয়; অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ শতকরা ৯ ভাগের মত। খনি হইতে জাতীয় আয়ের অংশ শতকরা ১ ভাগেরও কম। পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসরণের অংশ হইল শতকরা ১৭ ভাগের মত। অন্যান্য উৎস হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬ ভাগের মত পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান।

৪। ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সুসমঞ্জস নয়

বিভিন্ন উৎস হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ

জাতীয় আয় কমিটি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছে। প্রথমত, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক হইয়াছে। ১৯৪৯ সাল এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শতকরা ভাগ বাড়িয়াছে। অপরদিকে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৯৪৮- এবং ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩ ভা দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরক আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে অধিক। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সরব প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল।

৫। বেসরকারী উদ্যোগের তুলনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার অধিক

৬। প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরকারের অধিক আয় হয়

১৯৫৭ ৫৮ সালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (National and P Capita Income in 1957-58): ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের যে প্রাথমি হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে উহার নিয়মিত বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৮৩০ কো টাকা। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১·৫ ভাগের মত কম। পূর্ব বৎসরে জাতীয় আয় ছিল ১১০১০ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয়ও ২৮৪ টাকা হই কমিয়া ২৭৬ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই আয় হ্রাসের কারণ হইল কৃ উৎপাদন হ্রাস। ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষিজ উৎপাদন কোটি টাকার মত হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্র হইতে ১৪০ কো টাকার মত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে মোট হ্রাস ১৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৫৮-৫৯ সালে জাতীয় আয়ের হিসাব না পাওয়া গেলেও অনুমান করা হইতে যে এই বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইবে—কা কৃষিজ উৎপাদন আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, ১৯৫৭ ৫৮-সালের কথা ছাড়িয়া মোটামুটিভাবে পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সমর্থন করা যায় যে ভারতে জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Give in brief the important features of Indian economy as revealed by he study of the National Income of India.

[ইংগিত : (১) প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি াওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। (৩) জাতীয় আয়ের ণ্টন-ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। (৪) ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসমঞ্জস নয়। এখনও জাতীয় আয়ের মর্ধেকের মত কৃষি হইতে আসে। কারখানা-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল থাক্রমে শতকরা ৮ ও ৯ ভাগ। (৫) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির ার অধিক। (৬) সরকার প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল...এবং ঃ০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক পরিবেশ

(The Social Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশের মত না হইলেও, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক পরিবেশ ারাও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্ধোন্নত অঞ্চলের অস্তিত্বের অন্যতম কারণই হইল ক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশ। ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ বলিয়া ভারতের ক্ষেত্রে র্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা ধিক। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং সাধারণ ভারতবাসীর জীবন এখনও প্রথা ও সামাজিক মর্যাদা (custom and status) দ্বারা বহুপরিমাণে নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির (materialistic outlook) প্রসার টিলেও অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মবোধ এখনও বিশেষভাবে াগ্রত। এখনও বিশেষভাবে তাহার জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসাবে স্থানাধিকার করিয়া মাছে সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত নিয়মশৃংখলা এবং বাধানিষেধ। তাই ভারতের মর্ধোন্নত অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনায় এই দেশের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সূত্র আছে। ইহাদের সকলই অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করে। বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও প্রথা, বিবাহের সর্বজনীনতা, স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা, উৎসব ইত্যাদিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রভৃতি সকলেরই প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রথম চারিটিকে লইয়াই

ারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক

প্রধানত আলোচনা করিব, কারণ বর্তমানে এইগুলিই ভারতের সমাজ-সংগঠনের প্রধান চারিটি দিক।

বর্ণভেদ প্রথা (The Caste System) : বর্ণভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারতীয় হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে; এইভাবে নির্ধারিত গণ্ডি এতদিন একরূপ অনতিক্রম্যই ছিল।

কবে, কিভাবে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। হিতবাদী জেমস্ মিলের মতে, ইহা হইল শ্রমবিভাগের উপযোগিতায় অনুপ্রাণিত কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্য—অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ শ্রমবিভাগের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবিকার ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি করিয়া। মার্শাল (Dr. Alfred Marshall) বলেন, "....প্রাচীন সভ্যতার রথ যে-যে জাতি চালনা করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর কঠোর বর্ণভেদ প্রথা দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, আর্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তাহারা যে-যে দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যথা, প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ—সেই-সেই দেশেই বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।

আর্য জাতি ভারতে আসিল বিজয় পতাকা উড়াইয়া। তারপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসবাস করিতে লাগিল। প্রথমে কোনরূপ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের বিশেষিকরণ (specialization) প্রয়োজন হইয়া পড়ায় বর্ণভেদ দেখা দিল। পূজার মন্ত্রতন্ত্র জটিল হইতে জটিলতর রূপ ধারণ করায় একশ্রেণীর লোক আচার-অনুষ্ঠান ও শিক্ষা-দীক্ষার কার্য একচেটিয়া করিয়া লইল। তাহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইল। অনার্যদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের কার্যে আর এক শ্রেণীর লোককে সর্বদা নিয়োজিত থাকিতে হইত বলিয়া যুদ্ধকে তাহারা পেশা করিয়া লইয়া ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইল।

আর্য জাতির মধ্যে কর্মগত বর্ণভেদ প্রথা

তৃতীয় শ্রেণীর আর্যেরা সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদন কার্যে লিপ্ত রহিল। তাহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। এবং যে-সকল আদিম অধিবাসী আর্য জাতির বশ্যতা স্বীকার করিল তাহারা অপর তিন বর্ণের সেবার কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া শূদ্র বা দাস নামে পরিচিত হইল। এইভাবে ভারতীয় আর্য সমাজে কর্মগত (functional) বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইল।

বর্ণভেদ প্রথা প্রথমে ছিল অতি সরল। ইহা নির্ধারিত হইত কর্মের ভিত্তিতে; এবং প্রথম তিন বর্ণের পক্ষে কর্মানুসারে বর্ণ পরিবর্তন সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজ ছিল। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথা হইয়া উঠিল জটিল ও কঠোর এবং ইহা নির্ধারিত হইতে লাগিল জন্মের ভিত্তিতে, কর্মের ভিত্তিতে নয়। পেশাগত অসংখ্য বর্ণের সৃষ্টি হইল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার

বর্ণভেদ প্রথার জটিল রূপ গ্রহণ এবং অস্পৃশ্যতার উদ্ভব

অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গেল। নিম্ন বর্ণসমূহ সামাজিকভাবে হেয় হইয়া পড়িল; এবং একদিন অস্পৃশ্যতা নামে মহাপাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিল।

আরও পরে হিন্দু সমাজে কর্মগত বর্ণের উপরে দেখা দিল চণ্ডাল, রাজবংশী প্রভৃতির ন্যায় জাতিগত বর্ণ (Racial Castes), এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্মগত বর্ণ। সমাজ আরও শ্রেণীবিভক্ত হইল।

জাতিগত বর্ণ

গুণ : বর্তমানে আমরা পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করিয়া থাকি। এরূপ সমাজে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ নাই, ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের স্থান নাই। সামাজিক কল্যাণই হইল ধ্রুবতারকা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সকলে পথ চলে।

১। বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ একরূপ পরিকল্পিত সমাজ

বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা ছিল এইরূপ এক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্মানুসারে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত, অপরের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সামাজিক অপচয়ের সৃষ্টি করিত না। এইজন্য বর্ণভেদ প্রথার সমর্থকগণ ইহাকে "বিশেষভাবে পরীক্ষিত বিভিন্ন কর্মগত শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণকারী বিজ্ঞান-সম্মত প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বস্তুত, বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের একপ্রকার ইংগিত পাওয়া যায়। ইহারই অধীনে প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সভ্যতার অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থ নৈতিক সূত্রের দিক দিয়া দেখিলে, বর্ণভেদ প্রথা শ্রমবিভাগের সৃষ্টি করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল। অনেকের মতে, প্রাচীন ভারতের শিল্পোন্নতির মূলে আছে এই শ্রমবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রথা।

২। ইহা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। শিশুর পক্ষে পৈতৃক পেশা আয়ত্ত করা যত সহজে সম্ভব, অন্য পেশা আয়ত্ত করা তত সহজে সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতে যখন রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষার (public instruction) কোন বন্দোবস্ত ছিল না তখন বর্ণভেদ প্রথার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সকলের শিক্ষার এই সুবন্দোবস্তের উপযোগিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

৩। ইহা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল

চতুর্থত, এই প্রকারে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পদক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। পুত্র পিতার শিল্প দক্ষতার অধিকারী হইয়া জাতীয় শিল্পদক্ষতাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল।

৪। ইহার ফলে শিল্প-দক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল

পঞ্চমত, প্রাচীনকালে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণের শ্রমিকসংঘের অভাব পূরণ করিয়াছিল। একই বর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অনুভব

করিত। এবং ফলে পরস্পরের মংগলসাধনে সচেষ্ট থাকিত; এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বিভিন্ন বর্ণের এই ভূমিকার জন্য তাহাদিগকে মধ্যযুগের শিল্প-সংঘসমূহের (Trade Guilds) সহিত তুলনা করা হয়।

৫। ইহা শ্রমিক সংঘের অভাব পূরণ করিয়াছিল

পরিশেষে, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি রুদ্ধ করিয়া বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সাংস্কৃতিক ও জাতিগঠনের দিক দিয়া রক্তের এইরূপ বিশুদ্ধতাকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬। ইহা হিন্দু সমাজের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছিল

ত্রুটি ঃ বর্ণভেদ প্রথার গুণকীর্তন অতীতকালের গুণকীর্তন মাত্র। বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা উপরি-উক্ত গুণের অধিকাংশই হারাইয়াছে। বর্তমানের সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগে বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে স্থূল কর্মগত শ্রমবিভাগকে আর বিশেষ মূল্য প্রদান করা হয় না; এই প্রথার ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থাও আজ সম্পূর্ণ অচল; রক্তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাও আজ অধিকাংশে স্বীকার করেন না—ইহা অক্ষুণ্ণ রাখাও অসম্ভব; উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষাপ্রাপ্তির মূল্যও বিশেষ কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক দিকেই বর্ণভেদ প্রথা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। বলা যায় যে অতীতে এই প্রথার প্রভূত উপযোগিতা ছিল; কিন্তু আজ ইহা সকল উপযোগিতাশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন ইহার বিলোপসাধনেব।

বর্তমান দিনে বর্ণভেদ প্রথা উপযোগিতাশূন্য

অতীতেও বর্ণভেদ প্রথা ত্রুটিহীন ছিল না; ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি অতীতেও কা[জ] করিয়াছে। এই ত্রুটিগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: জন্ম দ্বারা ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয় বলিয়া বর্ণভেদ প্রথার অধীনে কর্ম কুশলতার মর্যাদা নাই। অন্য বৃত্তিব পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও পুত্র পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিতে বাধ্য। ইহার ফলে প্রভূত জাতীয় অপচয় ঘটিয়া থাকে। বর্ণভেদ প্রথার জন্য কত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সামান্য কর্মে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার জন্য প্রতিভা বিকাশের সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধানও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মকুশলতার মর্যাদা নাই

দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার অধীনে পূর্ব-নির্ধারিত বৃত্তির জন্য শ্রমেব বিভিন্নমুখী গতি বা সচলতা (mobility of labour) সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদনও ব্যাহত হয়। সুতরাং বর্ণভেদ প্রথা ক্ষুদ্রায়তনে ও কুটির শিল্পের প্রসারের সহায়ক হইলেও, বৃহদায়তনে উৎপাদনের বিশেষ পরিপন্থী।

২। ইহা শ্রমের সচলতা ব্যাহত করে

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখে নাই। এক সময় তাহারা কায়িক পরিশ্রমকে হেয় মনে করিত; আজও অনেকে করে। সুতরাং ইহাতেও বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে

৩। অনেক সময় শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হয় না।

চতুর্থত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য সামাজিক সচলতাও (social mobility) ব্যাহত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের জন্য আচার অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহাদি প্রভৃতি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকায় সমাজ কঠোরতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে ইহা আরও অবনতির স্তরে নামিয়া অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কঠোর সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা সবদাই সামাজিক ও জাতীয় সংহতিসাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছে।

।। ইহার সামাজিক চলতাও ব্যাহত ইয়াছে

পরিশেষে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন কোনমতেই করা যায় না। মানুষে মানুষে সাম্য হইল অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। ইহার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সবস্ব উৎসর্গ করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। বর্ণভেদ প্রথা কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মর্যাদা—অর্থাৎ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ অস্বীকারই হইল ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এ-প্রথা নানা গুণ-সমন্বিত হইলেও আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে ইহা একেবারে অচল।

।। ইহা সাম্য নীতির বিরোধী

বর্তমান গতি ঃ প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পূব হইতেই বর্ণভেদ প্রথা প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অচল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফলে সাম্প্রতিক যুগে ইহার কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নগরাঞ্চলসমূহ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের লোকেরা বর্তমানে আর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সহভোজন ও সামাজিক মেলামেশাকে অবৈধ বলিয়া মনে করে না ; অন্তঃবর্ণ বিবাহকে (inter-caste marriage) আর পূর্বের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখে না। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধেও নগরাঞ্চলের মনোভাব পূর্ব হইতে কিছু পরিমাণে পৃথক্ বলা যায়। এই সকল পরিবর্তনের মূলে আছে অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণের প্রচেষ্টা। আর্য সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মের সংস্কারসাধনের দ্বারাও এই দিকে সহায়তা করিয়াছে।

নানাভাবে বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছে ও পাইতেছে

অপরদিকে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য লোকে আর পূর্বপুরুষের পেশা আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। ফলে শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; শ্রমের সচলতার অভাব বর্তমানে আর বৃহদায়তনে উৎপাদনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে পরিগণিত হয় না। শ্রমিক সংঘসমূহ (Labour Unions) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিল্প-সংঘসমূহের Trade Guilds) প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়াছে।

এইভাবে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন দিক দিয়া আক্রান্ত হইলেও ইহা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই—কারণ ভারত এখনও প্রধানত গ্রাম্য ভারত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এখনও অশিক্ষিত ; সুতরাং সংস্কারান্ধ। তাই নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে বর্ণভেদ প্রথাকে লুপ্ত করিবার জন্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত

কিন্তু এই প্রথা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই

হইয়াছে ; অনুন্নত বর্ণসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে ; শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে ; ইত্যাদি কিন্তু তবুও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সাম্য (social equality) প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

যৌথ পরিবার প্রথা (The Jcint Family System)

যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের সামাজিক পরিবেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য দেশের ধারণা অনুসারে এখানে পরিবার মাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানসন্ত লইয়া গঠিত হয় না। ভারতে 'পরিবার' বলিতে বুঝায়, একই পূর্বপুরুষের বিভি বংশধরের পরিবারসমূহের সমষ্টি। এইরূপ দেখা যায় ে একই যৌথ পরিবারের অধীনে লোকে কয়েক পুরুষ ধরি বাস করিতেছে। যৌথ সম্পত্তি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মাচর হইল ভারতের যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সূচক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মত প্রত্যে একান্নবর্তী পরিবারে একজন কর্তা প্রধান থাকেন। তাঁহাকে গৃহস্বামী বা 'কর্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। সকলে তাহাদের উপার্জন যৌথ পরিবারের জন্য গৃহস্বামী নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য এবং বিনিময়ে পরিবার তাহাদের ভরণপোষণ ও বিবাহা সামাজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনা সকল ব্যাপারে গৃহস্বামীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। যৌথ পরিবার প্রথাে আর্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রী ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় যৌথ পরিবারের স্বরূপ

গুণ : তত্ত্বগতভাবে দেখিলে যৌথ পরিবার প্রথা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপ প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বে প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবা প্রথার ভিত্তি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যৌথ পরিবাে লোকে সামর্থ্যমত কার্য করে এবং প্রয়োজনমত উপকরণ প্রাপ্ত হয় ইহাই সমভোগবাদী সমাজের (communistic society) মূল কথা। সুতরাং যৌ পরিবার প্রথা একরূপ সমভোগবাদী সমাজের দ্যোতক, কিন্তু ইহা বলপ্রয়োগের উপ প্রতিষ্ঠিত নহে।

১। ইহা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার (social security) নানাবি ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক সমাজে অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্ধক্য মৃত্যুর কারণে ব্যক্তির ও পরিবারের উপার্জনের পথ সহসা রু হইবার যে-আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রতিবিধা বর্তমান রাষ্ট্রকেই করিতে হইতেছে। পূর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোে সামাজিক নিরাপত্তার এইরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যৌথ পরিবারসমন্বিত সমাে ইহার প্রয়োজনও ছিল না। যৌথ পরিবার ব্যক্তির উপার্জনের অনিশ্চয়তার সক

২। ইহা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিল

ঝুঁকিই বহন করিত। উপার্জনে অসমর্থ হইলেও সম্মানের সহিত পরিবারের সভ্যপদে আসীন থাকিয়া ইহার সুখদুঃখের অংশগ্রহণ করিত।

৩। অর্থনৈতিক সূত্রের দিক হইতেও সমর্থন করা চলে

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে উৎপাদনের ন্যায় বৃহদায়তনে সংসার পরিচালনারও কতকগুলি সুবিধা আছে। ইহাতে পরিবার পরিচালনার ব্যয় হ্রাস হয়। বৃহৎ পরিবারে মাথাপিছু ব্যয় ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা অল্প। সুতরাং অর্থনৈতিক সূত্রের দিক দিয়া যৌথ পরিবার প্রথাকে সমর্থন করা যায়।

৪। ইহা হিন্দু বিধবাদের আশ্রয়দান করিয়াছে

৫। ইহা উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটি অনেকাংশে দুর করিয়াছে

চতুর্থত, যৌথ পরিবার না থাকিলে হিন্দু সমাজের বিধবাদের কি গতি হইত তাহা কল্পনা করা কঠিন। যৌথ পরিবারে বিধবারা নিরাপদ ও সম্মানজনক আশ্রয়লাভ করে। পরিশেষে, যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তি বহুজনের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। ভূ-সম্পত্তির এইরূপ বণ্টনের ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (subdivision and fragmentation of holdings) ঘটিয়াছে—যাহাকে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা যায়। যৌথ পরিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কুফল যতদূর প্রসারিত হইতে পারিত, ততদূর পারে নাই। সুতরাং ভারতে জীবিকার্জনের সর্বপ্রধান সূত্রের অবনতি প্রতিরোধেও যৌথ পরিবার প্রথার ভূমিকা রহিয়াছে।

১। ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়

ত্রুটি: যৌথ পরিবার প্রথার সর্বাপেক্ষা বড় গলদ হইল যে, ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়। এইরূপ পরিবারে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব গৃহস্বামীর উপর ন্যস্ত থাকায় অপর সকলের পক্ষে নিরুদ্বেগে ও আলস্যে কাল কাটাইবার সুবিধা ঘটে। ইহার ফলে পরিবারে হিংসা, ঝগড়া প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি হয়।

২। ইহা অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করে

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগ ও আত্মনির্ভরশীলতাই অর্থনৈতিক প্রগতির মূল সূত্র। একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তির মধ্যে এই দুইটি গুণের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি তখনই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয় যখন সে উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফল একান্তভাবে স্বয়ং ভোগ করিতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারে তাহা সম্ভব হয় না। ফলে ভারতের ন্যায় যৌথ পরিবারসমন্বিত সমাজে অর্থনৈতিক উন্নতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

৩। ইহা মূলধন-সংগঠনকে ব্যাহত করে

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় আর একটি বিশেষ কারণের জন্য। একান্নবর্তী পরিবার মূলধন-সংগঠনের (capital formation) পরিপন্থী। এইরূপ পরিবারে প্রত্যেকের উপার্জন ব্যয়িত হয় সকলের জন্য। উপার্জনশীলের আয় দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ করা হয়। সুতরাং সঞ্চয় বিশেষ কিছু হইতে পারে না। গৃহস্বামীর হস্তে কিছু

সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া তিনি ইহা বিনিয়োগ করিতে পারেন না। ফলে সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সংগঠন সম্ভাব্য পরিমাণে হইতে পারে না ; এবং অপর্যাপ্ত মূলধনের জন্য শিল্পোন্নয়নও পর্যাপ্ত পরিমাণে হইতে পারে না।

৪। ইহা বর্তমান জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যার অন্যতম কারণ

চতুর্থত, ভারতের জনসংখ্যার আয়তন সম্বন্ধে বর্তমানে যে-সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও কতকাংশে যৌথ পরিবার প্রথার ফল। পরিবার যখন সকলেরই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে তখন আর্থিক কারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা পরিমিত করার কোন প্রয়োজন নাই। এইজন্য এ-চেষ্টাও একান্নবর্তী পরিবারে বিশেষ কেহ করে না।

৫। ইহাতে সামাজিক অপচয় ঘটে

পঞ্চমত, যৌথ পবিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হয়, কারণ তাহারা রক্ষণশীল গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে বাস করে। এই রক্ষণশীলতার জন্য ব্যক্তিত্ব (Individuality) নষ্ট হয় ; এবং ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিনাশকে অন্যতম সামাজিক অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৬। এই ব্যবস্থা দায়িত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, যৌথ পরিবার যৌথ দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সকলেই এই দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করে। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে-দায়িত্ব সকলের সে-দায়িত্ব কাহারও নহে। সুতরাং পরিবার প্রথা হইল এক দায়িত্বহীন অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এই তত্ত্বগত কারণেও যৌথ পরিবার প্রথা সমর্থিত হইতে পারে না।

ইহা বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে

বর্তমান গতি ঃ জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা দ্রুতগতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার যৌথ পরিবার প্রথার মূলে প্রথম আঘাত হানে। গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের ধ্বংস ও নগরিকরণের ফলে লোক পরিবার হইতে চ্যুত হইয়া জীবিকা সংস্থানের জন্য নগরাঞ্চলে বাস করিতে থাকে। ইহাতে পরিবারের সহিত যোগাযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যানবাহনের অভাবনীয় উন্নতি ব্যক্তির পক্ষে দূর-দূরান্তরে গমন আরও সম্ভব করিয়া তুলে। ফলে মূল পরিবারের সহিত তাহার যোগসূত্র একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তরোত্তর বর্ধমান জনসংখ্যাও একান্নবর্তী পরিবারের সংহতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে সবদিকে আক্রান্ত হইয়া যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলা হয়। আজও ইহার যে ধ্বংসাবশেষ আছে তাহাও হিন্দু সংহিতা (Hindu Code) আইনে সম্পত্তি বণ্টনের নূতন ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকার আইন (The Laws of Inheritance) : ভারতের সকল প্রকার উত্তরাধিকার আইনই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বহুজনের উত্তরাধিকার স্বীকার করে। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রবর্তিত প্রথার একপ্রকার বিপরীত। সেখানে বহুজন নয়, সকল পুত্র-সন্তানও নয়—কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সাধারণত মৃত পিতার অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়।

ভারতের উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য

হিন্দু সংহিতা কার্যকর হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দুইটি প্রধান শাখা ছিল দায়ভাগ ও মিতাক্ষর। দায়ভাগ আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির সকল পুত্র সন্তানই পিতৃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমান অংশীদার হিসাবে গণ্য হইত। মিতাক্ষর আইন অনুসারে পরিবারের সকল পুরুষ সভ্য যৌথভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল। জন্মমাত্র শিশুপুত্রও পরিবারের অন্যান্যদের সমান অংশীদার হইয়া দাঁড়াইত। দায়ভাগ আইন পশ্চিমবংগে এবং মিতাক্ষর আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত ছিল। সম্প্রতি দায়ভাগ ও মিতাক্ষর উভয়কে একীভূত করিয়া যে হিন্দু-সংহিতা আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সহিত সকল কন্যারও সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

মুসলমান উত্তরাধিকার আইন আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মৃতের সম্পত্তির অংশীদাররূপে গণ্য করে। মাত্র সকল পুত্র-কন্যা নহে, পিতামাতা জীবিত থাকিলে তাহারাও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগীদার হন।

গুণ : ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তিতে বহুজনের সমানাধিকার স্বীকার করিয়া ইহা কতকটা সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লইয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবে—ইহাই ত' সাম্যের মূল কথা। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এই মূল নীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কে আইন স্ত্রী পুরুষে ভেদ করে নাই।

১। ইহা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের জন্য সকলেই উত্তরাধিকার সূত্রে সামান্য সম্পত্তি পায় বলিয়া সকলেরই কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ অটুট থাকে। ইহাতে ধনোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে, সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়।

২। ইহা কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ অটুট রাখে

ত্রুটি : ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের পরিপন্থী। উত্তরাধিকার আইনের জন্য কৃষি-জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, এবং ইহার ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। যৌথ পরিবার প্রথার আলোচনা প্রসংগে এ-সম্বন্ধে ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে এবং পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখান হইবে যে, জোতের এই অসম্বদ্ধতা ও খণ্ডিকরণ কৃষিকার্য সুপরিচালনার পথে প্রধান অন্তরায়।

১। ইহা বৃহদায়তনে কৃষিকর্মের পরিপন্থী

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধকের কার্য করে

২। ইহা বৃহদায়তনে বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধক

একজনের সঞ্চয় তাহার মৃত্যুর সংগে সংগে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তনে বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না। সকলেই তাহার সামান্য সম্পত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া গতানুগতিকভাবে ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়।

ইহাও বলা যায় যে, সকলেই কিছু কিছু পায় বলিয়া গোড়া হইতেই সকলে

৩। ইহা কর্মোদ্যমের পথেও বাধা সৃষ্টি করে

কর্মোদ্যমী ও উদ্যোগী হইয়া উঠে না। সুতরাং উত্তরাধিকার আইন যেরূপ এক দিকে কর্মোদ্যম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে; অপর দিকে আবার ইহার প্রতিবন্ধকের কার্যও করে।

ধর্মের প্রভাব (Influence of Religion) : ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আপামর সাধারণের অনন্যসাধারণ ধর্মবোধ হইল ভারতীয় সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম বস্তুবাদী সভ্যতাকে অস্বীকার করিতে শিখায়। এই ধর্মের মতে, মানুষ ইহলোকে আসে দুঃখ ভোগ করিতে। ইহলোককে পান্থশালার সহিত তুলনা করা যায়; এখানে স্থিতি হইল ক্ষণিকের জন্য। পরলোকই ব্যক্তির স্থায়ী আবাস; পরলোকে সুখের আশাই একমাত্র ভরসা। সুতরাং ব্যক্তিকে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা ছাড়িয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতে হইবে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয়গণের মধ্যে এইরূপ পারলৌকিক মনোভাবই তাহাদের উদ্যমহীনতা এবং ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ।

মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে। টাকা খাটাইয়া সুদ লওয়া ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। ফলে অনেক মুসলমান টাকা বিনিয়োগও করিতে চাহে না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, ইহার জন্যও ভারতের শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত যুক্তির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারা যায় না। হিন্দুধর্মের শিক্ষা কোন অসাধারণ শিক্ষা নয়। সকল ধর্মই—এমনকি খ্রীষ্টধর্মও অল্পবিস্তর ঐহিক বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ করিতে শিখায়। তাহা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণ অর্থনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মের প্রভাব যখন অধিকতর ছিল তখনই ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্যে অনন্যসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্য ও বস্তুগত লাভালাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ছাড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের

ভারতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধীনতা। বিদেশী শাসন ভারতের নিজস্ব শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে, নানাভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে, শিক্ষা বিস্তারে পরাঙ্মুখ থাকিয়া দেশবাসীকে অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারাই ভারতীয়গণের ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগাইয়া

।জেদের স্বার্থসাধন করিয়াছে। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্মের ভাবকে যে-দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয় তাহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। ভারতীয়-ণের ধর্মবোধ প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত করে নাই, পরোক্ষভাবে ইহারই হায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

সামাজিক প্রথা (Social Customs): ভারতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, পনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন াছে। ইহাতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভোজন করাইবার প্রথাও প্রবর্তিত আছে। ফলে এই সকল প্রথার জন্য বিরাট ব্যয় হয়। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পালন না করাই উচিত। অনেক সময় দেখা য যে, লোকে ঋণ করিয়াও এগুলি পালন করিয়া থাকে। ইহা কোনমতেই র্থনযোগ্য নহে। এইরূপ আচার অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বিপুল ঋণের প্রধান না হইলেও ্যতম কারণ। আবার ইহার জন্যই সামগ্রিকভাবে দেশে মূলধন সংগঠন ব্যাহত । লোক যদি তাহার সঞ্চয় বিনিয়োগ না করিয়া আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিয়া লে তবে মূলধনের সৃষ্টি ব্যাহত না হইয়া পারে না। এই সকল কারণে উদার-তিক ও উপযোগিতামূলক শিক্ষা বিস্তারের সাহায্যে আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান হইতে ায় লইবার দিন আসিয়াছে।

ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ ষ্ঠান

প্রশ্নোত্তর

1 In what manner do the important social and religious institutions help hinder the economic progress of the people of India ? Give examples

[B Com 1942, '44 , B A 1941] (৫৩ ৬৩ পৃষ্ঠা)

2 Discuss the economic consequences of the caste system Do you think it there is any justification for its continuance in the present condition of iety ? (৫৪ ৫৭ পৃষ্ঠা)

3. Consider the economic effects of the Indian joint family system What ces have, in recent times, tended to break up the system ? [B A. 1945]

(৫৮ ৬০ পৃষ্ঠা)

4. To what extent the under-developed condition of India is attributable her social environment ? (৫৩ ৫৬ ৫৭ ৫৯ ৬০ এবং ৬২ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের জনগণ

(People of India)

ভারতীয় অর্থবিদ্যাচর্চা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা উন্নয়নই ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। ভারতের জনগণ আলোচনাক্ষেত্রে না আনিয়া এই সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম ধারণা লাভ করা যায় না বা সমস্যা সমাধানের জন্য পথনির্দেশ করিতে পারা যায় না।

জনগণ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা :

প্রকৃতির দানে ভারত অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। প্রকৃতি ভারতকে অর্থনৈতিক সমৃ অধিকাংশ উপাদানই মুক্তহস্তে দান করিয়াছে। অথচ ভারতবাসী দরিদ্র এবং ভা অর্ধোন্নত দেশ। বস্তুত, 'সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী'ই ভারতের অর্থনৈতিক জীব সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য, কেন এই অর্ধোন্নত অবস্থ এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বিদেশী শাসকবর্গ বলিতেন, জনাধিক ইহার কারণ। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা বলিতাম বিদেশী শাস আমাদের দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা আমা সমৃদ্ধ হইতে দেয় নাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযো তাহা বিচার করিয়া নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে ভারতীয় জনগণের পর্যালোচ করিতে হইবে। উপরন্তু, তত্ত্বগতভাবে দেখিলে প্রকৃতি ও মা এই দুইটিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির দানকে ব্যবহ করিয়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। সুতরাং যে-কোন দেশের পা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্প এবং এই সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে শ্রমের যোগান—য প্রধানত জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু জনগণ উৎপাদনের উপাদান মাত্রই না উৎপাদনের লক্ষ্যও বটে। জনগণের ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দে প্রয়োজন, উৎপাদন দেশের বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতে কিনা। অতএব বাস্তব ও তত্ত্ব—উভয় দিক দিয়াই জনসংখ্যার পর্যালোচন প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বলা যায়, এই পর্যালোচনা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পা পর্যালোচনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অথ মাত্র অব্যাহত রাখার জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারই যথেষ্ট কিনা?—অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পর্যালোচনা ব্যতিরেকে দেওয়া যায় না।

১। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ জনাধিক্য কিনা তাহা নির্ণয় করা

২। তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিতে জনসংখ্যার আয়তন, জনবসতির ঘনত্ব, জনসংখ্যার বসবাস-পদ্ধতি বা নগর ও গ্রামের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন, জনগণের জীবনধারণ প্রণালী বা উপজীবিকা অনুসারে জনবসতির বণ্টন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি বুঝায়। এখন এগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

রতীয় জনগণের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যার আয়তন (Size of the Population)ঃ ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের কিছু উপর। ১৯৫১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহে আদমসুমারি লওয়া হয় নাই; তবে অন্যান্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা ৪ লক্ষের কিছু উপর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার লিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে বলা হয় যে ১৯৫৮ লে ভারতের মোট জনসংখ্যা (জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিকিমের জনসংখ্যা লইয়া) ১ কোটি ৭৫ লক্ষের মত হইবে।

রতের মোট নসংখ্যা

ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে উত্তরপ্রদেশই সর্বাপেক্ষা জনবহুল। ইহার জনসংখ্যা কোটি ৩২ লক্ষের উপর। তাহার পরেই আছে বোম্বাই। বোম্বাই-এর বর্তমান লোকসংখ্যা হইল ৪ কোটি ৮২ লক্ষের উপর। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আছে যথাক্রমে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ। ১৯৫১ সালে আদমসুমারি লওয়ার সময় পশ্চিমবংগের লোকসংখ্যা লে ২ কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু উপর। পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি এবং বাবণ বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ইহা ২ কোটি ৬৩ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কথা ছাড়িয়া দিলে আসামই সর্বাপেক্ষা জনবিরল। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষের কিছু উপর।

ত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা নবহুল রাজ্য

আসাম সর্বাপেক্ষা নবিরল রাজ্য

আয়তনের দিক দিয়া ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।* প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৯.৫ ভাগ চীনদেশে এবং শতকরা ১৫ ভাগের উপর ভারতে বাস করে।

রত পৃথিবীর মধ্যে তীয় জনবহুল দেশ

জনবসতির ঘনত্ব (Density of Population)ঃ জনবসতির ঘনত্ব লিতে বুঝায় প্রতি বর্গমাইলে গড় লোকবসতি। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে মগ্র ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব হইল ৩১২—অর্থাৎ ভারতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে

* ৬ পৃষ্ঠা দেখ।

৩১২ জন করিয়া লোক বসবাস করে।* স্মরণ রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার ঘনত্বে

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব

সূচক উপরি-উক্ত সংখ্যা সমগ্র ভারতের গড়। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্বের সহিত ইহার কোন সংশ্রব না থাকিতে পারে। বস্তুত, উপরি-উক্ত গড় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের পরিচায়ক নহে। ভারতের কোন কোন রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব উপরি-উক্ত সংখ্যার তিনগুণ, কোথাও বা এক-তৃতীয়াংশ। ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক হইল কেরলে; সেখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯০৭ জন লোক বসবাস করে। অবশ্য অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দিল্লীকে একক হিসাব ধরিলে উহার ৩,০১৭

ঘনত্ব সর্বাধিক কেরলে এবং সর্বনিম্ন জম্মু ও কাশ্মীরে

ঘনত্বকে সর্বাধিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষভাবে জনবিরল; ইহার জনসংখ্যার ঘনত্ব মাত্র ৫৪। উপরের দিক হইতে রাজ্যগুলির মধ্যে কেরলের পরই আছে পশ্চিমবংগ। এখানে ঘনত্ব ৭৭৬ বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটি† দেওয়া হইল ঃ

রাজ্য	ঘনত্ব
১। কেরল	৯০৭
২। পশ্চিমবংগ	৭৭৬
৩। মাদ্রাজ	৫৯৭
৪। বিহার	৫৭৮
৫। উত্তরপ্রদেশ	৫৫৭
৬। পাঞ্জাব	৩৪৩
৭। অন্ধ্রপ্রদেশ	২৯৬
৮। মহীশূর	২৫৯
৯। বোম্বাই	২৫৩
১০। উড়িষ্যা	২৪৩
১১। মধ্যপ্রদেশ	১৫২
১২। রাজস্থান	১২১
১৩। আসাম	১০৬
১৪। জম্মু ও কাশ্মীর	৫৪

* জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্র ধরিলে গড় ঘনত্ব কমি ২৮৭-তে দাঁড়ায়—India 1959.

† India—1959

ভারতের জনবসতির ঘনত্বে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের এক-চতুর্থাংশের কম অংশে বাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের এরূপ তারতম্য আর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় উচ্চ ও নিম্ন গাংগেয় সমতলভূমির ঘনত্বের সহিত জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের জনবসতির ঘনত্বের যে-বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা একরূপ সমান্তরালবিহীন। সর্দার পাণিকর প্রভৃতির মতে, জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এইরূপ অসমতাই ভারতের জনগণ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা রা হইতেছে।

বসতির ঘনত্বের শিষ্ট্যসমূহ

বসতির আঞ্চলিক নজনিত অসমতার সমস্যা

জনগণের বসবাস-পদ্ধতি (Pattern of Living of the opulation):

বসবাস-পদ্ধতি কথাটি ব্যবহার করা হইযাছে বিগত আদমস্থমারির পোর্টে। বসবাস-পদ্ধতি বলিতে প্রধানত বুঝায় নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমস্থমারি অনুসারে ভারতের ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের কাছাকাছি —অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। বাকী ায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষের উপর—অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা হইল নগরাঞ্চলের পাঁচগুণ। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রতি ছয়জন ভারতীয়ের পাঁচজন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই কারণে গ্রাম্য ঋণ জরিপ মিটির (Committee on Rural Credit Survey) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ারত হইল বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত।*

বাস-পদ্ধতি বলিতে বুঝায়

রত বিশেষ মাত্রায় মা ভারত

ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত হইলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের জনবসতির বৃদ্ধি নিয়মিত ঘটিতেছে। ১৯২১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করিত। ১৯৩১ সালে উহা ১২ ভাগে, ১৯৪১ সালে ১৪ ভাগে এবং বর্তমানে উপরি-উক্ত ১৭ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। অন্য এক দিক দিয়া দেখিলে, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ভাগ বৃদ্ধি ঘটিলেও, নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা ১২০ ভাগ। বসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে অন্তত ১ লক্ষ সংখ্যাসমন্বিত নগরের সংখ্যা ছিল ৫৮; ১৯৫১ সালে ইহা ৭৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

স্থ গ্রামাঞ্চলের তুল- য় ভারতের নগরাঞ্চলে সংখ্যার নিয়মিত ঘটিতেছে

* All-India Rural Credit Survey—Vol. II.

সুতরাং যে-দিক দিয়াই দেখা হউক না কেন ভারতে জনবসতির গতি যে নগরাঞ্চলে দিকে সে-কথা সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য।

তবুও উল্লেখযোগ্য নগরিকরণ (urbanization) ঘটিতে ভারতের পক্ষে বহুদি লাগিবে। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগের কাছাকাছি লো নগরাঞ্চলে এবং ২০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতের নগরাঞ্চলে অধিবাসীদের অনুপাত এখনও ২০-তে পৌছায় নাই।

জনগণের জীবনযাপন প্রণালী (Pattern of Livelihood o the Population) : জনগণের জীবনযাপন প্রণালী বলিতে বুঝায় উপজীবি অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি রিপোর্টে উপজীবিকা অনুসারে ভারতীয় জনগণকে দুইটি প্রধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যথা, কৃষিজীবী (agricultural এবং অ-কৃষিজীবী (non-agricultural)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষিজী বলিতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং অ-কৃষিজীবী বলিতে নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণকে বুঝায় না। নগরাঞ্চলের অনে অধিবাসী উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল; এবং গ্রামাঞ্চ অনেক ব্যক্তি কৃষি ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকা হইতে অন্নসংস্থান করে। যাহা হউ উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটিকে আবার চারিটি করিয়া শ্রেণীতে পুনর্বিভক্ত ক হইয়াছে। কৃষিজীবিগণের চারিটি শ্রেণী হইল: (ক) জমির মালিক হিসাবে কৃষি করে এমন কৃষকশ্রেণী, (খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রে (গ) কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী, এবং (ঘ) কৃষিকর্মের সম্পর্কবিহীন কিন্তু কৃষি-জমির মালিক স্বত্বভোগকারিগণ। এই চারিটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার স্বাবলম্বী (se supporting) এবং পরাবলম্বী (dependents) এই দুই শ্রেণী আছে। কৃষিজীবিগণে উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটির সংখ্যা ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুপ বুঝাইবার জন্য পরের পৃষ্ঠার ছকটি দেওয়া হইল।

জীবনযাপন প্রণালী বলিতে কি বুঝায়

কৃষিজীবী এবং অ-কৃষিজীবী

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি —স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী সকলকে ধরিয়া হইল মোট জনসংখ প্রায় শতকরা ৭০ (৬৯.৮) ভাগ। অন্যভাবে বলিতে পারা যে, ভারতে প্রতি ১০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জনের উ জীবিকার জন্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল।

ভারতের প্রতি দশ জনের মধ্যে সাত জন ব্যক্তি জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল

অ-কৃষিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হইয়াছে (ক) শিল্পে (কৃষিশিল্প ছাড়া) নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (খ) বাণি নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (গ) পরিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (ঘ) অপরাপর অ-কৃষিজীবী ব্যক্তিগণ।

অ-কৃষিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদের পারস্পরিক অনুপাত বুঝাইবার ছক

১। কৃষিজীবী শ্রেণী	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ		স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যক্তিগণ	
	সংখ্যা কোটিতে	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণের শতকরা ভাগ	সংখ্যা কোটিতে	মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ
(ক) মালিক হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রেণী	৭ ৫৭	৪৩ ৮	১৩ ৭১	৪৬ ৯
(খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষক-শ্রেণী	০·৮৮	৮ ৪	৩ ১৬	৮·৮
(গ) কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী	১ ৪৯	১৪ ১	৪ ৪৮	১২ ৬
(ঘ) কৃষিকর্মের সহিত সম্পর্কবিহীন জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগকারিগণ	০ ১৬	১ ৫	০ ৫১	১ ৫
মোট	৭ ১০	৬৮ ০	২৪ ৯০	৬৯ ৮

অ-কৃষিজীবিগণের জীবনযাপন প্রণালী বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত ছকটি প্রস্তুত করা হইয়াছে :

২। অ-কৃষিজীবী শ্রেণী	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ		স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যক্তিগণ	
	সংখ্যা কোটিতে	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণের শতকরা ভাগ	সংখ্যা কোটিতে	মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ
(ক) শিল্প	১ ২২	১১ ৭	৩ ৭৭	১০ ৫
(খ) বাণিজ্য	০ ৫৯	৫ ৭	২·১৩	৬ ০
(গ) পরিবহন	০ ১৭	১'৬	০ ৫৬	১ ৬
(ঘ) অন্যান্য	১ ৩৬	১৩ ০	৪ ৩০	১২·১
মোট	৩ ৩৪	৩২ ০	১০ ৭৬	৩০·২
কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী শ্রেণার মোট	১০·৪৪	১০০·০	৩৫ ৬৬	১০০·০

জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট হইতেও ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন প্রণালীর স্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধান হইতে জ যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মোট ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ কর্মে নি লোকের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ বা শত ৭২ ভাগ লোক, শিল্প ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ বা শতকরা ১০.৬ ভ লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহনে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ বা শতকরা ৭.৭ ভ লোক। বাকী অংশ নিযুক্ত ছিল সরকারী চাকরি ও ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃ বিভিন্ন বৃত্তিতে।*

জাতীয় আয় কমিটি প্রদত্ত তথ্য

বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন (Age Composition the Population): বয়সের দিক দিয়া যে-কোন দেশের জনগণের গঠন হ একটি পিরামিডের ন্যায়। এই পিরামিডের ভিত্তি শিশুগণই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধি তারপর যত উপরের দিকে উঠা যায়, পিরামিড ততই শীর্ণ হই থাকে। এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের পা হইল এইখানে যে ভারতীয় পিরামিডের ভিত্তিস্থল প্রশস্ততর—অ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের শিশুর অনুপাত বিশেষ অধি পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণত শ্রমিক সরবরাহকারী ১৫-৫৪ বৎসর ব ব্যক্তিগণই সংখ্যায় বিশেষ গরিষ্ঠ হয়; ভারতে কিন্তু এই ব্যক্তিগণ মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মাত্র। উপরন্তু আমাদের দে স্ত্রীলোকদের অনেকে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহা জনসংখ্যা কর্মে নিযুক্ত অংশের মধ্যে ধরা হয় না। ১৯৫১ সা হিসাব অনুসারে ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ কর্মে নিযুক্ত। ফলে ভারতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান পাশ্চ দেশসমূহ অপেক্ষা কম দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতের ন্যায় দে জনসংখ্যার অনুপাতে এত পরাবলম্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে শিশুর সংখ্যা অত্যধিক

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে পরাবলম্বীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত (The Sex Ratio o Population): ১৯৪১ সালের মত ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতেও দে গিয়াছে যে, ভারতে স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। পুরুষের এ সংখ্যাধিক্য ভারতীয় জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণি হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় ভারতে কন্যা-সন্তান অপে পুত্র-সন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে; এবং যে-সম স্ত্রীলোকের সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে (reproductive age) সেই সম তাহারা এত সংখ্যায় মারা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে বাধ

স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য

* Final Report of the National Income Committee, 1954 এবং India—1959.

১৯৫১ সালের আদমস্থমারি অনুসারে ভারতে প্রতি ১ হাজার পুরুষ পিছু ৯৪৭ জন করিয়া স্ত্রীলোক ছিল; এবং মাত্র পাঁচটি রাজ্যে—যথা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ত্রিবাংকুর-কোচিন, মণিপুর এবং কচ্ছ—স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অধিক ছিল।

ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অল্প হইলেও এবং সন্তানবতী হইবার সময়ে স্ত্রীলোকগণ বহুসংখ্যায় মারা গেলেও ১৯২১ সাল হইতে সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সন্তানবতী হইবার যোগ্য বয়স্ক স্ত্রীলোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়মিতভাবে ঘটিয়া চলিতেছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Growth of Population): ১৯৪১ সালে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়সমূহে অখণ্ডিত ভারতবর্ষে আদমস্থমারি লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে আদমস্থমারি লওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের কতিপয় অংশ বাদ দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে। স্থতরাং ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনুরূপ বিষয়ের আলোচনা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়।

১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

১৯৪১-৫১ সাল, এই দশ বৎসরের গড় লইলে দেখা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় জনগণের শতকরা ১২.৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাকে গত দশকের গড় বৃদ্ধি (mean decennial growth) বলিয়া অভিহিত করা যায়। দশকের গড় না লইয়া সোজাস্থজি শতকরা বৃদ্ধি হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহা হইল ১৩.৩ ভাগের কাছাকাছি। সাধারণত জনসংখ্যার বৃদ্ধি সোজাস্থজি শতকরা হিসাবেই ধরা হয়। স্থতরাং তাহাই করা হইবে।

এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার নির্দেশ করিবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল:

১৯০১	ভিত্তি বৎসর
১৯১১	+৫.৮
১৯২১	−০.৩৫
১৯৩১	+১১.০০
১৯৪১	+১৪.৩
১৯৫১	+১৩.৩

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী দশকে কিন্তু বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা শতকরা ০.৩৫ ভাগ হ্রাস পায়। আবার ১৯৩১ সালে আসিয়া জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় হইতে বৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি হইল বাৎসরিক ১.৩৩ হারে বৃদ্ধি। ইহা অত্যধিক না হইলেও

ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হয়। এরূপ দেশে জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও সংখ্যাজনিত গুরুতর সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তুলে। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন, বসবাস পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি স্থিতিশীল দিক (static aspect) অপেক্ষা জনসংখ্যার গতিশীল দিক (dynamic aspect) অর্থাৎ ইহার বৃদ্ধির পর্যালোচনাই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক হার—ইহা কি অধিক?

ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা (Problem of India's Over-population) : ভারতে জনাধিক্যের সমস্যাকেই সাধারণত ভারতীয় জনগণ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতে প্রকৃত জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা এ-বিষয়েই মতবিরোধ রহিয়াছে। সুতরাং জনাধিক্যের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতবিরোধ ও তত্ত্বসমূহ :

মোটামুটিভাবে বলা যায়, জনাধিক্য সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—যথা, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory) অনুসারে জনসংখ্যার আয়তনকে খাদ্য-যোগানের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়া ইহার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়—অর্থাৎ দেখা হয় যে, খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা। যদি পর্যাপ্ত না হয় তবে দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তিটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks)। জনসংখ্যা অতিবিত্ত হারে বৃদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। ম্যালথাসের মতে, ইহাদের মাধ্যমে মৃত্যুর অত্যধিক হারই হইল জনাধিক্যের লক্ষণ।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র—কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই ঝোঁক রহিয়াছে খাদ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। স্বভাবতই, অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ম্যালথাসের মতে অন্য উপায়—অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে (Theory of Optimum Population) অর্থনৈতিক

প্রমাণ বিচারও (Economic Test) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে জনসংখ্যাকে মাত্র খাদ্যের যোগানের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন। ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (per capita income) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে, আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় (total national income) বাড়িতে পারে : কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হইল যাহাতে এখন জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। তত্ত্বগতভাবে বলা হয়, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে।* ইহার সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতএব, দেশের জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে, দেশে জনাধিক্য ঘটিতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে; ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর কমিয়া যাওয়া। যদি দেশের জনসংখ্যা কাম্য স্তরে না পৌঁছিয়া থাকে তবে তত্ত্বের দিক হইতে দেশটি জনবিরল (underpopulated) এবং ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অবস্থায় আসিবে। এই অবস্থাকে 'সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা' (point of maximum return) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—কারণ, এই অবস্থায় মাথাপিছু আয় হয় সর্বাধিক। তারপর আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি কাম্য নহে, তখন জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিকেও জনাধিক্যের সূচক বলিয়া ধরিতে হইবে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার

কাম্য-জনসংখ্যা কাহাকে বলে

সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা ও জনাধিক্যের লক্ষণ

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দিক হইতেই এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক গিয়ানচাঁদ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থবিজ্ঞাবিদগণ ভারতকে অতিপ্রজ বা মাত্রাতিরিক্তভাবে জনবহুল দেশ (over-populated country) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, জনাধিক্যের লক্ষণ দেশের মুখমণ্ডলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ অনেকাংশে বিকৃত শাসননীতির ফল হইলেও, এই সময় হইতেই এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে

* **Optimum population "remains in technological equilibrium with the productive resources of the country."**

ভারতে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে শতকরা ৬. ভাগ খাদ্যশস্য যোগানে ঘাটতি ছিল। ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee) রিপোর্ট অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অন্তেও খাদ্যশস্যে উৎপাদনে ১৫ লক্ষ টনের মত ঘাটতি দেখা দিবে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের (Ford Foundation Team) হিসাব অনুসারে কৃষিজ উৎপাদন বর্তমান হারে চলিলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন বা মোট প্রয়োজনীয়তার শতকরা ২৫ ভাগে দাঁড়াইবে।

প্রমাণ ঃ
১। খাদ্যাভাব

খাদ্য-যোগানের অপ্রতুলতার প্রধান প্রমাণ হইল বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালেও ভারতকে ১৫৯ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। ইহার উপর ভারত নিয়মিত ভাবে কিছু খাদ্য সাহায্য হিসাবেও পাইয়াছে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ে খাদ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য এবং খাদ্য-মূল্য দমিত রাখিবার জন্য বৎসরে ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। সুতরাং ১৯৪ সালে লর্ড বয়েড-ওর (Lord Boyd-Orr) উক্তি করিয়াছিলেন যে চিরন্তন অর্ধাহার এবং নিয়মিতভাবে সাময়িক অনাহার হইল ভারতে অন্যতম নিয়ম—তাহা এখন অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণও ভারতে উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১১১ সেণ্ট ; ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ইহা ৮৪ সেণ্টে আসিয়া দাড়ায়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দুই প্রকার শস্য উৎপাদনের জমির (double crop area) পরিমাণও ১৯২১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে কমিয়া ১১ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টে পরিণত হইয়াছে।

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া

সুতরাং যে-কোন দিক হইতে দেখিলেই দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-যোগানের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।*

দ্বিতীয়ত, ১৯২১ সাল হইতে জনসংখ্যার যে-নিয়মিত বৃদ্ধি তাহাকেও ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে জনাধিক্যের অন্যতম সূচক বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা মোট ১০ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়িয়াছে। শুধু ১৯৪১-৫১ সাল ধরিলে ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১.৩৩ হারে বাড়িয়াছে। ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে এই বৃদ্ধি পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও, ভারতে

২। জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি

---

* খাদ্য-সমস্যার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'ভারতের খাদ্য-সমস্যা' সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

** ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্ষেত্রে ইহাকে বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—কারণ ভারতের জনসংখ্যা এতই অধিক যে ইহার সামান্য বৃদ্ধিও আশংকাজনক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও বলা হইয়াছে যে, ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও বৎসরে ৪৫-৫০ লক্ষ পরিমাণ জনবৃদ্ধিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবেই ধরিতে হইবে।*

৩। ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতাও ভারতে বিশেষমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই আছে; সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপ কমিলেও তাহারা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই কারণ :

সুতরাং ম্যালথুসীয় তত্ত্বের লক্ষণসমূহের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই অভিমত প্রদান করিতে হইবে। অপরদিকে যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্বের পরিবর্তে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার পূর্বে ডাঃ পি. জে. টমাস ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মোট উৎপাদনবৃদ্ধির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয়ই জনসংখ্যার তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১। ভারতে মোট উৎপাদন জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে

অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের অপরাপর সমর্থকগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ইহা দেখাইয়াছেন যে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে মাথাপিছু আয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ টাকা; ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা ২৮৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।† পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মাথাপিছু আয় শতকরা ১০·৫ ভাগ এবং আর্থিক মজুরি শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে প্রকৃত আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

২। মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই; অধ্যাপক ক্যান্যান (Cannan) প্রভৃতি কল্পিত ‘সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা’ (point of maximum production) এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। তবে যে ভারতে অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার নিম্ন মান প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি? কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে, ইহা হইল গতানুগতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং

ভারতে সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা এখনও পৌঁছায় নাই

* Second Five Year Planএর ৫ পৃষ্ঠা।

† ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

অন্যায্য বণ্টন। ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থার যদি আধুনিক রূপ দেওয়া যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিভিন্ন উৎপাদনকে যদি অধিকতর উৎপাদনাভিমুখী করা যায় এবং বর্তমান উৎপন্নের যদি ন্যায্য বণ্টন করা হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই থাকিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষতাহীন এবং বণ্টন-ব্যবস্থা অন্যায্য বলিয়াই ভারতীয়গণ প্রাচুর্যের মাঝখানেও দরিদ্র জীবন যাপন করে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের এই মতকে অধ্যাপক সেলিগম্যানের (Seligman) ভাষায় এইভাবে বিবৃত করা যায়: ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যা মাত্র সংখ্যার সমস্যা নহে; ইহা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা।*

ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা

ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতামত পোষণকারী আর একদল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যপথ দিয়া চলেন। তাঁহাদের মতে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। মিরডালের (Myrdal) অনুসরণে ইঁহারা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র বলিয়াও অভিহিত করিতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। জাতীয় আয়-কমিটি প্রদর্শিত মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইঁহারা বলেন যে প্রকৃত আয়ের যে-বৃদ্ধি গত ২০ বৎসরে ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যাকে সময় সময় ছাড়াইয়া গেলেও ইহা অতিমাত্রায় দৈবনির্ভরশীল। যে-কোন বৎসরে দেশের যে-কোন অংশে সহসা খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

অপরদিকে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইউরোপের বেলায় ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়াছিল। ইউরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য ম্যালথাসের তত্ত্বের কিছুটা গুরুত্ব আছে—কারণ ভারতে উৎপাদন ও জনসংখ্যা সাধারণত ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যে-সকল ম্যালথুসীয় লক্ষণ ভারতে পরিদৃষ্ট হয়—যথা, অনাহার, অর্ধাহার, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাহা অনেক সময় শাসননীতির অপপ্রয়োগেরই ফল। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রাকৃতিক উপায়গুলির কার্যকারিতাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া অযথা আশান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমানে ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা (state of over population) না ঘটিলেও জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাহ

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

মধ্যপন্থীদের সিদ্ধান্ত: ভারতে জনাধিক্য না ঘটিলেও গতি জনাধিক্যের দিকে

* "The problem of population is not one of mere number but of efficient production and equitable distribution."

ইতে জনসংখ্যার গতি যে জনাধিক্যের দিকে (tendency to over-population) াহা নির্ধারণ করা কঠিন নয়। এইভাবে আদমসুমারি কমিশনার (Census Commissioner) বিগত তিন দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করিয়া ভারতে জনাধিক্য টিয়াছে—স্পষ্ট এই অভিমত প্রকাশ না করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত বিশেষ ংকটের সম্মুখীন।

বর্তমানে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, এখনও ভারতে জনাধিক্যের বস্থা ঘটে নাই, তবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপ্রতিহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই নাধিক্য ঘটিবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও উৎপাদনবৃদ্ধি বেশী দিন বর্ধমান জনসংখ্যার ইত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। এইজন্য খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি খাদ্য-ৎপাদনবৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও পরামর্শ দিয়াছে। স্তুত, ভারতে যে বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে -সম্পর্কে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত।

জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি (Future Growth of Population) :

পরি-উক্ত উপসংহারের পর জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

বর্তমানে কুৎসিনস্কির (Kuczinski) বিখ্যাত প্রণালীকে জনসংখ্যা কি হারে দ্ধি পাইতেছে তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই প্রণালীকে নীট পুনরুৎপাদন হার (Net Reproduction Rate) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে প্রণালীটি হইল এইরূপ : প্রথমে দেখিতে হইবে যে, যে-বয়সে সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা সাধারণত ১৫-৪৫ বৎসর) সেই বয়সে দেশের স্ত্রীলোকগণ কি হারে স্ত্রী-সন্তান প্রসব রে। তারপর এই হার হইতে যে-সকল কন্যা-সন্তান সন্তানবতী হইবার পূর্বেই মারা ায় এবং যাহারা কুমারিত্ব, বৈধব্য ইত্যাদির জন্য সন্তানবতী হইতে পারেন না তাহাদের গড় বাদ দেওয়া হয়। ফলে যে সংখ্যা বা গড় পাওয়া যায় তাহাই নীট পুনরুৎপাদনের হার। এই হার ১ হইলে জনসংখ্যায় হ্রাস বা বৃদ্ধি কোন দিকেই কিছু ঘটে না—জনসংখ্যার আয়তন একই থাকে। এই হার ১-এর কম এবং ১-এর বেশী হইলে বুঝিতে হইবে যে যথাক্রমে জনসংখ্যার াস ও বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান ীট পুনরুৎপাদনের হার ১ অপেক্ষা সামান্য কম ; ভারতে কিন্তু ইহা অধিক। সুতরাং নির্ভরযোগ্য প্রণালীর হিসাব অনুসারে ভারতে নিয়মিত জনবৃদ্ধি ঘটিয়া চলিতেছে।

ীট পুনরুৎপাদনের ার

ীট পুনরুৎপাদনের ার অনুসারে ভারতে নবৃদ্ধি ঘটিতেছে

এই প্রণালীতে হিসাব অনুসারে ভারতে কি-হারে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা অবশ্য ঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়-কমিটির জনসংখ্যা সাবকমিটি এই ারকে ১·৫-এর কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। নীট পুনরুৎপাদন হার প্রায় ১·৫ হইলে জনসংখ্যা ১৯৭১ সাল বা ২০ বৎসরের পূর্বে ৫০ কোটিতে পৌছিবে। এই হিসাব অবশ্য অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। কিংকস্‌লে ডেভিসের এক সাম্প্রতিক

হিসাব অনুসারে ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার হইল ১৩০—অর্থাৎ ১০০ জন বর্তমা মাতা ১৩০ জন ভাবী মাতা রাখিয়া যায়। এই হিসাব অনুসারেও ত্রিশ বৎসরের ব পূর্বেই ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়াইয়া যাইবে।

নীট পুনরুৎপাদন হারের প্রণালী নির্ভরযোগ্য হইলেও ভারতে নীট পুনরুৎপাদনে হার নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরা

আদমসুমারির রিপোর্টে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অভিমত

একমাত্র ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ না করি জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালে আদমসুমারির চূড়ান্ত রিপোর্টে ইহাই করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, খাদ্যের যোগানে কোন বিশে প্রতিবন্ধক, সহসা মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রভৃতি না ঘটিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্য নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইবে :

সাল	জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়া কোটিতে)
১৯৫১	৩৬
১৯৬১	৪১
১৯৭১	৪৬
১৯৮১	৫২

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান হারে আগামী ত্রিশ বৎসরের পূর্বে জনসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়াইয়া যাইবে। ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতি

জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

রিপোর্ট অনুসারে এই বৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনা অত্যধিক না হইলেও ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের প ইহার ভীতির কারণ। সুতরাং প্রয়োজন হইল প্রতিবিধা অবলম্বনের।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব (Effect o Development Planning upon Populational Growth)

এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব লইয়া আলোচনা ক যাইতে পারে। সাধারণের, এমনকি অনেক অর্থবিদ্যাবিদেরও ধারণা যে উন্নয়ন কার্যাবলী ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। কুৎসিনস্কি, ডাঃ চার্লস প্রভৃতি উন্নত দেশ সমূহের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন যে শিল্পোন্নতির সংগে সংগে ঐ সক দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া গিয়াছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতে অনেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতেও উন্নয়ন কার্যাবলীজনিত জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, (তত্ত্বের উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা আংশিকভাবে সত্য মাত্র। উন্নত দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি হার কমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে; তৎপূর্বে জনসংখ

[পূ]র্বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডাঃ নবগোপাল দাশ বলেন, "অন্যান্য [দে]শের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক অবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিই ঘটায়, হ্রাস নহে।" প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে—অর্থাৎ বেশ কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হইলে, জনসংখ্যা সমহারে বাড়িতে থাকে। তারপর উন্নয়নের পরিমাণ আরও বাড়িলে [জ]নসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে সুরু করে। অতএব, উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক [এ]বং চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

[প্রা]থমিক অবস্থায় [উ]ন্নয়নকার্য জনসংখ্যার [বৃ]দ্ধি ঘটায়

ভারত এখন পরিকল্পিত উন্নয়নকার্যের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। সুতরাং এই [অ]নুমান করাই স্বাভাবিক যে বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি [পা]ইয়াছে। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Princeton University) দুইজন [অ]ধ্যাপক—এ্যানস্‌লে কোলে (Ansley Coale) ও এড্‌গার হুভার (Edger [H]oover) ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়া যে তথ্যপূর্ণ [পু]স্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অভিমতই সমর্থিত হইয়াছে। পুস্তিকাটির নাম হইল "ভারতে ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" (Population Growth and Economic Development in India, 1956-86)। অধ্যাপকদ্বয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ভারতে জনসংখ্যা বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে [বা]ড়িতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরও ছাঁটকাট করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র [তৃ]তীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কথাই উঠে না। ইহা করা হইলে জীবনযাত্রার মান [অ]পরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে অথবা নামিয়া আসিবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে [ছাঁ]টকাট করিয়া বর্তমানে (১৯৫৮, ডিসেম্বর) যে ৪,৫০০ কোটি টাকাতে দাঁড় করান [হই]য়াছে তাহা বজায় রাখিতেই হইবে। সম্ভবমত ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক বরাদ্দ [৪,৮]০০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ [১]০,০০০ কোটি টাকার মত) ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

[ভা]রতেও ইহা [ঘ]টিতেছে

জীবনযাত্রা প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল (Effect [of] Populational Growth on the Pattern of Livelihood) :

[জী]বনযাত্রা প্রণালীর [উপ]র জনসংখ্যাবৃদ্ধির [ফল]: ১। মাথাপিছু [কৃষি]-জমির পরিমাণ [ক]মিয়া যাওয়া

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর এই জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল কি হইয়াছে এবং ফল আর কি হওয়া সম্ভব। জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রথম ফল হইল মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২১ [সা]ল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ১১১ সেণ্ট হইতে ৮৪ [সে]ণ্টে পরিণত হয়। দুই প্রকার শস্য উৎপাদনকারী জমির (double crop

area) এবং সেচসমন্বিত জমির (irrigated area) পরিমাণও ঐ সময়ের মধ্যে যথাক্রমে ১৩ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টে এবং ১৮ সেণ্ট হইতে ১৪ সেণ্টে নামিয়া আসে। সুতরাং কোন দিক দিয়াই মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে তাল রাখিতে পারে নাই।

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে বহুসংখ্যায় পল্লী অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুসন্ধানে নগরাঞ্চলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বিগত আদমসুমারির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ ৫১ সালের মধ্যে পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট শতকরা ৩৮·৭ ভাগ বাড়ে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১১৯·৷ ভাগ। অধ্যাপক কোলে ও হুভারের মতে, জনসংখ্যার নগরজীবনের প্রতি এই আকর্ষণ বিশেষ কাম্য নহে। ইহা শিল্পোন্নয়নের সূচক হইলেও, ইহা নগরজীবনে ভারসাম্যের অভাব ঘটাইতেছে। সুতরাং এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন এবং সংগে সংগে মূল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি জাতীয় নগরাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা (a national urban development plan) গ্রহণ করাও অপরিহার্য।*

২। জনসংখ্যার নগরাভিমুখী গতি ও ইহার ফল

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি ফল হইল প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণবৃদ্ধি। জাতীয় আয়-কমিটির সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় যে এখনও শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লোক কৃষি এবং অনুরূপ জীবিকা অর্থাৎ প্রাথমিক জীবিকাসমূহের (primary occupations) উপর নির্ভরশীল। বিগত আদমসুমারি অনুসারে শতকরা ৬৯·৮ ভাগ লোক জীবিকার জন্য মাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করিত। জাতীয় আয়-কমিটি আর একটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অনুপাত শতকরা ১·২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে মাধ্যমিক ও তৃতীয় জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ যথাক্রমে ৩·৫ এবং প্রায় ·৮ কমিয়া যায়।

৩। প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণবৃদ্ধি

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই অভিমত সমর্থন না করিয়া উপায় নাই যে জনসংখ্যা ও দেশের আর্থিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন ও রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে— জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসংগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হইল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্যতম প্রয়োজনীয় সর্ত।†

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

* Population Problem and Economic Development in India.

† Second Five Year Plan-এর ৭ পৃষ্ঠা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ (Suggested Remedies for checking Populational Growth) : আদমসুমারি কমিশনারের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল 'অদূরদর্শী মাতৃত্ব'কে (improvident maternity) পরিহার করিবার ব্যবস্থা করা। অদূরদর্শী মাতৃত্ব বলিতে আদমসুমারি কমিশনার বুঝাইয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় মাতৃত্ব লাভ করা। এইরূপ অদূরদর্শী মাতৃত্ব রহিত করার পন্থা হিসাবে সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার, লোকের কুসংস্কার দূরিকরণার্থে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যায় উপদেশ কেন্দ্র (Family Planning Clinics), দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় বা বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবিধানসমূহ : ১। অদূরদর্শী মাতৃত্ব পরিহার করা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হইল বিবাহের, বিশেষত স্ত্রীলোকের বিবাহের, বয়সকে বাড়াইয়া দেওয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া দিলে সন্তানবতী হইবার মোট সময়কে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং যে-সময় সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে সেই সময় হইতে কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং জন্মহার কমিয়া যায়।

২। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া

উপরি-উক্ত পদ্ধতিসমূহের সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষার বিস্তার করিয়া, কুসংস্কার দূর করিয়া, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ করিয়া ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সময়-সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি ও পন্থাগুলি কার্যকর হইবার পূর্বেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বিবাহের বয়সকে আইনের দ্বারা বাড়াইয়া দিলে কতটা কার্যকর হইবে বলা কঠিন। স্ত্রীলোকের বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারক 'সর্দা আইন' কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই বলিলেই চলে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের বয়স আপনা হইতেই বাড়িয়া গিয়াছে ; ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় নাই। এই বয়স বাড়িয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীসমূহ যাহারা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারা এখনও এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নাই। শিক্ষার অভাবে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন ; সন্তান তাহাদের নিকট কোন দায়িত্ব নহে—বরং সামান্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই পরিবারের উপার্জনশীল সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া দিয়া জনসংখ্যাকে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সকল কারণে অনেকের মত হইল যে, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অবলম্বনীয় পন্থা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা।

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ও পন্থাসমূহের সমালোচনা

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উন্নয়নের স্তরে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Adopted Remedies)ঃ এখন যে-যে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে মাত্র কিছুদিন পূর্ব হইতে

জন্মসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন করার কোন প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ যুগে হয় নাই বলা চলে। জাতীয় সরকার-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতেই এ-দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে; এবং জাতীয় আয-কমিটির ও ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার উপব অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পরিবাব পরিকল্পনার প্রয়োজনীযতা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেও ইহার উপব যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য বরাদ্দ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন সমস্যার গুরুত্বকে লঘুই করিয়াছিল। উপরন্তু, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যাণ। ইহার ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক কল্যাণকে পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য সূত্র লইয়া গবেষণা করা হয়; বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালান হয়; শতাধিক পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ-কেন্দ্রও খোলা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যাদি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যার উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় মোট পরিবার নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল প্রায় ৫ কোটি টাকা। ইহা দ্বারা নগরাঞ্চলে ৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২,০০০—এই ২,৫০০ জ্ঞান বিতরণ-কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। কর্মসূচী নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড (Family Planning Boards) স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং পুস্তিকা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ-বিষয়ে প্রচারকার্য চালান হইতেছে।

সমালোচনা: অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ পর্যাপ্ত নহে

এই সকল পদ্ধতি অবশ্য কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। বিশেষভাবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার না ঘটিলে এগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে মোট ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে। তবুও প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় ইহা অধিক; তবে কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা বিস্তারের উপর শুধু জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা নয়; অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও অল্পবিস্তর নির্ভরশীল।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যা (Problem relating the Regional Distribution of Population): জনসংখ্যার ঘনত্ব বা আঞ্চলিক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, এক এক অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল এবং এক এক অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সর্দার পাণিকর

নক বণ্টনজনিত
র গুরুত্ব

তর মতে জনসংখ্যার বণ্টনজনিত এই অসমতাই ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রধান ।।* সুতরাং ইহার সমাধানের প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া যে-অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা এই শ্রেণীর লেখকগণের মতে হইল আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যা। যদি জনবহুল অঞ্চলসমূহ হইতে বেশ কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনবিরল সমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ভারতে জনাধিক্যের বিশেষ কোন সমস্যাই থাকিবে সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ (internal migration) হইল জনাধিক্যের ার প্রধান সমাধান।

তানুসারে
ক্যের সমস্যার
সমাধান

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের মাধ্যমে ভারতে জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান করা ব কিনা এই বিচার করিবার জন্য জানা প্রয়োজন যে, কি-কি বিষয় দ্বারা জনসংখ্যার লিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলি দেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া যে-যে অঞ্চলে কৃষিকার্যের সুবিধা আছে সেই-সেই অঞ্চলে জনবসতি বিশেষভাবে ঘন। কৃষিকার্যের সুবিধা বলিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি, ভূমির অবস্থানগত প্রকৃতি (con-ration of land), বৃষ্টিপাত, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতিই বুঝায়। নিম্ন ও উচ্চ গয় সমতলভূমিতে (Lower and Upper Gangetic Plains) এই উপাদান-র অস্তিত্ব অধিকমাত্রায় বর্তমান বলিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হুল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-য়াংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের এই অংশেই বাস করে। নিম্ন-গাংগেয় সমতলভূমিতে ংখ্যার ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গমাইলে ৮৩২ জন করিয়া।

বিষয় দ্বারা
লক ঘনত্ব
রিত হয়

ভূখণ্ডের পক্ষে কৃষিকার্যে জনবসতি অনুকূল হইবার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই কৃষিকার্য জনবসতির ঘনত্বের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বর্তমানে আর জনবসতির আকর্ষক নহে। সুতরাং লোক গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাভিমুখী হইয়াছে। যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা

ন ভারতে
াণিজ্য জন-
র ঘনত্বকে
বণ করিতেছে

* ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বিশেষমাত্রায় জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিতেছে। বলা যায়, ভারতে কৃষির দ্ব জনসংখ্যার বণ্টন নির্ধারণের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা নির্ধার যুগ আসিয়াছে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক বিষয়সমূ পরিবর্তে জলসেচ-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বন্যানিরোধ-ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞা অবদানই বর্তমানে জনবসতির ঘনত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে

এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা জনগণ-সম্পর্কিত সমস্যার কত সমাধান করা যায় তাহা দেখা যাউক। অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভা জনবসতির গড় ঘনত্ব মোটেই অধিক নহে; বরং বিশেষ ক পূর্বে বলা হইয়াছে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজা অঞ্চল ধরিয়া ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব ২৮১-র কিছু উপর। দুই অঞ্চল বাদ দিলে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ৩১২-তে দাঁড়ায়।* তুলনায় ইংল্যাণ্ড ওয়েলসের জনবসতির ঘনত্ব প্রায় ৭০০; জাপানে প্রায় ৬০০; এবং বেলজিয়ামে ৬৫০- অধিক। সুতরাং জনবসতির গড় ঘনত্বকে সূচক হিসাবে ধরিলে ভারতে জনাধি ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাহা হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনাধিক্যে আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে বর্তমানেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসংখ আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা কতদূর কি ব্যবস্থা করা সম্ভব ইহাই হইল প্রশ্ন।

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব অধিক নহে

জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ করার জন্য প্রয়োজন জনবি অঞ্চলসমূহে সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসা কিন্তু সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজভাবে করা গে জনবিরল অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। শিল্প-বাণি অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রাকৃতিক কারণসমূহও শিল্পের আঞ্চলি বহু পরিমাণে নির্ধারণ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেখানে কয়লা ও লৌহ নাই সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্থাপন করা কত সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। জমির উৎপাদিকা-শক্তির কতকটা সহজসাধ্য হইলেও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থা মরুভূমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করার কথার উল্লেখ করা যা পারে। বনবেষ্টনী রোপণ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা আধু বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা করা সম্ভব হইলেও, করিতে বহু দিন লাগিবে। ইতিমধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অকাম্যা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের উপর অতিমাত্রায় নি

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের সম্ভাবনা কতদূর

একমাত্র আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ পর্যাপ্ত সমাধান হইতে পারে না

---

* ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়া জনাধিক্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা য়োজন। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনবৃদ্ধি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের হ্রাসের গ সংগে আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থাও কিছুমাত্রায় অবলম্বন করা যাইতে রে। এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিবিধানের মাধ্যমেই ভারতের জনসংখ্যা-সম্পর্কিত সমস্যার ন্ত সমাধান সম্ভব।

প্রশ্নোত্তর

1. **Examine some of the salient features of the Indian population as ealed by the last census.**

[ইংগিত: ভারতে জনসংখ্যার আয়তনবৃদ্ধি, আঞ্চলিক বন্টন, বসবাসপদ্ধতি, জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি রূপে বিবৃত করিয়া জনাধিক্যের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা কর। ...(৬৫-৭১ পৃষ্ঠা দেখ।)]

2 **Is India over-populated? Give reasons for your answer.**

[C. U. B. A. 1940, '43, '50; B. Com. 1955]

[ইংগিত: জনসংখ্যার আয়তন সকল সময়ই দেশের আর্থিক সম্পদের আপেক্ষিক। আর্থিক সম্পদ প্ত হইলে ক্ষুদ্রায়তন দেশেও বৃহৎ জনসংখ্যার পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে। আবার ধক সম্পদ অপ্রতুল হইলে বৃহদায়তন দেশেও ক্ষুদ্র জনসংখ্যা অধিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রাং কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইবে ঐ দেশের আর্থিক সম্পদের প্রেক্ষিতে।

আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত দুইটি তত্ত্ব—ম্যালথুসীয় ও কাম্য জনসংখ্যা অনুসারে কোন জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আর্থিক সম্পদ বলিতে মাত্র খাদ্য-ানই ধরিয়া লয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুসারে মাত্র খাদ্য যোগাইবার তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বিচার হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে কিন্তু দেশের সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের হ জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, অর্থনৈতিক ণ বিচার অনুসারে ঘটে নাই। বর্তমানে এই দুই তত্ত্বের কোনটাকেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ হয় না। তাই ভারতে একদল মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আছেন যাঁহাদের মতে, ভারতে বর্তমানে ধিক্য না ঘটিলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিলে অদূর ভবিষ্যতেই জনাধিক্য ঘটিবে—উৎপাদনবৃদ্ধি র সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে । ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে এইরূপ মধ্যপন্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে। ..(৭২-৭৭ পৃষ্ঠা ।)]

3. **Discuss the effect of development planning upon the growth of population India.** [C. U. B. Com. 1958] (৭৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

4 **What are the factors that determine the density of population in India? w far can internal migration solve India's population problem?** (৮৩ ৮৫ পৃষ্ঠা)

5. **Discuss the effects of increase of population on the pattern of liveli-od.** (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

6. **Make out a case for population planning in India. Discuss the steps that ve been taken to this end.** (৭৬-৮২ পৃষ্ঠা)

7. **Discuss the growth of population in this country in relation to the growth food supply.** (৭৩ ৭৫ পৃষ্ঠা এবং খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর দেখ।)

অষ্টম অধ্যায়

কৃষি—সাধারণ পর্যালোচনা

(Agriculture—A General Survey)

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব (Importance of Agriculture in the Economic Life of India) : কৃষি প্রাচীনতম উপজীবিকা হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দিন দিন আরও কমিয়া যাইতেছে। ভারতে কিন্তু শিল্পের সত্ত্বেও এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে এই গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাইবে।

শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও ভারতে কৃষির গুরুত্ব কমে নাই

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষিকার্যের সহিত জড়িত। ইহার উপর যদি ব্যাপক অর্থে কৃষির সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে ধরা হয় তবে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ভাগ মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকেও ছাড়াইয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-উৎপাদন বিশেষ পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী গত তিন-চার ধরিয়া অপরিবর্তিতই আছে। অন্যান্য দেশের সহিত তু ভারতে কৃষির উপর এইরূপ অত্যধিক নির্ভরশীলতা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে ইংল্যাণ্ডের এইরূপ ব্যক্তিগণের ভাগ কমিতে কমিতে ৫-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকরা ভাগ হইল ১২।

১। কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ অপরিবর্তিতই আছে

জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট জাতীয় আয় ১১,৪০০ কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ কৃষিকার্য ও অনুরূপ উপজীবিকাসমূহ হইতে উপা হইয়াছিল।

২। কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ অর্জিত হয়

তৃতীয়ত, খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। খাদ্য অনুসন্ধানকারী কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee) মতে, দ্বি পরিকল্পনার শেষেও বৎসরে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি থাকি ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের রিপোর্ট অনুসারে তৃ পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্য করিতে হইবে (১৯৫৮-৫৯ সালের উৎপাদন ৭ কোটি টন ধরা হইয়াছে।)। ন খাদ্যসংকট ঐ পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়া দিবে। সুতরাং কৃষির উপর সমধিক গু আরোপ করিতেই হইবে।

৩। খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে

কৃষিজ দ্রব্যসমূহকে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে গণ্য করা চলে। এই কাঁচামালের উপর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, তৈল ও বনস্পতি শিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে হইলে উপরি-উক্ত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

৪। শিল্পে কাঁচামাল যোগানের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও কৃষিজ দ্রব্যাদির ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনেরই (colonial type) ছিল—অর্থাৎ ভারত তখন প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি ও নির্মিত দ্রব্যসমূহ (manufactured articles) আমদানি করিত। যে কাঁচামাল রপ্তানি করিত তাহার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যাদিই ছিল প্রধান। এখনও কাঁচা পাট, চা, তৈলবীজ, তামাক, মসলাপাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট প্রায় ৫৭৬ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র চা-এরই রপ্তানি-মূল্য ছিল ১২৯ কোটি টাকা।*

৫। বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) ভারতের সামগ্রিক সমাজজীবনেও কৃষির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের সামগ্রিক জীবন ও অর্থনীতিতে কৃষির সম্যক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উপরন্তু, ভারতের ক্ষেত্রে "কৃষিকার্য উপজীবিকা মাত্র নহে। ইহা অন্যতম জীবনযাপন-প্রণালী যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে রূপদান করিয়া আসিতেছে।" সুতরাং ভারতীয় কৃষির আধুনিকিকরণ এবং ইহার সহিত শিল্পপ্রসারের সমন্বয়সাধন করিয়া কৃষিকে সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহাই করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এবং এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সার্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল কৃষির উপর।

কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Indian Agriculture):

ভারতে অন্যান্য উপজীবিকার উপর কৃষির যে অনন্যসাধারণ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ভারতীয় কৃষির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উপজীবিকা হিসাবে ভারতে কৃষিকার্য বিশেষভাবে জনবহুল এবং ইহার উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এই গতি কোনমতেই কাম্য নহে। ইহা ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অনগ্রসরতারই লক্ষণ। যদি আমরা দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে না চাই তবে এই গতির পরিবর্তনসাধন

বৈশিষ্ট্য:
১। উপজীবিকা হিসাবে কৃষির ভারাধিক্য ভারতীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য

* Report on Currency and Finance for 1958-59.

করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সেই ব্যবস্থারই সূচনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মূলশিল্প গঠনের উপর।

উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে লোকে কোনমতে মাত্র দিন গুজরান করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে উপজীবিকা বা পেশা বলিয়া বর্ণনা করা একরূপ ভুল। ইহা হইল ভারতীয়গণের প্রধান জীবনধারণপ্রণালী। অনন্যোপায় হইয়াই সংখ্যাধিক্য ভারতীয় এই প্রণালী পুরুষানুক্রমে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

২। ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সাধারণ নীতি হইলেও ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল ভারতে কৃষি-জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা। যৌথ পরিবার প্রথার বিপুপ্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস প্রভৃতির ফলে বিশেষ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-জমির একক (unit of cultivation) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৩। ভারতে ক্ষুদ্রায়তনে কৃষিকার্যই হইল রীতি

চতুর্থত, কৃষিকার্যের পদ্ধতিও বিশেষ পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলসেচ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে।

৪। কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি প্রাচীন

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্যই ভারতীয় কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে ; তাহা হইল কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্পতা। ভারতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্য গম তুলা ইক্ষু প্রভৃতি শস্য ঐ সকল শস্য-উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণের একটি ধারণা পাওয়া যাইবে

৫। উৎপাদনের স্বল্পতা

		প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ (পাউণ্ডে)
গম	জাপান	১,৬৬৮
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০৮০
	অষ্ট্রেলিয়া	৯০০
	ভারত	৫৮১
ধান্য	জাপান	৩,৫৩৩
	মিশর	৩,৩৩৩
	ব্রহ্মদেশ	১,২৪০
	ভারত	৭০২

		প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ (পাউণ্ডে)
তুলা	মিশর	৫৯০
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩১০
	ভারত	৮০

উপরের ছকটি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে স্তুত। কিছুদিন পূর্বে উৎপাদন আরও কম ছিল। ১৯৫৩ সাল হইতে জাপানী ক্কতিতে ধান্য চাষ স্বরু করার পর হইতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্য উৎপাদন এবং :ব প্রয়োগ ও জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অন্যান্য শস্যেরও গড় উৎপাদন বাড়িয়া রূপ দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রিদপ্তরের পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুসারে ৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের গড় আরও বাড়িয়া ৮১৬ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।* াহাই হউক, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ এখনও অত্যল্প স্বল্প।

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনার পর একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারা যায় না। ইহা হইল ভারতের প্রাচীনতম ও প্রধানতম জাতীয় মূল শিল্পের (National Key Industry) অনগ্রসরতা। বস্তুত, ভারতীয় কৃষি বিশেষভাবে পশ্চাদ্‌পদ। ধান জাতীয় শিল্প বলিয়া ইহার উন্নয়নের প্রশ্নই সবাগ্রে আসিয়া পড়ে। সাম্প্রতিক ্গের ধ্বনি যে শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতেই পারিব না তাহা ভারতের ক্ষেত্রে াংশিকভাবে সত্য মাত্র। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পোন্নয়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে ড়িত আছে কৃষির পুনবাসন, পুনর্গঠন ও আধুনিকিকরণের প্রশ্ন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ-প্রসংগেই আলোচনা করা হইবে। কিন্তু তাহার পূবে ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে সামান্য ধারণা করা প্রয়োজন।

ান্ত: ভারতীয় ষি অতিমাত্রায় নগ্রসর

ভারতের কৃষিজ উৎপাদন (Agriculture Production of India)

ষিজ উৎপাদনের ুইটি বৈশিষ্ট্য

ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এমন কোন বিশেষ শস্য নাই যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, মোট কৃষি-মর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়।

খাদ্যশস্য (Food Crops) : ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কৃষি-জমির পরিমাণ ছিল কোটি ৭০ লক্ষ একর। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ হইতে ৬ কোটি টনের কিছু বেশী দ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল। হইতে ৬৭ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতেও ২৪ লক্ষ টন অধিক দ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

* **Handout of the Directorate of Economic and Statistics.—Min istry of Food d Agriculture.**

ভারতের খাদ্যশস্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

ধান্য (Rice) : ধান্য সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। ১৯৫৮-৫৯ সালে চাউলের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৫ লক্ষ একরের উপর এবং অনুমিত উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালের এই অংক ভারতীয় ইউনিয়নে ধান্য উৎপাদনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত বা রেকর্ড। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক।

১৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের রেকর্ড

গম (Wheat) : খাদ্যশস্য হিসাবে গমের গুরুত্ব হইল ধান্যের পরই। ১৯৫৭-৫৮ সালে গম উৎপাদনের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৬ লক্ষ একর এবং উৎপাদন হইয়া ছিল ৭৭ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহা অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অধিক গম উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক, বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনার সূচনা হইতে গমের উৎপাদন একরূপ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।* কিন্তু তবুও গমের উৎপাদন ভারতের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে গম আমদানি করিতে হইতেছে।

ইক্ষু (Sugarcane) : ভারতে ইক্ষুর জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল পৃথিবীর মধ্যে সবাপেক্ষা অধিক এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ধরিলেও ভারতকে সর্বপ্রধান ইক্ষুর উৎপাদক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; তবুও ভারত চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই; এখনও ভারতকে বহু পরিমাণে চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ একর এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ টন ইক্ষুগুড় উৎপন্ন হয়।

সর্বপ্রধান উৎপাদক হইয়াও চিনি উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে

অন্যান্য খাদ্যশস্য (Other Foodgrains) : অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ডাইল জোয়ার বাজরা যব ভুট্টা প্রভৃতিই প্রধান। ডাইল ভারতীয়গণের, বিশেষত নিরামিষ ভোজিগণের, প্রধান খাদ্যের প্রধান উপকরণ। যে জমিতে দুই প্রকার শস্য উৎপাদন করা যায় তাহাদের অধিকাংশেই দ্বিতীয় ফসল হিসাবে ডাইল উৎপন্ন হয়। আঞ্চলিকতার দিক দিয়া দেখিলে প্রায় সমগ্র ভারতেই ইহা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি টনের উপর।

জোয়ার বাজরা যব প্রভৃতি দরিদ্রের খাদ্য। সুতরাং দরিদ্র দেশ ভারতে ইহাদের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সকল খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের মত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ৭৬ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি আশা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা অপেক্ষা ৩৫ লক্ষ অধিক বা মোট ৬·৫ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপর ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন অধিক উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য

* **Review of the First Five Year Plan—May, 1957.**

বাণিজ্যিক শস্য (Commercial Crops) : সাধারণত বাণিজ্যিক শস্য বলা হয় সেই ফসলগুলিকে যেগুলি কৃষক সরাসরি নিজে ভোগ না করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। এই অর্থে ইক্ষু খাদ্যশস্য হইলেও বাণিজ্যিক বা কারবারী ফসল। কিন্তু ইক্ষুকে খাদ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। বলা যায়, ইক্ষু খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক শস্যের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তুলা পাট তৈলবীজ চা কফি তামাক এবং রবারই প্রধান।

বাণিজ্যিক শস্য কাহাকে বলে

তুলা (Cotton) : তুলা সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল। অবিভক্ত ভারত তুলা উৎপাদনে অবিসংবাদে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; প্রথম স্থানে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশবিভাগের ফলে তুলা উৎপাদনের জমির শতকরা ৩০ ভাগের কিছু বেশী পাকিস্তানের অংশে পড়ায় ভারত দ্বিতীয় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। বর্তমানে আবার তুলার উৎপাদন যে-ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে অনুমান করা হইয়াছে যে ভারত আবার তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলার উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতকে এখনও বহু পরিমাণে এই তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের কিছু উপর এবং সকল রকমের তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭ লক্ষ গাঁইটের মত।

পাট (Jute) : অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল পাটের একচেটিয়া উৎপাদক ও রপ্তানিকারক। দেশবিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন হইয়া দাঁড়ায় পৃথিবীর মধ্যে পাটের প্রধান আমদানিকারক দেশ। দেশবিভাগের ফলে ভারতের অংশে মোট উৎপন্নের এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি মাত্র পড়ে এবং ভারতীয় পাটকলগুলির পক্ষে মূলত পাকিস্তানী যোগানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ফলে ভারতকে পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

বর্তমানে ভারত কাচা পাট উৎপাদনে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৯ সাল হইতে কিছু কিছু কাঁচাপাট রপ্তানিও সুরু করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।

দেশবিভাগের পর পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

তৈলবীজ (Oilseeds) : তৈলবীজেও ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উৎপাদক। উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি সরিষা তিল চীনাবাদাম এরণ্ড বীজ বা রেড়ি এবং নারিকেলই প্রধান। এই সকল তৈলবীজের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তৈলই যে শুধু নানা প্রয়োজনে লাগে তাহাই নহে; ইহাদের অপজাত বা খইলও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা

তৈলবীজের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস

হইত। বর্তমানে বনস্পতি শিল্প প্রসারলাভ করায় তৈলবীজের পরিবর্তে তৈলই অধিক রপ্তানি করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ জন্মে। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে সর্বপ্রকার (নারিকেল বাদ দিয়া) তৈলবীজ উৎপাদন করা হয় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭ লক্ষ টনের মত। তৈলবীজ উৎপাদনে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৫৫ লক্ষ টন মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তৈলবীজের মোট উৎপাদন-লক্ষ্য হইল ৭৬ লক্ষ টন।

বর্তমান উৎপাদন

চা (Tea): চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ-বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। কিন্তু রপ্তানির দিক হইতে দেখিলে ভারতকেই প্রথম স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ভারতে উৎপন্ন মোট চা-এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বা ৫০ কোটি পাউণ্ডের মত প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে চা-এর মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১৩০ কোটি টাকার মত।

ভারত চা-এর প্রধান রপ্তানিকারক দেশ

বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ একর এবং উৎপাদন ৬৮ কোটি পাউণ্ডের উপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ কোটি পাউণ্ড উৎপাদন ও ৫০ কোটি পাউণ্ড রপ্তানির লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

বর্তমান উৎপাদন

তামাক (Tobacco): তামাক উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনদেশের পরই। তবে ভারতে উৎপন্ন তামাকের বিশেষ কিছু রপ্তানি হয় না; প্রায় সমগ্রটাই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে লাগিয়া যায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে তামাকের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ একর এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২.৫ লক্ষ টন।

ভারতে প্রভূত পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইলেও ভারতীয় তামাক হইতে সেই পরিমাণে সিগারেট ও চুরুট তৈয়ারি হয় না। ইহার কারণ হইল উৎকৃষ্ট পাতা তামাকের অভাব। কিভাবে উৎকৃষ্ট পাতা তামাক উৎপাদন করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা-কার্য চালান হইতেছে।

পাতা তামাকের উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা

অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্ন (Other Agricultural Products): অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্নের মধ্যে কফি রবার সিনকোনা এবং আফিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কফির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদনও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

ভারতে রবার বহু পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও, উৎকৃষ্ট জাতের রবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার একর এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ ৫০ হাজার টনের কাছাকাছি। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রবারের চাষ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিনকোনার চাষ হয় পশ্চিমবংগের দার্জিলিং এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে। বর্তমানে ম্যালেরিয়ার অন্যান্য প্রতিষেধক বাহির হওয়ায় কুইনাইনের কাঁচামাল হিসাবে সিনকোনার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আফিমের চাষ হয়। একসময় ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে আফিম চীন প্রভৃতি দেশে চালান যাইত। বর্তমানে আর আফিম রপ্তানি করা হয় না। পূর্বে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে নীলের চাষ হইত। কিন্তু জার্মানীতে কৃত্রিম রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন যা-কিছু নীলের চাষ হয়, তাহা হয় বিহারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে শতকরা ১৭ ভাগ সকল কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়। পরে উহাকে শতকরা ২৭ ভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Indicate the importance of agriculture in the economic life of India.** (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)।
2. **Describe the characteristics of Indian agriculture.** (৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)।

নবম অধ্যায়

কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা

(Problems of Agricultural land)

আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার কারণ উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যেই নিহিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতীয় কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জমি, কৃষি-শ্রমিক, কৃষিগত মূলধন এবং কৃষিগত সংগঠন—এই চারিটি উপাদানই ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকটির সম্পর্কেই সমস্যা রহিয়াছে। এখন আমাদিগকে এই সকল সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইবে। অনুসৃত প্রতিবিধান পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত না হইলে অন্য সমাধানেরও ইংগিত দিতে হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলিরই পর্যালোচনা করা হইবে।

[margin: ষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের চারিটি উপাদানই ত্রুটিপূর্ণ]

ভারতে কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা বহুবিধ। প্রথমত, চাষযোগ্য সকল জমিই আবাদী জমি নহে। সুতরাং প্রথমত, সমস্যা হইল অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিবার সমস্যা—পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সমস্যা—অর্থাৎ চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা। ইহার পর আছে জলসেচের সমস্যা—ভারতের শুষ্ক জমিতে যাহার গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যূন করিয়া দেখা যায় না। তাহার পর তৃতীয় স্থানে আছে কৃষি-জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির

[margin: কৃষি জমি সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা]

সমস্যা। পরিশেষে আছে খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জমি বা জোতের (holdings) সমস্যা—প্রধানত যাহার জন্যই ভারতীয় কৃষি হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুনাফাহীন (unprofitable or uneconomic)।

চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা (Problem of Extending the Area of Cultivation): ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল বা ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর।* ইহার মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমি বা মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৯ ভাগের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (land utilisation statistics) পাওয়া গিয়াছে। এই ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমির মধ্যে কৃষি-জমি ও কৃষিকার্যের উপযুক্ত পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ:

জমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

		একর কোটি	একর লক্ষ
১।	নীট কর্ষিত জমি	৩২	৭
২।	বর্তমানে অনাবাদী জমি	২	৯৪
৩।	চাষযোগ্য অপচয়	৫	৩৬
৪।	তৃণভূমি, ফলের বাগান ইত্যাদি	৪	৩৪
৫।	অন্যান্য (বন, মরুসদৃশ জমি, বাড়ীঘর ইত্যাদি দ্বারা অধিকৃত জমি)	২৭	২৬
		৭১	৯৭

দেখা যাইতেছে যে, মোট কৃষি-জমির পরিমাণ হইল ৩৫ কোটি ১ লক্ষ (৩২ কোটি ৭ লক্ষ + ২ কোটি ৯৪ লক্ষ) একর। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে বর্তমানে চাষ হয় না, কিন্তু এক সময় হইত। সুতরাং এই সকল 'বর্তমানে অনাবাদী জমি'তে (current fallows) পুনরায় কৃষির ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং সহজও। উপরন্তু, প্রায় ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ একর জমি চাষযোগ্য অপচয় (cultivable waste) হিসাবে পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে অবশ্য সবটাতেই কৃষিকার্য করা ব্যয়ের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তবে হিসাব করা হইয়াছে যে ১ কোটি একরের মত জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। হিসাবটিকে মানিয়া লইলে দেখা যায়, চাষের জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ একরের মত (২ কোটি ৯৪ লক্ষ + ১ কোটি) বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বর্তমানে অনাবাদী জমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কার্য।

চাষের জমির পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

এখন প্রশ্ন হইল, ইহা যদি সহজসাধ্যই তবে কৃষি জমির জন্য এত বুভুক্ষা সত্ত্বেও এই সকল জমি বর্তমানে পতিত হইয়া রহিয়াছে কেন? উত্তরের সন্ধানে অবশ্য বেশীদূর

* **India, 1959**—২৫১ পৃষ্ঠা।

ইতে হয় না। এই সকল জমি সাম্প্রতিক কালে পতিত হইয়া থাকিবার কারণ হইল ালেরিয়া, নগরিকরণ (urbanization) অথচ পরিবহনের অবন্দোবস্ত এবং জমির ়পাদিকা-শক্তি ক্ষয়ের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। সুতরাং বর্তমানে াবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিতে হইলে সমস্যাটিকে তিন দিক দিয়া ক্রমণ করিতে হইবে—অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত রিতে হইবে এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

চাষযোগ্য অপচয়কে অবশ্য চাষের জমিতে পরিণত করা কঠিন কার্য। এই সকল মি হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত অবস্থায় আছে, না হয় কোনকালে লাঙলের সংস্পর্শে সে নাই। ইহার জন্য ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত ছাড়াও শক্তিচালিত ধুনিক যন্ত্রাদির প্রয়োজন। সংগে সংগে এই সকল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের স্থাও করিতে হইবে। না হইলে এই সকল জমি চাষযোগ্য হইবার পরও অনাবাদী দাে পড়িয়া থাকিবে। অনুমান করা হইয়াছে যে দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে সকল জমির ফসল হইতে ইহাদের আবাদী জমিতে পরিণত করার খরচ উঠিয়া ইবে।

পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা (Land Reclamation in India):

নাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার বা পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রথম চেষ্টা হয় ১৯৪৭ সালে। ঐ বৎসর মার্কিন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত ২০০ ট্রাক্টর া কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ব ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) হইতে ঋণ করিয়া ভারত সরকার আরও ২৪০টি নূতন ট্রাক্টর ক্রয় করে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক প্রায় ১২ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধৃত হয়। ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত ঐ সংগঠন দ্বারা রুদ্ধৃত জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ একরে গিয়া পৌছিয়াছে।* বর্তমানে সংগঠন নিত দণ্ডকারণ্যে কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি রাজ্য সরকার তাঁহাদের য় ট্রাক্টর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে রাজ্য ট্রাক্টরগুলি ট ১৭ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার করে।**

ন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রাক্টর
তিষ্ঠা সংগঠন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার তে মোট ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই ব্যয়ে মোট প্রায় ৭৪ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন ১৪ লক্ষ একরের উপর জমি পুনরুদ্ধার করিবে, রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠনগুলি করিবে প্রায় ১২ লক্ষ একরের মত, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকেরা মোট প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিকে চাষের জমিতে

ম পরিকল্পনাতে
দ ও ব্যবস্থা

* India—1959.

** Review of the First Five Year Plan.

পরিণত করিবে। পরিকল্পনা কমিশনের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে উক্ত লক্ষ্যে অধিকাংশে পৌছান সম্ভব হইয়াছে; এবং তরাই, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক পুনরুদ্ধৃত কৃষি-জমিতে কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে সুরু করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি-জমির উন্নয়ন-ব্যবস্থা

পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা ছাড়াও প্রথম পরিকল্পনায় বাঁধ নির্মাণ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা ৩০ লক্ষ একরের মত কৃষি-জমির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ১৫ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার এবং ২০ লক্ষ একর জমির উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই কার্য কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন, বিভিন্ন রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হইবে। ট্রাক্টর চালান শিক্ষাদান করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে একটি ট্রাক্টর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর একটি শিক্ষাদান-কেন্দ্র স্থাপন করিবার কথা আছে। ইহা ছাড়া ভারতের বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকারের ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রের উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পরীক্ষাকেন্দ্রও (a tractor testing centre) খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে ট্রাক্টরও নির্মিত হইতেছে। ১৯৫৯ সালের মে মাসে প্রথম ট্রাক্টর নির্মিত হয়।

সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব

জলসেচের সমস্যা (Problem of Irrigation): মৌসুমী বায়ুর আলোচনা প্রসংগে ভারতে জলসেচের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে*। এখন বিশদভাবে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। কাজেই এখানে শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এখানে সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম রাজস্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে বৎসরে মাত্র ৫-১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ভারতে অনেকাংশেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে সারা বৎসরই সেচকার্যের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, সুজলা অঞ্চলেও সারা বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে সেচের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অনাবৃষ্টির বৎসরে শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ধান্য ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জলসরবরাহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, এবং এই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত জলসরবরাহ একমাত্র সেচের মাধ্যমেই সম্ভব। তৃতীয়ত, মৌসুমী বায়ুর ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রধানত বর্ষাকালে। কিন্তু আমাদের দেশে নানাপ্রকার শীতকালীন ফসলও উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সকল ফসলের জন্যও সেচের সুবন্দোবস্তের প্রয়োজন। পরিশেষে, বর্তমানে যে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা

* ১২-১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতেছে তাহার জন্যও সেচকার্যের প্রয়োজন। এই সকল জমি সেচ-সমন্বিত হইলে তবেই উৎপাদনশীল চাষের জমিতে পরিণত হইতে পারে। সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, কৃষিকার্যের নিশ্চয়তা, প্রসার এবং বৃদ্ধির জন্য ভারতের ন্যায় দেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এইজন্যই স্যর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) বলিয়াছিলেন, "ভারতে সেচই সব ; এখানে জল স্বর্ণ অপেক্ষাও মূলবান।"

ত্বের সংক্ষিপ্তসার

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান শাসকেরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেচপ্রণালী খনন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তারপর ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে থাকায় বিদেশী শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত সেচের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে যে সেচ-ব্যবস্থা করা হয় তাহা পৃথিবীতে একরূপ অনন্যসাধারণ। এই সেচ-ব্যবস্থার ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের মরুসদৃশ অঞ্চল শস্যশ্যামল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয় ; কৃষিজ উৎপাদন অনেকাংশে বাড়িয়া যায় ; দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হয় এবং রাজস্বেরও বৃদ্ধি ঘটে।

কার্যের ইতিহাস

বর্তমানে ভারতে মোট কৃষি-জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি সেচ-সমন্বিত। ইহা যে মোটেই পর্যাপ্ত নহে সে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই করা যাইবে। তাই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে নানাভাবে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে। এ-সম্বন্ধে বিশদ সমালোচনা করার পূর্বে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা (Types of Irrigation Works) :

ভারতে প্রধানত চারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—যথা, কূপ নলকূপ পুষ্করিণী এবং খাল।

কূপ (Wells) : কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা কৃষকের আয়ত্তাধীনে বলিয়া ইহা ভারতের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এখন পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে মোট সেচ-সমন্বিত জমির এক-চতুর্থাংশে বা প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে কূপ হইতে জলসেচ করা হইত।*

উপযোগিতার দিক হইতে দেখিলে কূপ হইতে সেচ-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে খাল প্রভৃতি সেচ-ব্যবস্থার ন্যায় জল কম পড়িবার বা অতিরিক্ত হইবার বিশেষ ভয় নাই ; ইহা কৃষকের আয়ত্তাধীন বলিয়া প্রয়োজনমত ইহার খননের ব্যবস্থাও করা চলে। কিন্তু কূপ খনন করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কূপ হইতে সেচ-ব্যবস্থার ইহাই প্রধান অসুবিধা। সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় স্বল্প ব্যয়ে কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য ছোট ছোট যন্ত্রচালিত পাম্পও সরকার হইতে কৃষকগণকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল পাম্পের মূল্য কিস্তিতে দেয়। প্রথম

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ছোট ছোট সেচকার্যের জন্য মোট বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা মধ্যে একটা মোটা অংশ কূপ খনন ও কূপ সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হয়। পরিকল্পনার সূচনায় এই সূত্র হইতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইত। বলা হইয়াছে যে ইহা বাড়িয়া ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একরে দাঁড়ায়।

প্রথম পরিকল্পনাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যবস্থা

নলকূপ (Tubewells): ১৯৪৩ সালে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' (Grow More Food Campaign) সুরু হইবার পর হইতে নলকূপের সাহায্যে জলসেচ প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে নলকূপ প্রোথিত করা এবং নলকূপ হইতে জল উত্তোলন করা কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা অপেক্ষা সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। উপরন্তু, কূপ শুকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু নলকূপ হইতে সারা বৎসর ধরিয়া পরিমিত জল সরবরাহের আশা করা যায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ভারতে সেচকার্যের জন্য মোট ২,৫০ নলকূপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ৬ লক্ষ একরের মত জমিতে নলকূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ লক্ষ একরের কিছু অধিক জমিতে নলকূপ দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা

পুষ্করিণী (Tanks): পুষ্করিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র ভারতে মোট ১ কোটি একরের উপর জমিতে পুষ্করিণী হইতে জলসেচ করা হয়।* ইহার মধ্যে মাত্র মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ হইল প্রায় অর্ধেক। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশেও পুষ্করিণী হইতে জলসেচ-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ ও অন্ধ্র সরকার এ দিকে আরও দৃষ্টি দিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় পুষ্করিণী হইতে প্রায় ৮৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত। বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ১ কোটি ১০ লক্ষ একরের উপর দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছোটখাট সেচ ব্যবস্থা হইতে ৯০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার একটা বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই পুষ্করিণী ভাগে পড়িবে। কিন্তু কতটা পড়িবে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কিছুই বলা হয় নাই।

পুষ্করিণী হইতে জলসেচের দুইটি প্রধান অসুবিধা আছে: ইহা বৃষ্টিপাতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং বরাবর পুষ্করিণী সংস্কার করিতে হয়। তবুও যেখানে অন্যরূপ সেচ ব্যবস্থা করার অসুবিধা আছে এবং যেখানে সহজেই মাটির নীচে জলের সন্ধান মিলে সেখানে পুষ্করিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থার সপক্ষে মত দিতে হইবে। কূপ নলকূপ ও পুষ্করিণী হইতে সেচকে সামগ্রিকভাবে ছোটখাট সেচ ব্যবস্থা (minor irrigation works) ব

প্রথম পরিকল্পনায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee.

হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সামগ্রিক সূত্র হইতে প্রায় ১ কোটি একর জমিকে সেচ-সমন্বিত করা হয়।*

খাল (Canals): সকল দিক হইতে বিচার করিলে খালই হইল জলসেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণও বটে। খাল হইতে জলসেচের নির্ভরযোগ্য হিসাবও ১৯৫৫-৫৬'সাল পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ঐ হিসাব অনুসারে এই সূত্র হইতে ২ কোটি ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত।

ভারতে তিন ধরনের খাল আছে: প্লাবন খাল (Inundation Canal), নিত্যবহ খাল (Perennial Canal) এবং সঞ্চিত জলের খাল (Storage Canal)। বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি বা প্লাবনের জল যে-সকল খালে প্রবেশ করে তাহাদিগকে প্লাবন খাল বলে। নদীর জল যখন শুকাইয়া যায় তখন আর এই সকল খাল হইতে জলসেচকার্য চলে না।

তিন ধরনের সেচ খাল:
১। প্লাবন খাল

নিত্যবহ খালগুলিতে কিন্তু সারা বৎসরই জল থাকে। নিত্যবহ খালগুলিতে জল প্রেরণ করিবার জন্য নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধিয়া জলের উচ্চতাকে প্রয়োজনীয় উচ্চতার উপরে তোলা হয় এবং স্লুইস গেটের সাহায্যে জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

২। নিত্যবহ খাল

অনেক সময় উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়াও বৃষ্টির জলকে আটকাইয়া জল সঞ্চয় করা হয়। পরে সম্ভব হইলে সারা বৎসরই খাল মারফত এইরূপ সঞ্চিত জল কৃষিক্ষেত্রে যোগান দেওয়া হয়। সুতরাং সঞ্চিত জলের খালকেও নিত্যবহ খালরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ভারতের প্রধান প্রধান খাল নিত্যবহ।

৩। সঞ্চিত জলের খাল

খাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। ইহা হইতে জল-সরবরাহ প্রচুর পরিমাণেও করা যায়। কিন্তু নদীগুলি নিত্যবহ না হইলে জলসেচ বরুণদেবতার কৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং অনাবৃষ্টির বৎসরে, যখন বিশেষ করিয়া জলসেচের প্রয়োজন, তখন জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না। উপরন্তু, নদীর জল যদি লবণাক্ত হয় তবে কৃষি-জমিতে ধীরে ধীরে একটি সূক্ষ্ম লবণের স্তর পড়িতে থাকে এবং শেষে এই সকল জমি কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থা (Irrigation under Planned Economy): দেশবিভাগের সময় ভারতের অংশে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ একর সেচ-সমন্বিত জমি পড়ে, এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ইহা বাড়িয়া ৫ কোটি ১০ লক্ষ একরে গিয়া দাঁড়ায়। এই ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমি ছিল তৎকালীন মোট কর্ষিত জমির শতকরা ১৭ ভাগের মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৩ লক্ষ একর জমি বড় বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা (major and medium irrigation works) দ্বারা এবং আরও ১ কোটি একর জমি ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা

* Review of the First Five Year Plan.

সেচ-সমন্বিত হইয়াছে।* উক্ত ৬৩ লক্ষ একর বড় বড় সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির মধ্যে ১০ লক্ষ একর এরূপ জমি আছে যাহা পূর্বে পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির ন্যায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থাধীন ছিল। সুতরাং ইহা বাদ দিলে প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-সমন্বিত জমির নীট বৃদ্ধিকে (net addition) ১ কোটি ৫৩ লক্ষ একরে ধরা যায়। এই বৃদ্ধির ফলে মোট কর্ষিত জমির অনুপাতে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৭ ভাগ হইতে শতকরা ২০ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।** এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিমধ্যে কর্ষিত জমির পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়; এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে ৩৮১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫টি নূতন সেচ-ব্যবস্থা আছে; ইহার মধ্যে ১০টির ব্যয় হইবে ১০-৩০ কোটি টাকার মধ্যে, ৭টির ব্যয় হইবে ৫-১০ কোটি টাকার মধ্যে এবং বাকিগুলির ব্যয় হইল ৫ কোটি টাকার কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মাঝারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড়, মাঝারি, ছোট—সকল প্রকার সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণকে ২ কোটি ১০ লক্ষ একরের মত বৃদ্ধি করিবার আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার দান হইবে ৯০ লক্ষ একর এবং বাকী ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থাধীনে আসিবে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা। অবশ্য পরবর্তীকালে হিসাব করা হইয়াছে যে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা ১ কোটি ৪ লক্ষ একরের বেশী জমি সেচ-সমন্বিত হইবে না।†

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

বড় বড় সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিই হইল প্রধান। নিম্নে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন উভয়ের দিক দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project): দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য চারিটি—যথা, বন্যানিরোধ, জলসেচ, শক্তি-উৎপাদন এবং কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের যাতায়াতের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য নাব্য খাল খনন। যাহা হউক, জলসেচকেই দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

* Review of the First Five Year Plan.

** Second Five Year Plan—৩২৩ পৃষ্ঠা।

† Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

দামোদর পরিকল্পনায় জলসেচের উদ্দেশ্যে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ে বাঁধ (dams) বাঁধিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সঞ্চিত জলের প্রবাহ পশ্চিমবংগের দুর্গাপুর নামক স্থানে ধরা হইবে এবং সেখান হইতে অসংখ্য খাল দ্বারা ১০.৫০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইবে। ইহার পূর্বেই অবশ্য বিহারের ১ লক্ষ একরের মত জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এই ১১.৫০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৭.৫০ লক্ষ একর জমি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই সেচ-সমন্বিত হইবে।

জলসেচ

দামোদর পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ ও তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা হইল যথাক্রমে ১ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হইল বোকারো, দুর্গাপুর এবং চন্দ্রপুরা; এবং জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় পূর্বোক্ত তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ের কেন্দ্র হইতে। বর্তমানে ১ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২.৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা (Bhakra-Nangal Project) : ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা হইতে আরও অধিক জমিতে জলসেচের অনুমান করা হইয়াছে। সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে মোট ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সেচ-সমন্বিত হইবে ২৩ লক্ষ একর জমি।*

ইহা জলসেচের বৃহত্তম পরিকল্পনা

ভাকরা-নাংগল পরিকল্পনার মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হইল ৬০ লক্ষ কিলোওয়াটের উপর।

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Mahanadi Valley Project) : মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে শেষ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র হীরাকুঁদ বাঁধ হইতেই ৬.৭০ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে। এই হীরাকুদ বাঁধই মহানদী পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তি হইল ১.২৩ লক্ষ কিলোওয়াট।

কুশী পরিকল্পনা (Kosi Project) : কুশী পরিকল্পনা লইয়া বহুদিন ধরিয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়া কুশী পরিকল্পনার কার্য পুরাদমে সুরু করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বন্যানিরোধ হইলেও ইহা হইতে বিহার রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা যাইবে।

* Second Five Year Plan—৩৬২ পৃষ্ঠা এবং India—1959.

চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Project) : মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে চম্বল নদীর উপর তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচ-ব্যবস্থার যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাই চম্বল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। চম্বল পরিকল্পনার কার্য মাত্র ১৯৫৪ সাল হইতে সুরু হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৯২ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে।

তুংগভদ্রা পরিকল্পনা (The Tungabhadra Project) : ইহা মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় নির্মিত হইতেছে। সমাপ্ত হইলে পরিকল্পনাটি হইতে প্রায় ৮·২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪৫ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (Mayurakshi Project) : পশ্চিমবংগের দিক হইতে দামোদরের পরই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হয়। ময়ূরাক্ষী দামোদরের মত খেয়ালী নদী নয়। ইহা হইতে ৪ হাজার কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইলেও জলসেচই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া কার্যকর করা হইতেছে। ময়ূরাক্ষীর সম্পূর্ণ কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বেই শেষ হইবার কথা। তখন ময়ূরাক্ষীর খালসমূহ হইতে প্রায় ৭ লক্ষ একরের উপর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কলম্বো পরিকল্পনার (Colombo Plan) সর্তানুসারে কানাডা সরকার বহন করিতেছে। এই কারণে ময়ূরাক্ষীর মাসানজোড় বাঁধকে 'কানাডা বাঁধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা পশ্চিমবংগের দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিকল্পনা

নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (Nagarjunasagar Project) : ইহা অন্ধ্ররাজ্যের বৃহত্তম জলসেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা মাত্র ১৯৫৭ সালে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে মোট ১৯·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা হইতে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর।

ইহা অন্যতম বৃহৎ জলসেচ পরিকল্পনা

অন্যান্য পরিকল্পনা : ইহার পর আছে বোম্বাই-এর 'কাক্‌রাপাড়া পরিকল্পনা' (Kakrapara Project), মহীশূরের 'ভদ্র জলসঞ্চয়স্থান' (Bhadra Reservoir), মাদ্রাজের 'নিম্ন-ভবানী পরিকল্পনা' (Lower-Bhabani Project), উত্তরপ্রদেশের রাইহান্দ পরিকল্পনা (Rihand Project) প্রভৃতি। ইহারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সংগে অল্পবিস্তর জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে। তবে কাক্‌রাপাড়া পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল জলসেচ। অনুমান করা হইয়াছে যে, সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে ৫·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেকগুলি নূতন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য শুরু করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জলসেচের দিক দিয়া বোম্বাই-এর নর্মদা ও উকাই (Ukai) পরিকল্পনা, অন্ধ্রের পূর্ণা পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবংগের কংশবতী পরিকল্পনাই প্রধান। অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক দিয়া কেরলের নারীযামংগলম-কেন্দ্র, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল ও মাহরা কেন্দ্র এবং বোম্বাই-এর খাপারখেদা কেন্দ্রই প্রধান। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ফলে এই পরিকল্পনা হইতে কয়েকটি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাদ গিয়াছে—কারণ এই খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দ ৯১৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৮২০ কোটি টাকা করা হইয়াছে।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন নির্মাণকার্য

মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিক্ষয়ের সমস্যা (Problem of Declining Fertility of the Soil): মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বা উর্বরতা নানাভাবে ক্ষয় হয়। প্রথমত, ভারতের ন্যায় পুরাতন দেশ—যেখানে কৃষিকার্য বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসা হইতেছে সেখানে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির সকল দানের মত মৃত্তিকারও উৎপাদিকাশক্তির একটি সীমা আছে বলিয়া এরূপ ঘটে। সুতরাং মৃত্তিকার উবরতা রক্ষাকল্পে মানুষের কর্তব্য হইল ক্রমাগত এই ক্ষয়পূরণ করিয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সার (manures) এবং উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি (fertilizers) প্রয়োগ করিতে হয়।

ক। সাধারণ কৃষিকার্যের পদ্ধতিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির ক্ষয়

এখন প্রশ্ন, অতি প্রাচীনকাল হইতে কৃষিকার্য করিয়া আসার ফলে ভারতে মৃত্তিকার উবরতা কতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং কতটাই বা ইহার পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে? অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা যে-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূরণ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, যদিও ভারতের মৃত্তিকা বিপজ্জনকভাবে উৎপাদন-শক্তি হীন হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

ভারতের মৃত্তিকার উবরতা হ্রাসের প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে কিন্তু এ-সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। গোময়, নগর ও পল্লী অঞ্চলের ময়লা ও আবর্জনা, সরিষা ইত্যাদির খইল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি সুলভ সার মৃত্তিকায় ব্যবহার না করিয়া অপচয় করা হইয়াছে। অপরদিকে রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং আমদানির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং ভারতে মানুষ ব্যবহারের দ্বারা মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন করিয়াছে কিন্তু ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করে নাই।

প্রতিবিধান কল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ:

* **Re-appraisal of the Second Five Year Plan, Sept. '58.**

ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র ১৯৫১ সাল হইতে। এই সালে সিন্ধ্রি এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট (ammonium sulphate) নামক রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কারখানা। ইহাতে বর্তমানে মাসিক গড়ে ৩৮ হাজার টন করিয়া এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তি অনুসারে ঐ দেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে সিন্ধ্রিতে উৎপন্ন রাসায়নিক সারেরই যথেষ্ট চাহিদা হয় না, কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করিয়া জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ সুরু করিবার পর হইতে, রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন হইল ৪ লক্ষ টন কিন্তু চাহিদা হইল ৯ লক্ষ টনের উপর।* ফলে এখন একা সিন্ধ্রি আর সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার তৈয়ারির আরও তিনটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ইহার রুরকেলা, নিভেলি এবং নাংগলে স্থাপিত হইবে; নাংগল ও রুরকেলার কারখানা স্থাপনের কথা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত উৎপাদনক্ষমতা হইল ১.৫০ লক্ষ টন। ইহার উপর ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্ধ্রির উৎপাদনক্ষমতা প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য সমাপ্ত হইলে সিন্ধ্রি হইতে এ্যামোনিয়াম সালফেট ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের সার উৎপন্ন হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, টাটা কোম্পানী প্রভৃতি সার তৈয়ারির পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। বেশ কিছু পরিমাণ সার আমদানিও করা হইতেছে।

১। সিন্ধ্রির কারখানা

আরও নূতন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব

অপরদিকে আবার গোময়, আবর্জনা প্রভৃতির ন্যায় সহজলভ্য সারও যাহাতে অপচিত না হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও প্রচারকার্য চালান হইতেছে। অন্যান্য প্রকার সুলভ সার উৎপাদনও করা হইতেছে। ইহাতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলিকে (National Extension Service) অনেকটা কাজে লাগান হইয়াছে। এই সকলের ফলে সহজলভ্য সারসমূহের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

২। সহজলভ্য সারের যথাযোগ্য ব্যবহার

৩। প্রচারকার্য ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এদিকে দৃষ্টি

ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ক্ষয়ের দ্বারাও মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ঘটে। ইহাকে মৃত্তিকার ক্ষয় (soil erosion) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষয় দ্বারা মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণসমন্বিত উপরের ত্বকটি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই স্থানে এরূপভাবে বালুকা আসিয়া জমা হয় যে, ঐ কৃষি জমি চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইল যথেচ্ছভাবে অরণ্যভূমি এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন। বৃক্ষ এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন

খ। মৃত্তিকার ক্ষয় ও ইহার কারণ

* India—1959.

বা হইলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত ত্বকটিকে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সহজেই নষ্ট করিয়া ফলে। উপরন্তু, অরণ্যভূমি বায়ুপ্রবাহ গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। তবাং বনভূমি ধ্বংস করা হইলে একদিকে যেমন বায়ুপ্রবাহের বেগ সৃষ্টি হয়, অপরদিকে তমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। যে-অঞ্চলে এইরূপ ঘটে তাহা যদি মরুভূমির মীপবর্তী হয় তবে মৃত্তিকার ক্ষয়ের ফলে মরুভূমির প্রসার ঘটিতে থাকে। রাজস্থানের রুভূমির প্রসার এইভাবেই ঘটিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই মরুভূমি বৎসরে ড়ে আধ মাইল করিয়া উর্বর ভূমিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। বৃক্ষাদির অপরিকল্পিত ংসের জন্য পার্বত্য ভূমির ধ্বংসজনিত মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতি বৎসর বহুপরিমাণ ঘটিতেছে।

অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণও মৃত্তিকার ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। গবাদি পশু স্বাভাবিক ণগুল্মাদি ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাকে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের হাতে ছাড়িয়া দেয়।

তৃতীয়ত, জমির ব্যবহারের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে য়ী। অনেক সময় পার্বত্য ও ঢালু জমিতে বাঁধের ব্যবস্থা না করিয়াই চাষ করা য়। ফলে মৃত্তিকার উপরের ত্বক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া অথবা বৃষ্টির জলে য়া নীচে নামিয়া আসে।

মৃত্তিকার ক্ষয় যে ঠিক কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। বে কতিপয় অঞ্চল ইহার দ্বারা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে যে ফসল উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চিত। বিজাপুর জিলা, যাহাকে এক সময় 'দাক্ষিণাত্যের শস্য ভাণ্ডার' (Granary of the Deccan) বলিয়া বর্ণনা করা ইত, আজ সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া বারবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতেছে। পরিকল্পনা মিশনের হিসাব অনুসারে সকল পার্বত্য অঞ্চল, পতিত জমি ও চারণভূমির এক-ক্ষমাংশে মৃত্তিকার ক্ষয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।*

ত্তিকার ক্ষয়ের রমাণ

প্রতিবিধান : মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রতিবিধানের জন্য সম্যক না হইলেও কিছু কিছু ব্যবস্থা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা হইল রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারসমূহের নিজস্ব এলাকার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা। জাতীয় ভিত্তিতে প্রথম ব্যবস্থা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে। এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত র্মসূচী অবলম্বন করা হয়।

থম পরিকল্পনায় ত্তিকা সংরক্ষণের র্মসূচী

(ক) সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা;

(খ) দেরাদুনের অরণ্যসংক্রান্ত গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখা Soil Conservation Wing) সংযুক্ত করা;

(গ) সমবায়ের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংরক্ষক সমিতিসমূহ সংগঠনে সহায়তা করা;

(ঘ) সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা;

* Second Five Year Plan—৩০৬ পৃষ্ঠা।

(ঙ) বাজস্থানেব মরুভূমিব পশ্চিম সীমায় প্রস্থে ৫ মাইল ব্যাপী এক বনবেষ্ট বোপণ কবিযা উত্তবপ্রদেশ এবং দিল্লী রাজ্যেব দিকে এই মরুভূমিব অগ্রগতিকে বে কবা ,

(চ) এই কর্মসূচীকে কার্যকব কবিবাব জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন বাজ্যে প্রয়োজনী সংগঠন প্রতিষ্ঠা কবা।

কর্মসূচীকে কতদূর কাযকর করা হইযাছে

কর্মসূচী অনুসাবে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংবক্ষক বোর্ড (Central So Conservation Board) ও কতকগুলি বাজ্য মৃত্তিকা সংবক্ষ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড মৃত্তিকা সংবক্ষক কা শিক্ষাদানের জন্য ছযটি শিক্ষালয স্থাপন কবিযাছে। এই সব শিক্ষালয ২৫০ জন সবকাবী কর্মচাবীকে সংবক্ষণেব কার্যে শিক্ষাদান কবিয়াছে যোবপুবে নূতন বনভূমিব পত্তনসংক্রান্ত গবেষণাগাবেব প্রতিষ্ঠা কবা হইয়াছে। দেবাদুনে অবণ্যসংক্রান্ত শিক্ষালয়েব সহিত একটি মৃত্তিকা সংবক্ষক শাখাও (Soil Conservatio Wing) সংযুক্ত হইয়াছে।

উপবি-উক্ত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ছাডাও বোম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, উডিষ্যা, মাদ্রাজ, কেব পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব প্রভৃতি বাজ্যে মৃত্তিকা সংবক্ষণেব জন্য ১১টি দৃষ্টান্ত পবিকল্প (Pilot Schemes) গ্রহণ কবা হয়। ইহাদেব মধ্যে মাদ্রাজ ও কেবালেব দৃষ্ট পবিকল্পনাকে পবে উন্নয়ন পবিকল্পনায (development projects) রূপান্তবিত কব হয়। প্রথম পবিকল্পনায মোট ৭ লক্ষ একবেব মত জমিতে মৃত্তিকা সংবক্ষণেব ব্যব কবা হয। ইহাব দুই-তৃতীয়াংশেব অধিক একমাত্র বোম্বাই এই অবস্থিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায ৩০ লক্ষ একব জমিতে মৃত্তিকা সংবক্ষণেব বিশে ব্যবস্থা করিবাব কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে মূল পবিকল্পনায ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ কর হইয়াছিল। বর্তমানে ববাদ্দেব পরিমাণ হ্রাস কবিয়া ১৫·২৭ কোটি টাকায লইয়া যা হইয়াছে * প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পরিকল্পনায ববাদ্দেব পবিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা।

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা (Problem of Subdivided and Fragmented Agricultural Holdings): খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতেব সমস্যা হইল কৃষিকার্যের একক (Unit of Cultivation) সম্পর্কিত সমস্যা। উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেব ন্যায় কৃষিকার্যের বেলাতেও উৎপাদনেব একটি বিশেষ আয়তন ব্যয়েব দিক দিয়া ক বিবেচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষিকার্যেব ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ আয়তনে উৎপাদন কবিলে তবেই সর্বাধিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পাবে। অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের ন্যায় ভাবতেও জোতেব খণ্ডিকবণ ও অসম্বদ্ধতাব দরুন কৃষিকার্যের একক এই কাম্য আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র।

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা হইতে কৃষির এককসংক্রান্ত সমস্যা

* Re-appraisal of the Second Five Year Plan

খণ্ডিকরণ বলিতে বুঝায় উত্তরাধিকারের আইনের অধীনে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির
নের ফলে ব্যক্তিগত কৃষি-খামারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাওয়া ; এবং অসম্বদ্ধতা

রণ এবং
দ্ধতা কাহাকে

বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত জোত (holding) বহুদূর ব্যাপিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা। ভারতে উত্তরাধিকার আইন কৃষি-খামারকে উত্তরোত্তর খণ্ডীকৃত করিয়া কৃষিকার্যের এককের আয়তন দিন দিন কমাইয়া আনিতেছে। কৃষকের মৃত্যু হইলে ার জমিগুলি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে বণ্টিত হয়।* ফলে একটি কৃষি-ার বহু অংশে বিভক্ত হয়। এইভাবে বিভক্ত কৃষি-খামার আরও এক পুরুষ পরে বিভক্ত হয়। সুতরাং উত্তরোত্তর খণ্ডিকরণের ফলে কৃষি-খামারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে তর হইতেই থাকে। কৃষি-জমি যখন উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টিত হয়—অর্থাৎ ত্যক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির এক অংশ পাইয়া থাকে। ফলে প্রত্যেকের ত (holding) ছোট ছোট খণ্ড হিসাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে ইহাকেই ম্বদ্ধতা বলে।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার পরিমাণ (Extent of Subdivision and Fragmentation): বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারী ভাবে জোতের খণ্ডিকরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা য়াছে।

করণের পরিমাণ

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জানা। যে কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের পরিমাণ ছিল এইরূপ: বোম্বাই ১৩·৩ একর, ঞ্জাব ১০ একর, মহীশূর ৬·২ একর, উড়িষ্যা ৪·৯ একর, আসাম ৪·৮ একর, মাদ্রাজ ৪·৫ র, পশ্চিমবংগ ৪·৪ একর এবং উত্তরপ্রদেশ ২·৫ একর।

জোতের উপরি-উক্ত গড় আয়তন হইতে সাধারণ জোতের আয়তন সম্বন্ধে ভুল ণার সৃষ্টি হইতে পারে কারণ এই গড় নির্ণীত হইয়াছে সকল ছোট বড় জোত লইয়া। বাং জোতের ক্ষুদ্রতার সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যে আরও বিশদভাবে ্যানুসন্ধান ও তাহাদের বিচার করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে ভিন্ন রাজ্যে এই প্রকার তথ্যানুসন্ধান করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের ভিত্তিতে ন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে বোম্বাই রাজ্যে যেখানে জোতের গড় আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক (১৩·৩ একর), সেখানেও শতকরা ৫১ ভাগ জোতের পরিমাণ ৫ একরেরও কম। মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এই ৫ একরেরও কম জমি হইল যথাক্রমে শতকরা ৬৭, ও ৫৯ ভাগ কৃষকের। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে অনুমান করিয়া বলা হইয়াছে যে গড়ে

ভারতীয় গড়
করেরও কম

* হিন্দু সংহিতা আইন পাস হইবার পূর্বে হিন্দু কৃষকগণের জমি শুধু তাহাদের পুত্রদের মধ্যেই বণ্টিত

† Second Five Year Plan—২৩১-১৭ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক কৃষকের ২ একরেরও কম জমি আছে। উপরন্তু, এই সকল তথ্য হইল কৃ জমির মালিকানা (land holding) সম্বন্ধে। প্রকৃত কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জো খণ্ডীকৃত রূপ আরও প্রকট—কারণ কৃষকের জীবিত অবস্থা অনেক সময় তাহার উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের মধ্যে আপে কৃষি-খামার বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথক্‌ভাবে চাষ করিতে থা এরূপ ক্ষেত্রে মালিকানার দিক দিয়া কোন কৃষি-জমি একটি একক হিসাবে পরিগ হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা নানা অংশে বিভক্ত হয়।

কার্যক্ষেত্রে খণ্ডিকরণের রূপ আরও ব্যাপক

অধিকাংশ রাজ্যে জোতের অসম্বদ্ধতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য পরিসংখ্যান কোন সূত্র হই এখনও পাওয়া যায় না। যে-সকল রাজ্য সম্বন্ধে এই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা দু'একটি গ্রামের ভিত্তিতে বেসরকারী বা পুরাতন সরকারী অনুসন্ধানের ফল। এই এক অনুসন্ধানের ফলে বোম্বাই-এর একটি গ্রামে দেখা গিয়াছিল যে, গড়ে অর্ধ একর ২০ খণ্ডে বিভক্ত। বোম্বাই-এর কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরে ডাঃ হ্যারল্ড ম্যান (Dr. Harold Mann) আর একটি গ্রা দেখিয়াছিলেন যে, ১৫৬ জন কৃষকের ৭২৯ খণ্ড কৃষি-জমি আছে এবং ইহার মধ্যে ২ খণ্ডের আয়তন এক একরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। পাঞ্জাবের একটি গ্রামে দে গিয়াছিল যে, ১২,৮০০ একর জোত ৬,৩০০ খণ্ডে বিভক্ত। আসামে একটি হিসাব হই জানা যায় যে, গড়পড়তা প্রত্যেকটি জোত ৪.৫ খণ্ডে বিভক্ত।

অসম্বদ্ধতার পরিমাণ

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ (**Causes of Subdivision an Fragmentation**): জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা—উভয়ের কারণ সম্বন্ধে সাম ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডিকরণ সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলে "বিগত কয়েক দশকে জোতের খণ্ডিকরণের দিকে যে-গ পরিলক্ষিত হয় তাহা ইংরাজ বিচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় হিন্দু মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যার ফল।" এই ইংর বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া সকল স তাঁহারা ব্যক্তিগত মালিকানার অনুকূলেই ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছে ফলে কৃষি-জমির মালিকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জোতের খণ্ডীকৃত রূপও ত প্রকট হইয়াছে।

খণ্ডিকরণের কারণ : ১। উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যা

জমির খণ্ডিকরণ ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়তা করিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ধ্বংস এবং ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ। কৃ কমিশন তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন "জনসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সং মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগতই কমিয়া গিয়াছে।" জনসং যে-হারে বাড়িয়াছে সেই হারে যদি শিল্পোন্নয়ন হইত তাহা হই লোকে কৃষি-জমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিত না। জমির মালিকা ভোগ করিলেও নিজে চাষ না করিয়া জমি ভাড়া দিত। ফলে কৃষি-জমির একক ক্ষু

২। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের অভাব

ত ক্ষুদ্রতব হইতে পাবিত না। কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বাঁচিয়া থাকিলেও জোতেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এত কাড়াকাড়ি পড়িত না। যে উপজীবিকা দ্বারা কোনমতে মাত্র অন্নসংস্থান কবা যায়, যাহা মাত্র অস্তিত্ব বজায়েব ভিত্তিতে সংগঠিত— কুটিব ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি য় থাকিলে তাহাব প্রতি লোকেব বিশেষ আকর্ষণ থাকিত না। সুতবাং কুটিব ও ায়তন শিল্পগুলিব ধ্বংস হইল খণ্ডিকবণেব একটি প্রধান কাবণ।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন র ধ্বংস

চতুর্থত, পাশ্চাত্য ভাবধাবাব প্রসার এবং পবিবহন-ব্যবস্থাব উন্নতিব ফলে যৌথ পবিবাবেব ধ্বংসও অনেকাংশে জোতেব খণ্ডিকবণেব পথ প্রস্তুত কবিয়াছে। যতদিন একান্নবর্তী পরিবাবপ্রথা বজায় ছিল ততদিন কৃষি-সম্পত্তিব বণ্টন প্রকট রূপ ধাবণ কবে নাই। ইহাব ধ্বংস কবণেব গতিকে ত্ববান্বিত কবে।

ৌথ পবিবারের

সবশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনেব ভূমিকা। একটি সবকাবী বিপোর্টে বলা হইযাছে "হিন্দু উত্তবাধিকাব আইন ·····কুটিব শিল্পেব ধ্বংস ছাড়াও আব একটি কাবণ আছে যাহা এই অবস্থাকে আবও শোচনীয় কবিযা তুলিযাছে·····। ইহা হইল মর্টগেজ, বিক্রয় প্রভৃতিব দ্বাবা কৃষি-জমি জনেব নিকট হস্তান্তবিত হওয়া। ফলে প্রকৃত কৃষকেব জমিব পবিমাণ ক্রমশই কমিয়া তেছে এবং এই উত্তবোত্তব হ্রাসপ্রাপ্ত জমিই তাহাব উত্তবাধিকাবিগণেব মধ্যে ত হইতেছে।"

গাম্য মহাজনেব কা

অসম্বদ্ধতাব কাবণ মাত্র একটি। সামাজিক প্রথা অনুসাবে জোত বণ্টনেব সময সকল কৃষি-জমিই (piece of land) বণ্টিত হয। এইরূপ প্রথাব মূলে আছে অবশ্য বিভিন্ন কৃষি-জমিব মধ্যে উৎপাদিকা-শক্তিব পার্থক্য। সকল জমি যদি সমান উর্বব হইত এবং সকল তে যদি একই ফসল ফলান যাইত তাহা হইলে বোধ হয এইরূপ প্রথাব ব হইত না।

দ্ধতার কারণ— জিক প্রথা

জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার ফলাফল (Effects of Sub-vision and Fragmentation of Agricultural Holdings): প্রধানত ীব খণ্ডিকবণ ও অসম্বদ্ধতাব দরুনই ভাবতে কৃষিকার্য হইয়া দাড়াইযাছে মুনাফাহীন। প্রথমে জোতেব খণ্ডিকবণ লইযা আলোচনা কবিলে দেখা যে, ইহা কৃষি জমিব সম্যক ব্যবহাবেব বিশেষ পবিপন্থী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-খামাবেব আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উৎপাদনের উপাদানেব নিম্নতম এককেরও (unit) পূর্ণ নিয়োগ কবা সম্ভব হইয়া উঠে না। একজন ক, একজোড়া বলদ এবং একটি লাঙলকে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনেব নিম্নতম উপাদান বে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জমিতে ইহারও পূর্ণ ব্যবহাব কবা হয না। ফলে উৎপাদন-উপাদানের অপচয়েব দরুন উৎপাদনেব ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

করণের কুফল : উৎপাদনের ব্যয়-

ব্যয়বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যে-কোন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে কতক নির্দিষ্ট ব্যয় (fixed cost) বহন করিতে হয়। উৎপাদনের আয়তন যতই বিস্তৃত এই নির্দিষ্ট ব্যয় ছড়াইয়া গিয়া উৎপাদনের একক পিছু ব্যয়কে ততই হ্রাস করে। ভার কৃষির বেলায় ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জমির খণ্ডিকরণের দরুন উৎপাদনের আ অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং সমগ্র নির্দিষ্ট ব্যয়ই সামান্য পরিমাণ উৎপাদনের উপর পড়ে বা স্বভাবতই উৎপাদনের ব্যয় বিশেষ অধিক হয়।

অর্থবিদ্যায় যাহাদিগকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost) বলা তাহা উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে অধিকাংশ সময় কমিয়া আসে। উদাহরণস্ব কৃষির ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি ক্ষুদ্র ক্ষেতকে বেড়া আইল দিয়া ঘিরিতে যে-ব্যয় হয় একটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিতে বেড়া বা আইল ি সেই অনুপাতে কম ব্যয়ই হয়। এই কারণেও ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

অনেক সময় আবার জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয় যে, কয়েকপ্রকার পরিবর্তনশীল না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে জলসেচের উদাহরণ লওয়া যা পারে। জোত অতি ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া কূপ খনন ইত্যাদি দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা কা কৃষক মোটেই উৎসাহিত হয় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনমতেই সম হইতে পারে না। বর্তমান যুগ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগ। কৃষিকার্যেও ই কোনরূপ ব্যতিক্রম নহে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়ঃ মোট উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নান ব্যয়সংক্ষেপের ফলে একক পিছু উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস। ভার কৃষির পক্ষে উভয়ই অপরিহার্য। ভারতের উত্তরোত্তর বর্ধ জনসংখ্যা এবং শিল্পসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিজ উৎপ বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতীয় কৃষককে বর্তমানে পৃথিবীর বাহ প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়হ্রাসও আবশ্যকীয় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জমির খণ্ডিকরণের জন্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া এই লক্ষ্যের কোনটির অভিমুখেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইয়োরোপ আমেরিকায় বৃহদায়তনে উৎপাদন ও যন্ত্রিকরণ পদ্ধতির সাহায্যে কৃষির অভাব উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। সেখানে লোকে কৃষিকার্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করে; ভারতে খণ্ডীকৃত জোত বৃহদায়তনে উৎপাদন ও কৃষির যন্ত্রিকরণের পথে বিরাট বাধা দাঁড়াইয়া আছে। ফলে ভারতীয় কৃষক অনন্যোপায় হইয়াই পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড় ধরিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিয়া চলিতেছে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনভাবে সমর্থিত হইতে পারে না

২। কৃষি-জমির অপচয়

জোতের খণ্ডিকরণের জন্য অনেক কৃষি-জমিরও অপচয় ঘ বেড়া বা আইল দিয়া এত জমি নষ্ট করা হয় যে, ভারতের কৃষি-জমি বুভুক্ষুর দেশে ইহা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

অবশ্য জোতের খণ্ডিকরণ সবতোভাবেই সমালোচিত হয় নাই। তত্ত্বগত বা ।বহারিক অর্থনীতির দিক হইতে না হইলেও সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে সমর্থন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, খণ্ডিকরণ ব্যবস্থা সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা কৃষি-জমি মাত্র কয়েক জনের হস্তে কেন্দ্রীভূত । করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় ়, জমিতে বহুজনের মালিকানা রাখিয়াও বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। এই পদ্ধতিটি হইল সমবায় (co-operative) বা সামগ্রিক অর্থাৎ যৌথ (collective) পদ্ধতি। সুতরাং উপসংহার হিসাবে বলা ।য যে, জোতের খণ্ডিকরণ সম্পূর্ণভাবেই অসমর্থনীয় ব্যবস্থা। ইহার প্রতিবিধানের ।চেষ্টা আশু এবং অবশ্য কর্তব্য।

ণ্ডিকরণের সুফল

পসংহার

জোতের অসম্বদ্ধতার ফলে যে সকল কুফলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ডাঃ হ্যারল্ড ম্যানের উক্তিতে। ম্যানের ভাষায়, অসম্বদ্ধতা "উদ্যোগের বিনাশসাধন করে, শ্রমের বিরাট অপচয় ঘটায়, সীমানা নির্ধারণের জন্য বহু জমি নষ্ট করে এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব করিয়া তুলে।

সম্বদ্ধতার কুফল : ...্যোগ ও শ্রমের ...পচয়, বিবাদ- ...সংবাদ, অপকৃষ্ট ...ষি-পদ্ধতি প্রভৃতি

উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমত বলা যায় যে, অসম্বদ্ধতার ...রণে কৃষকের উদ্যোগ বহুমাত্রায় বিনষ্ট হয়। তাহার জোত বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...ংশে ছড়ান থাকে। ইচ্ছা এবং সংগতি থাকিলেও তাহার পক্ষে উদ্যোগী হইয়া কৃষির ...ন্নতিসাধন করার প্রশ্ন উঠে না—কারণ এরূপ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়ত, খণ্ডিকরণের মতই অসম্বদ্ধতার জন্য বহু জমি নষ্ট হয়। অসম্বদ্ধ জোতের ...ভিন্ন অংশগুলির নির্দেশকল্পে কৃষককে আইল নির্মাণ করিতে হয়, বেড়া দিতে হয়।

তৃতীয়ত, কৃষককে বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিতে যাতায়াত করিতে হয় ...লিয়া তাহার শ্রম, সময় এবং তাহার পশুশক্তির অপচয় ঘটে।

চতুর্থত, অনেক সময় পথ ও সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য অপরের জমির উপর দিয়া ...তায়াত করা হয় বলিয়া বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ইহার উপর ...ীমানা নির্ধারণ লইয়াও কৃষক ব্যয়বহুল মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে।

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত অপচয় ছাড়াও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, ...ষককে উৎপন্ন ফসল বিভিন্ন খণ্ডীকৃত জমি হইতে বহন করিয়া একস্থানে লইয়া আসিতে ...য়। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এইভাবে শতকরা ১৫-৩২ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

পরিশেষে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার জন্য কৃষকের পক্ষে জোতের ...ন্নিকটে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাহার জোত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপক ...খণ্ডের উপর ছড়ান রহিয়াছে তখন সে জোতের সন্নিকটে বসবাস করিবে কিরূপে?

অসম্বদ্ধতার সুফলের দিকেও অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ডাঃ রাধাকমল ...খোপাধ্যায়ের মতে, এই প্রকার স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (natural insurance) জোত

বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছড়ান থাকে বলিয়া ক্ষেতে একই ফসল উৎপন্ন হয় না। কোন কারণে একটি ফসল নষ্ট হইলে বা কোন ফসলের বাজার দর বিশেষ কমিয়া গেলে অপর এক ক্ষেত হইতে আর এক ফসলের আশানুরূপ বাজার-দর সামগ্রিক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। দ্বিতীয়ত অসম্বদ্ধতার দরুন বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া পালটি শস্য উৎপাদন (rotation of crops) সম্ভবপর হয়। ইহার ফলে কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতে হয় না; অধিকাংশ সময়েই সে কোন-না-কোন ফসলের উৎপাদনকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অসম্বদ্ধতা আবার কতকটা সাম্যের নীতিরও সূচক। খণ্ডিকরণের দরুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু জমি পাইয়া থাকে; অসম্বদ্ধতার জন্য সকলে বিভিন্ন উৎপাদিকাশক্তির কৃষি-জমি পাইয়া থাকে। ফলে সাম্যের নীতি আরও প্রসারিত হয়।

সুফল :

তবুও বলা যাইতে পারে যে, ত্রুটির তুলনায় অসম্বদ্ধতার গুণ অতি সামান্য- উপেক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং খণ্ডিকরণের মত অসম্বদ্ধতারও আশু বিলোপসাধন প্রয়োজন। বস্তুত, ইহা ব্যতিরেকে কৃষির উন্নয়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপ-সাধন অপরিহার্য

অর্থনৈতিক জোতের ধারণা (Concept of Economic Holding)

জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপসাধনের প্রশ্নের সহিত আংগাংগিভাবে জড়িত আছে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক জোত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়।

এখন অর্থনৈতিক জোতের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক জোত বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ একমত নহেন। ফলে ধারণাটিতেও কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। পূর্বে কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা করা হইত। এই দিক হইতে কীটিঞ্জের (Keatinge) মতে—অর্থনৈতিক জোত হইল সেইরূপ কৃষি-জোত যাহার উৎপাদন হইতে কৃষক সমস্ত খরচপত্র মিটানর পর যুক্তিসংগত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। অপরদিকে ডাঃ ম্যানের ধারণায় কৃষি-জোত যদি গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে তবে তাহাই অর্থনৈতিক জোত। অধ্যাপক জেভন্সের (Prof. Stanley Jevons) মতে, অর্থনৈতিক জোত উন্নত জীবনযাত্রার মানকে নিশ্চিত করিবে।

অর্থনৈতিক জোত সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

বর্তমানে কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক জোতের বিচার করা হয়—কৃষকেরই জীবনযাত্রার দিক হইতে নহে। এই ধারণা অনুসারে অর্থনৈতিক জোত হইল সেই জোত যাহা হইতে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

বর্তমান ধারণা

যে-দেশে কৃষির উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে মাত্র সেইখানেই এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগি বা উৎপাদনের ব্যয়ের দিক হইতে অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের কৃষির পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই ভারতে আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা হয় প্রথম দৃষ্টিভংগি বা কৃষকের দিক হইতে। 'অর্থ নৈতিক জোত' কথাটির দ্ব্যর্থবোধকতার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ইহার পরিবর্তে 'পারিবারিক ...ত' (Family Holding) কথাটি ব্যবহার হইয়াছিল।* পারিবারিক জোত বলিতে চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদনকারী গড় আয়তনের কৃষকপরিবারের জন্য যতটা জমি প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝায়। ...মানে অবশ্য আবার অর্থ নৈতিক জোত কথাটি ব্যবহার করা হইতেছে।

...রতে এখনও ...কের দিক হইতে ...র্থ নৈতিক জোতের ...তন নির্ধারণ করা ...নাই

...রবারিক জোত

এখন প্রশ্ন হইল, এই পারিবারিক জোত বা অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন কি ...বে? বলা যায়, অর্থ নৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত ...দ্রায়তনের অথবা অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের হইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তনই হউক অথবা ...দায়তনই হউক যদি তাহা নির্দিষ্ট মাঝারি আকারের কৃষক পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার উপযোগী হয় তবে তাহাই অর্থ নৈতিক বা পারিবারিক জোত। ইহা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে, জোতের আয়তন ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর—যথা, জমির অবস্থান, জমির উৎপাদিকা-শক্তি বা উবরতা, জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষিকার্যের ...তি ইত্যাদি। এই প্রসংগে মার্কিন বিশেষজ্ঞ হাউটষ্টনের (Howard E. ...outston)** একটি অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হাউটষ্টনের মতে, কৃষিজ ...পাদনবৃদ্ধির জন্য বৃহদায়তনের জোত অপেক্ষা উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির ...হারই অধিক প্রয়োজনীয়। জাপানেও জোতের একক অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেখানে ...ই সকল পদ্ধতি দ্বারা অধিক উৎপাদন সংঘটিত করা হয়। ভারতেও ইহা অবলম্বন ...রিলে মুনাফাহীন কৃষি-জোত অর্থ নৈতিক জোতে পরিণত হইবে।

...নৈতিক জোত ...ন কোন্ বিষয়ের ...র নির্ভর করে

হাউটষ্টনের উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হয় যে জোতের আয়তন ...দ্ধি ব্যতিরেকে কৃষির জন্য সংস্কারসাধন সম্ভব নহে—কারণ পদ্ধতিগত উন্নয়নেরও একটা ...মা আছে যে সীমা অতিক্রম করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of ...iminishing Returns) ক্রিয়া সুরু করিবে। এখন খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতকে ...র্থ নৈতিক জোতে পরিণত করিবার কিরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং আর কিরূপ ...চেষ্টা করা যাইতে পারে তাহা লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

* First Five Year Plan—১৯৫ পৃষ্ঠা।

** হাউটষ্টন মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা দলের (US Technical Mission) পরিচালক ...লেন। তিনি ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়াছিলেন।

খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও প্রস্তাবি প্রতিবিধানসমূহ (Remedies adopted and proposed again Subdivision and Fragmentation): খণ্ডী ও অসম্বদ্ধ জোতের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বিত প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাই পারে: জোতের সংহতিসাধান, যৌথ খামার প্রথা, সমবায় প্র কৃষিকার্য এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা।

অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের শ্রেণীবিভাগ

জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings): জো সংহতিসাধন বলিতে বুঝায় বিক্ষিপ্ত জোতকে একত্রিত করি সুসম্বদ্ধ জোতে পরিণত করা। পুনর্গঠনের জন্য কৃষক তা জোতের অংশ অপরেব সহিত বিনিময় করিবে। বিনি কার্য সমবায়িক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইতে পারে আবার আ পাস করিয়া ইহাকে বাধ্যতামূলকও করা যাইতে পারে। জো সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। ১৯২১ স ক্যাল্‌ভার্ট (Calvert) পাঞ্জাবে জোতেব সংহতিসাধন বা একত্রিকরণেব প্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা করা হয় স্বেচ্ছাধীন পদ্ধতিতে সমবা মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে যে সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলি (co operative con lidation society) গঠন করা হইয়াছিল তাহারা কৃষকগণকে জোতের সংহতিসা প্রণোদিত করিতে থাকে। পাঞ্জাবের পর তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এ ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সংহতিসাধনের পথে অগ্রসর হয়।

সংহতিসাধন ও ইহার পদ্ধতি: ক। সমবায়িক, খ। বাধ্যতামূলক

পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশের সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলির কার্য হইতে দে গেল যে, সমবায়ের মাধ্যমে জোতের সংহতিসাধন অত্যন্ত দীর্ঘসূত্র পদ্ধতি। সুত ইহাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কিছু পরিমাণ বাধ্যতার প্রয়োজন। ইহা উপলব্ধি করি ১৯২৮ সালে প্রথমে মধ্যপ্রদেশে ও পরে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি জোতের সংহতিসাধনের আইন পাস করা হয় এবং কিছুদিন পরে সংযুক্তপ্রদেশ (বর্তমা উত্তরপ্রদেশ) ইহাদের অনুবর্তী হয়। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারও সম্প্রতি একটি অনুরূ আইন পাস করিয়াছে।

আইন পাসের ফলে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশে সংহতি সাধনের কিছু কিছু কার্য সম্ভব হইলেও সামগ্রিকভাবে ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সমব পদ্ধতির ন্যায় সম্পূর্ণভাবে না হইলেও ইহা বহুলাংশে সাধারণের অনুপ্রেরণার উপর নির্ভ শীল ছিল বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশে উপরি-উক্ত আইনগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবিশে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্বভাবতই একত্রিকরণকার্য অধিকদূর অগ্রসর হই পারে নাই। উপরন্তু, একদিকে যেমন সংহতিসাধনের পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থা অপরদিকে তেমনি আবার সময়ের সংগে সংগে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতাও স্বাভাবিকভা

চলিতে থাকে। সুতরাং সংহতিসাধনের প্রচেষ্টায় নীট ফল বিশেষ কিছুই থাকে না।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ফলে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা (preventive measures) প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং এইদিকে পথিকৃতের কার্য করে তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশ।

১৯৪৭ সালে বোম্বাই সরকার অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ এবং জোতের সংহতিসাধন আইন (Prevention and Consolidation of Holdings Act, 1947) পাস করে। এই আইন দ্বারা সরকারী উদ্যোগেই জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোম্বাই-এর অনুসরণে ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবও অনুরূপ আইন পাস করে; এবং ক্রমে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি উহাদের অনুবর্তী হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোতের সংহতিসাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজ্যসমূহকে এই কার্যে অধিকতর উদ্যোগের সহিত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সংহতিসাধনকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় সংহতিসাধন

খণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্য যে সকল রাজ্যে আইন পাস বা ধারা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের দ্বারা জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন প্রকার খণ্ডিকরণ বা হস্তান্তরিকরণ দ্বারা এই আয়তনকে হ্রাস করিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ আয়তন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে জোতের ন্যূনতম আয়তন হইল ৬'৫ একর, মধ্যপ্রদেশে ৫-১৫ একর, এবং দিল্লীতে ৮ একর।

জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্ধারণ

তবুও জোতের সংহতিসাধনের জন্য এবং খণ্ডিকরণ প্রতিরোধকল্পে আজ পর্যন্ত যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সমস্যার তুলনায় তাহা সামান্যই। পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার করিয়াছে।* উপরন্তু, জোতের সংহতিসাধন করা হইলেই কৃষিকার্যের পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন অধিকতর উদ্যোগ ও মূলধন নিয়োগ। যতদিন না কৃষক জমিকে নিজস্ব বলিয়া গণ্য করিবে ততদিন সে ইহাতে যত্নবান হইবে না। এতদিন পর্যন্ত কৃষক নিজেকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই। তাই সে জোতের সংহতিসাধন বা কৃষির পুনর্বাসন কোনটিতেই আগ্রহান্বিত হয় নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি-জমি সংক্রান্ত এই মৌলিক ত্রুটি দূর করিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাতে ভূমি-স্বত্বের সংস্কারের দ্বারা কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। নূতন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক হইতে পারিবে মাত্র। ইহা দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য—যথা, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন—

* Second Five Year Plan—১৯৯ পৃষ্ঠা।

সাধন করা সম্ভব হইবে না। তাই প্রয়োজন হইল জমিতে 'খণ্ডীকৃত মালিকানা', জোতের মালিকানা বজায় রাখিয়া কোন পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন কর যে-সকল পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহা হইল যৌথ খামার প্রথা (collecti farming), সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (co-operative farming) এবং সমব গ্রাম-ব্যবস্থা (co operative] village management)। ইহাদের সম্প আলোচনা ভূমিসংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠন অধ্যায়ে পরে করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the scope of extending the area of cultivation in India.

(৯৪-৯৫ পৃষ্ঠ

2. Give a brief account of the various methods of irrigation practised India. Indicate the points in favour and against each one of them,

(C. U. B. Com. 1955) (৯৭-৯৯ পৃ

3, Briefly describe the principal multi-purpose projects in India. Point o their influence on Indian agriculture and industries. (৯৯-১০৩ পৃ

4. Discuss the problem of declining fertility of the soil. Indicate the ste that have been taken to tackle the problem.

[**ইঙ্গিত:** মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় দুইভাবে হয়: (ক) সাধারণ কৃষিকার্যের পদ্ধতি এবং (খ) ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ের দ্বারা।...(১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা)]

5. One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endle subdivision and fragmentation of holdings. Discuss the statement and sugge remedies.

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর সম্বন্ধে ইংগিত: খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধ অবলম্বন করিতে হইবে: প্রথমত, সমবায় কৃষিকার্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পদ্ধতির মধ্যেমে ক্ষুদ্র কৃষি-জোত আর্থিক জোতে পরিণত করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, এই আর্থিক জোত যাহাতে আবার খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা এবং ১০৯-১১১ পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তর জন্য ১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা।]

6. Discuss the lines along which attempts have been made in differen parts of India to remedy the evils of subdivision and fragmentation. (১১৪-১১৬পৃষ্ঠা

7. Discuss the concept of an economic holding. Indicate the factors upo which the size of an economic holding depends. (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

কৃষি-শ্রমিক

(Agricultural Labour)

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ মোট কৃষিজীবিগণের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। কৃষি-শ্রমিক বলিতে কৃষকের নিকট রি বা মাহিনাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায়। ১৯৫০-৫১ সালের 'কৃষি-শ্রমিক সন্ধানের' (Agricultural Labour Enquiry) সংজ্ঞা অনুসারে, যে-ব্যক্তি রের অর্ধেক দিনের উপর অপরের নিকট মজুরিতে কাজ করে, সেই কৃষি-শ্রমিক য়ভুক্ত।* এই কৃষি-শ্রমিকগণকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়—সাময়িক মক (casual workers) এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক (attached workers)। সাময়িক মক হইল তাহারা যাহাদের কৃষির ক্ষেত্রে নিয়োগের কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। শ্লিষ্ট শ্রমিকরা অন্তত কিছু দিন ধরিয়া নিযুক্ত থাকে। বিগত আদমসুমারি অনুসারে ময়িক কৃষি-শ্রমিক মোট কৃষি-শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ মহীন কৃষক ছাড়াও কৃষি-জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক, বায়ত এবং গ্রাম্য কারিকরগণও ছে। নিজেদের জমি বা উপজীবিকা হইতে জীবনযাপনের ব্যয় সংকুলান হয় না বলিয়া ই সকল ব্যক্তি সাময়িকভাবে কৃষি-শ্রমিকের কার্য করিতে বাধ্য হয়।

-শ্রমিকদের কঠোর বনযাত্রাপ্রণালী : । বহুসংখ্যকের মহীনতা

১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারত সরকারের নির্দেশে কৃষি-শ্রমিকদের নিয়োগ, উপার্জন, জীবনযাত্রার ব্যয়, ঋণের অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় লইয়া তথ্যানুসন্ধানকার্য চলিতেছে। বহু তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। উপরি-উক্ত 'কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট' হইতে জানা যায় যে, ভারতের মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগের উপর হইল কৃষি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে ষি-জমিবিহীন।

এ পর্যন্ত বর্ণনা হইতে অবশ্য ভারতে কৃষি-শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রাপ্রণালী যে ত কঠোর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার অন্যান্য দিকের—যথা, মজুরির , মজুরি প্রদানের পদ্ধতি, নিয়োগের সময় প্রভৃতির পর্যালোচনা করিতে হইবে।

মজুরির অত্যল্প

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের মজুরির হার অত্যন্ত অল্প। অল্পক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাহার জীবনধারণোপযোগী মজুরি (living wage) দেওয়া হয়। উক্ত কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৬৮ টাকার তুলনায় কৃষি-শ্রমিকের াপিছু আয় ছিল ১০৪ টাকা মাত্র এবং কৃষি-শ্রমিক পরিবারের গড় আয় ছিল বৎসরে

---

* Second Five Year Plan—৩১২ পৃষ্ঠা।

মাত্র ৪৪৭ টাকা। মজুরিপ্রদানের পদ্ধতিও অত্যন্ত আপত্তিজনক। অনেকক্ষেত্রে শ্রমিককে নগদ মজুরি দেওয়া হয় না; অন্তত মজুরির একাংশ উৎপা শস্যে প্রদান করা হয়। অবশ্য, বর্তমানে নগদ মজুরি প্রদানে প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

৩। মজুরিপ্রদানের আপত্তিজনক পদ্ধতি

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের নিয়োগকাল সাময়িক। শস্যোৎপাদনের সময়ে তাহাদে বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হয়। অন্য সময় তাহাদের উপার্জনের আশায় হয় শিল্পাঞ্চলে গম করিতে, না-হয় গ্রামে থাকিয়া অতি নিম্ন মজুরিতে আরও সাময়িক ভাবে অন্যান্য কার্য করিতে হয়। আবার এ-দুইটির কোনটি সম্ভ না হইলে গ্রামে বসিয়া শস্যোৎপাদনের সময়ের উপার্জন দিয়া সা বৎসরের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়।

৪। সাময়িক নিয়োগকাল

হিসাব করা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যে কৃষি-শ্রমিকগণের গড় নিয়োগকাল বৎস ১৮৯ দিন মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ আবার বৎসরে ১০০ দিনেরও কম। শতক ১৬ ভাগ কৃষি-শ্রমিকের আবার বৎসরে কোন প্রকার নিয়োগই নাই।* সুতরাং অ বেকারত্ব ও বেকারত্ব ভারতের কৃষি-শ্রমিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের ভয়ংকর অবস্থার আরও পরিচায়ক হইল আর একটি বিষয়ে অস্তিত্ব, যাহাকে কৃষিগত ভূমিদাস প্রথা (agricultural serfdom) বলিয়া অভিহি করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া বোম্বা মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে এক একটি করিয়া কৃ শ্রমিকশ্রেণী আছে যাহারা সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়া সর্বনিম্ন স্থানাধিকার করে এ যাহারা ভূমির সহিত একরূপ দাসত্বসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির মালিক সাধারণত প্রয়োজ সময় তাহাদের এককালীন ঋণপ্রদান করিয়া একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া ল ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় তাহাদের নাই; ফলে প্রভুর আয়ত্তাধীনের বাহিরে যাইব কথাও তাহারা চিন্তা করিতে পারে না। প্রভুই তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া ও খাদ্য সরবরাহ করে। তাহাদের জন্য প্রভু যে-ব্যয় করে তাহার সহিত তাহা শ্রমের বাজার দামের কোনই সংগতি নাই। "কোনমতে জীবনধারণোপযোগী খা তাহাকে সরবরাহ করা হয় মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার অবস্থা হইল মধ্য যুগে ভূমিদাসের মত।"**

৫। ভূমিদাস প্রথা

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের অদক্ষতা তাহার কঠোর জীবনযাত্রার কারণ কিনা? ইহা লই এ-পর্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে, ভারতীয় কৃষক তাহা ইয়োরোপীয় বা মার্কিন প্রতিলিপির সমান দক্ষ না হইলেও দক্ষতা দিক দিয়া অভিযোগ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। ডাঃ ভোয়েলকা (Dr. Voelcker) বলেন, ভারতীয় কৃষক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী

কৃষি-শ্রমিকের দক্ষতা

---

* Second Five Year Plan—১১৫ পৃষ্ঠা।

** Wadia and Merchant—Our Economic Problem.

্যবসায়ী এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন। কিন্তু এ-সকলই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, গতানুগতিকতা : কুসংস্কারের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে কৃষকেব স্বাভাবিক দক্ষতা তাহাকে বনযাত্রাব পথে বিশেষ সহায়তা কবে না ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকেব ফলে লই অকার্যকব হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, ভাবতীয় কৃষি শ্রামককে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় বাখিয়া কৃষির সংস্কার-নেব চেষ্টা কবিলে তাহা যে ফলবতী হইতে পাবে না এ সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত। ১৯৫০ সালে কৃষি-সংস্কাব কমিটি (Agrarian Reforms Committee) সুস্পষ্ট ঘোষণা কবিয়াছিল যে, পূর্বেব মত কৃষি সংস্কাবেব যে-কোন পবিকল্পনায় কৃষি-শ্রমিককে দ দিয়া বাখিলে কৃষি-ব্যবস্থায় একটি পবিচর্যাহীন উন্মুক্ত ক্ষত বাখিয়া যাওয়া হইবে। বকল্পনা কমিশন বলিয়াছে, অব্যাহত নিয়োগেব অভাব এবং নানারূপ সামাজিক তিবন্ধক যাহাদেব বৈশিষ্ট্য এরূপ বহুসংখ্যক কৃষি শ্রমিকেব অস্তিত্বকে বর্তমান কৃষি-তিব অন্যতম প্রধান দুর্বলতা এমনকি অনিশ্চয়তাবও সূত্র বলিযা গণ্য কবিতে হইবে।* ুবা° প্রতিবিধান অবলম্বন কবা অপবিহার্য।

শ্মিকের অবস্থা নেব প্রযোজনীযতা

কারণ (Causes): প্রতিবিধানেব পর্যালোচনাব পূবে কৃষি-শ্রমিকদের বর্তমান বস্থাব কাবণানুসন্ধান কবা প্রযোজন। কৃষি-শ্রমিকদেব সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায বলা হইয়াছিল যে, গ্রাম্য শিল্পেব বিনাশেব ফলে বহু শিল্পী আংশিকভাবে কৃষি-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে ; জোতেব খণ্ডিকবণ এবং অসম্বদ্ধতার প্রসাব বহু কৃষককে সাময়িক শ্রেণিকে পবিণত কবিয়াছে, এবং বৃহৎ বৃহৎ খামারেব আয়তন হ্রাস সমস্যাকে তব কবিযা তুলিয়াছে।** ডাঃ বাধাকমল মুখোপাধ্যাযেব মতে, "গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থায় াবণ অধিকাবেব বিনাশ, যৌথ উদ্যোগেব অব্যবহাব, জোতের খণ্ডিকবণ এবং স্বদ্ধতা, বাধাবিহীনভাবে মর্টগেজ প্রথায় কৃষি জমি হস্তান্তবিতকবণ এবং কুটিব শিল্পেব নতিই" হইল ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকেব অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধিব কাবণ।

শমিকদের সংখ্যা-র কারণ

কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধিব ফলে মজুবিব হাব অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং তন ভূমিদাস প্রথা প্রবর্তিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। জোতের খণ্ডিকবণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য কৃষিকার্যে উৎপাদনেব পবিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহাব ফলে শ্রমিকেব মজুবি আবও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে গ্রাম্য ও কুটিব শিল্প হইতে কৃষকেব যে-আয হইত তাহাব পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপবদিকে শ্রমিকেব দক্ষতাবৃদ্ধিব পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা কবা হয় নাই, হাব অজ্ঞতা কুসংস্কাব দূব কবিবাব যোগ্য ব্যবস্থাও কবা হয় নাই।

িকদের সংখ্যা ই তাহাদের শার কারণ

কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম (Programme for melioration of the Condition of Agricultural Workers): বিগত দুই

* First Five Year Plan—২০৪ পৃষ্ঠা।
**

দশক ধরিয়া কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়া আসা হইলেও এই প্রচেষ্টা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পা হইতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কৃষি-শ্রমিকদের কল্যাণে জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছিল:

প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম

(ক) শ্রমিককে বাসগৃহে দখলিকার স্বত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং যেখানে যেখা সম্ভব সেইখানেই তাহাকে বাসগৃহের সহিত একটি ছোট তরিতরকারির ক্ষেতের জ প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(খ) ভূদানযজ্ঞের সমর্থন দ্বারা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ভূদানকে চিরন্তনভাবে গ্রামোন্নয়নের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ;

(গ) সর্বাধিক সংখ্যায় শ্রমিক-সমবায় সমিতি (labour co-operatives) গ করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ ও অনুর অন্যান্য কার্য সম্পাদিত করিতে হইবে ;

(ঘ) যেখানে সম্ভব সেইখানেই পুনরুদ্ধৃত পতিত ও নূতন আবাদীকৃত জমিকে এ সকল সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণ করা হইবে ; এবং সমিতি ইহাতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমি এবং অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে ;

(ঙ) গৃহনির্মাণ, এবং কৃষির সহিত সংগতিপূর্ণ শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকর ক্রয় ইত্যাদি বাবদ অর্থসাহায্য করিতে হইবে ;

(চ) শিক্ষামূলক বৃত্তির (educational stipends) মাধ্যমে বিশেষ সাহায্যে ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বৃত্তিমূলক (vocational) ও শিক্ষাসম্পর্কিত (technica শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(ছ) গ্রাম্য সম্প্রসারণ কর্মিগণকে (rural extension workers) কৃষি-শ্রমিকগণে কল্যাণের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলি বিশেষভাবে কৃষি শ্রমিকগণের কল্যাণের দায়িত্ব বহন করিবে ;

(জ) কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন (Minimum Weges Act, 1948) কার্যকর করিতে হইবে ;

(ঝ) অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহ একরূপ প্রথম পরিকল্পনারই অনুসরণ। এই কার্যক্রমের মধ্যে আছে শ্রমিক সমবা সমিতি (labour co-operatives) গঠন, কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাস ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্যকরকরণ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কৃষির উন্নততর সংগঠন, কুটির ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসার, অনুন্ন সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণ, কৃষি-জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতি কৃষি-শ্রমিককে নানাপ্রকার সুবিধা দান করিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্য ভূদান আন্দোলন ও শ্রমিক সমবায় সমিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ভূদানের মাধ্যমে যে-সকল জমি পাওয়া যাইবে তাহা প্রধানত কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্যই ব্যবহার করা হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠনে জাতীয় সম্প্রসারণ যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। তৃতীয়ত, যেখানে ন্যূনতম মজুরি এখনও নির্ধারিত হয় নাই সেখানে এই কার্য অবিলম্বেই সমাধা করিতে হইবে। পরিশেষে, সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনে মনোযোগ দিতে হইবে।

এখন উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনাতে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে

কয়েকটি পুনর্বাসন উপনিবেশ এবং ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষি-খামার (mechanised farm) স্থাপন করা হয়। ভূদান, কৃষি-জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রধানত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কার্যেই নিয়োগ করা হইতেছে। শ্রমিক-উপনিবেশসমূহে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চালু করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সমবায় (labour co-operatives) গঠন করা হইয়াছে। ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নকার্যের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি রাজ্যে কৃষি-শ্রমিকের বাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থা করিয়া আইনও পাস করা হইয়াছে। ন্যূনতম মজুরি-নির্ধারণ কার্যও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, উড়িষ্যা, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ ও ত্রিপুরা—এই কয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমগ্রে এবং আসাম, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি ৭টি রাজ্যের স্বল্প মজুরি অঞ্চলে (low wage areas) কৃষি-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হইয়াছে। বাকী রাজ্যগুলি এই কার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই শেষ করিবে কথা আছে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা সম্বন্ধে আর একবার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ইহা 'দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান' (Second Agricultural Labour Enquiry) নামে অভিহিত। এই অনুসন্ধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে আশা করা যায়।*

উপসংহার: কৃষি-শ্রমিকের অবস্থান্তর হইল দীর্ঘকাল উন্নয়নের প্রশ্ন। এই সমস্যা জটিলও বটে। সমস্যাটির বিশ্লেষণকালে ও সমাধানের প্রচেষ্টায় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—যথা, (১) গ্রামাঞ্চলে বেকারাবস্থা (unemployment) এবং অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং (২) প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই সমস্যাটি সাম্প্রতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং শুধু যে

* **India—1959.**

বর্তমান বেকারাবস্থার পরিমাণই কমাইতে হইবে তাহা নহে, বর্ধমান জনসংখ্যার দরুন ভবিষ্যতেও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। সমস্যার এই প্রকার সমাধান হইল দীর্ঘকালীন এবং সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন। সুতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকালের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the present condition of agricultural labourers in India. What measures would you recommend to improve their lot ? (১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the measures that have been adopted to improve the lot of the agricultural worker in India. (১২০-১২৩ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায়

কৃষিগত মূলধন

(Agricultural Finance)

সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Problem) : বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ হইতেই অধিকাংশ মূলধন সংগৃহীত হয়। কৃষিকার্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয় বলিয়া ভারতের কৃষিকার্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মালিকের নিজস্ব মূলধন হইতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ইহা কাম্য হইলেও সম্ভব হয় নাই। বরং ভারতীয় কৃষকের পক্ষে ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা উন্নত দেশসমূহের কৃষকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার কারণ হইল ভারতীয় কৃষির প্রকৃতি। ভারতে কৃষিকার্য মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। এখানে কৃষক খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করে। সাধারণ বৎসরেই জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের পর তাহার হাতে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিলেই চলে। ইহার পর যদি কোন কারণে অজন্মা ঘটে—জলসেচ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাবে যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—তবে কৃষকের পক্ষে ঋণের পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়াও সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন এবং ব্যাধি ইত্যাদির ন্যায় জীবনযাত্রার পথে আকস্মিক ব্যয়নির্বাহের জন্যও কৃষককে ঋণগ্রাহী হিসাবে অবতীর্ণ হইতে হয়—কারণ তাহার হস্তে সঞ্চিত অর্থ কিছুই থাকে না। এ-প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল যে ঋণগ্রাহী হিসাবে কৃষকের ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। তাহার জামিন দিবার কিছুই থাকে না; কৃষির অনিশ্চয়তার জন্য ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার মাত্রাও অত্যধিক। উপরন্তু, ঋণের পরিমাণ সামান্য বলিয়া ঋণগ্রহণের অপরিহার্য ব্যয়ের (overhead costs) পরিমাণ অত্যধিক হইতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কৃষিগত মূলধন সমস্যার প্রকৃতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে : (ক) ভারতীয় কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতা কৃষককে ঋণগত মূলধনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে; (খ) ভারতীয় কৃষক পুরাতন ঋণভারে প্রপীড়িত; (গ) ঋণ সরবরাহের সূত্রগুলি পর্যাপ্ত বা কৃষকের পক্ষে কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং ষগত মূলধনের এই তিনটি দুর্বলতাই দূর করিতে হইবে। প্রথমত, কৃষির সংগঠনগত বলতা দূর করিয়া কৃষকের আয়বৃদ্ধির একরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে ঋণগত মূলধনের পর তাহার নির্ভরশীলতার পরিমাণ যেন দিন দিন হ্রাস এবং তাহার ঋণগ্রহণযোগ্যতা :reditworthiness) যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, অনুৎপাদনশীল পুরাতন ণের পরিমাণকে এরূপভাবে কমাইতে হইবে যেন ইহা পরিশোধ করা কৃষকের ংগতিতে কুলায়। তৃতীয়ত, কাম্য পন্থায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি-ঋণ সরবরাহেরও পযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ঋগত মূলধন-স্যার প্রকৃতি শ্লেষণ

ইহার মধ্যে প্রথম করণীয় বা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন, যাহার আলোচনা কৃষিকার্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে করা হইতেছে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা অর্থাৎ কৃষি ঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt) ও কৃষিঋণ ব্যবস্থার স্যা (Problem of Agricultural Credit) এবং ইহাদের সমাধান সম্পর্কেই লোচনা করা হইবে।

পকার সমস্যা

কৃষি-ঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt) :

রতের কৃষকশ্রেণী পুরুষানুক্রমে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া আছে। বলা হয়, ভারতীয় কৃষক ঋণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, ঋণ লইয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াই মারা যায়। মহাজনের নিকট হইতে একবার ঋণ করিলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে ভব হয় না, সুদ দিতে দিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। অনেক সময় আবার সুদও মিটাইয়া দিতে পারে না। ফলে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। তারপর কদিন ঋণভার পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া ভারতীয় কৃষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

ষানুক্রমে ব্যক্তিগত ভার

কৃষি-ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি (Volume and Nature of Agricultural Debt) :

বিভিন্ন সময়ে ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিলে কৃষি গ্রামাঞ্চলের ঋণের (Rural Debt or Rural Indebtedness) বর্ধমান প্রকৃতিতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে গ্রামাঞ্চলের ঋণের পরিমাণ ছয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ইহা ৩০০ কোটি টাকা হইতে ১,৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

১১ ১৯৩৭ লের মধ্যে কৃষি ণর বৃদ্ধি

বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষি-ঋণের পরিমাণ কত তাহা হিসাব করা হয় নাই। ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি (All-India Rural Credit Survey Committee) মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপকার্য সমাধা করে। সুতরাং ইহার পক্ষে কৃষি-ঋণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভারতে মোট ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত কমিটি কিন্তু ভারতীয় কৃষকগণের মোট বাৎসরিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা (total annual requirement) সম্বন্ধে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা হইল ৭৫০ কোটি টাকা —অর্থাৎ সর্ব ভারতীয় গ্রাম্য জরিপ কমিটির হিসাব অনুসারে ভারতীয় কৃষকগণের পক্ষে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার মত ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়।*

বর্তমানে কৃষি ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন হিসাব নাই

সব ভারতীয় ভিত্তিতে বর্তমান গ্রাম্য ঋণের নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের সময়ে কৃষিজ দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকের অবস্থার উন্নতির দরুন কৃষি-ঋণের পরিমাণ কতকটা কমিয়াছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে সকল হিসাব করা হইয়াছে তাহা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৮ সালের বোম্বাই এর সারাইয়া কমিটি (Saraiya Committee) এবং মাদ্রাজে ডাঃ নাইডুর অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সারাইয়া কমিটি দেখিয়াছিল যে, বোম্বাই রাজ্যে বড় বড় কৃষকদের ঋণ ৫০ ভাগ কমিয়াছে। ডাঃ নাইডুর হিসাবে মাদ্রাজ প্রদেশে মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধির দরুন যুদ্ধোত্তর যুগে ঋণের পরিমাণহ্রাস

তবে অনেকে বলেন যে, কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বড় বড় কৃষকেরই ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ কমিয়াছে, সকলের নহে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ এবং কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ব্যয় মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিলে চলে। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল কি না ঘটিল তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না, বরং বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে তাহার পক্ষে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে ঋণ পরিশোধ করার কথা চিন্তা করা ত' দূরের কথা। সারাই কমিটি, ডাঃ নাইডু প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির দরুন মাত্র শতকরা ৬ ভাগ কৃষক লাভবান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি মতে, ছোট ছোট ক্ষেত্রে ঋণের মোট পরিমাণ বা অর্থভার (money burden) যুদ্ধের সময় বিশেষ বাড়ে নাই। অপরদিকে বরং ঋণের আসল ভার (real burden) বহুলাংশে কমিয়াছে।** এইজন্য উক্ত কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, ভারতীয় কৃষিজীবী তাহার ঋণ পূর্বাপেক্ষা সহজে বহন করিতে সমর্থ।

ঋণের আসল ভার হ্রাস

* All India Rural Credit Survey Committee—Report Vol II P 156

** All-India Rural Credit Survey—Report I. P 19.

ভারতের কৃষি-ঋণ সামান্য মাত্রায় ভিন্ন প্রকৃতির হইলে ইহার পরিমাণ লইয়া এত ন্যালোচনার প্রয়োজন মোটেই হইত না। প্রত্যেক দেশেই কৃষককে ঋণ করিতে হয়। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; আপাতদৃষ্টিতে ইহা কোন সমস্যাও নহে। কৃষিজীবিগণের সংখ্যার তুলনায় ভারতে কৃষি-ঋণের পরিমাণও অত্যধিক নহে। তবে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ সমান্তরালবিহীন বলা চলে। ভারতীয় কৃষক সকলসময় কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে না; দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং মামলা-মকদ্দমা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক কারণেও ঋণগ্রস্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এই সকল ঋণ পরিশোধের উপায় থাকে না। কোন উদ্বৃত্তও তাহার থাকে না বলিয়া ঋণভার ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে তাহার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে।

কৃষি ঋণের প্রকৃতি

ঋণগ্রস্ততার কারণ :(Causes of Indebtedness): ভারতে কৃষি-ঋণের প্রাথমিক কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। লোকের আয় অপেক্ষা ব্যয় যখন অধিক হয় তখনই সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটি ভারতীয় কৃষকের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষকের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের ঋণের বিপুলতার কারণ। ভারতে কৃষিকার্য অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের অব্যবস্থা, অন্যান্য উপজীবিকার অভাব প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিকে মুনাফাবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন, "যে-দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা মাত্র এবং যেখানে প্রতি চার অথবা পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর অজন্মা হইবেই সেখানে কৃষক, যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরে কোনমতে দিন গুজরান করে, অজন্মার বৎসরে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেই।"* অজন্মার বৎসরে যদি তাহার পক্ষে আবার বীজ বা চাষের বলদ ক্রয় করিবার অথবা বসবাসগৃহ মেরামত করিবার প্রয়োজন হয় তবে ঋণের পরিমাণ বিশেষ বর্ধিত আকার ধারণ করিবেই। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, ছোট ছোট কৃষকের ঋণের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হইল পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য।**

১। কৃষকের চরম দারিদ্র্য

এক দিক দিয়া কৃষকের দারিদ্র্য যেরূপ তাহার ঋণগ্রস্ততার কারণ অন্যদিক দিয়া তাহার ঋণগ্রস্ততাও আবার তাহার দারিদ্র্যের কারণ। পুরুষানুক্রমে যে-ঋণ কৃষকের স্কন্ধে চাপান আছে তাহা তাহাকে অনেকাংশে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃঋণের সুদ প্রদান করিবার জন্যই কৃষককে অনেক সময় ঋণ করিতে হয়; এবং একবার ঋণ করিলে অধিকাংশ সময় সারা জীবনেও ইহা পরিশোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত

২। পুরুষানুক্রমিক ঋণ

* Wadia and Merchant—Our Economic Problem, Ch. 12.

** All-India Rural Credit Survey Report I. P. 25.

কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালের ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫০০ কোটি টাক উপর ছিল পিতৃপুরুষের ঋণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ সম্পর্কে এ দুরতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষক দরিদ্র বলিয়াই সে ঋণগ্রস্ত, এবং ঋণগ্রস্ত বলি সে দরিদ্র।

৩। কৃষকের ব্যয়-বাহুল্য

তৃতীয়ত, ব্যয়বাহুল্যকেও কৃষিগত ঋণের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করিতে হই সাধারণত মামলা-মকদ্দমা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় কৃ অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমি দেখাইয়াছিল যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রেই কৃষক কৃষি-জমি উন্নয় জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ কমিটি ইহাও উল্লেখ করিয়াছিল যে কৃষি-ঋণ অনুৎপাদনশীল হওয়ার জন্য কৃষি-জমি মহাজনদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া ভূমিহী সর্বহারার (landless proletariat) সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। স্যর ম্যালকম ডালিং-এ সাম্প্রতিক রিপোর্টেও * সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কৃষক যে ঋণ করিয়াও অপব্যয় ক তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৪। ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার ও ইহার আদায়ের সময়

চতুর্থত, ভারতে ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার এবং ইহা আদায়ের সময় কৃষি-ঋণে আর একটি কারণ। ভূমি-রাজস্বের হার অধিক বলিয়া অনেক ক্ষে কৃষককে সুজন্মার বৎসরেও ঋণ করিয়া ইহা মিটাইতে হয় অজন্মার বৎসরেও তাহাকে ইহা হইতে রেহাই দেওয়া হয় না ইহার উপর আবার ফসল বাজারে বিক্রীত হইবার পূর্বেই ভূমি রাজস্ব আদায় করা হয়। ফলে কৃষককে মহাজনের নিকট ফসল বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্র করিতে হয়। ইহাতে সে তাহার ফসলের উচিত মূল্য পায় না; এবং স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

সম্প্রতি অবশ্য কর তদন্তকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে তবুও বলা যায়, ভূমি-রাজস্বের হার পুরুষানুক্রমিক ঋণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এ কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্বের হার কমাইবার নীতি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে।

৫। বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব

পঞ্চমত, বিভিন্ন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগিগণ কৃষকের ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্বের দরুনই বহুলাংশে কৃষিকার্য মুনাফাহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেকক্ষেত্রে জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, কৃষকের পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগিগণের দাবি মিটাইয়া তাহার নিজের পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। সুতরাং অনাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পক্ষে অবলম্বনীয় একটিমাত্র পন্থা ছিল ঋণ করিয়াও কৃষি-জমির পরিমাণ বাড়ান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইহাই করিত।

* **Certain Aspects of Co-operative Movement in India—1958.**

পরিশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কারণে কৃষকের ঋণের প্রয়োজনীয়তা যে-চক্রের সূচনা করিয়াছে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে ঋণদাতা হিসাবে গ্রাম্য মহাজন দ্বারা। গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদি না থাকিত তবে কৃষকের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধাও থাকিত না। কারণে অকারণে সে যখন-তখন ঋণ গ্রহণ করিয়া ইহার ভারে প্রপীড়িত হইত না; ফসল বন্ধক রাখিয়া বাজার অপেক্ষা অল্প দামে ইহা বিক্রয় করিতেও সে বাধ্য হইত না।

৮। গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা

পূর্বে গ্রাম্য মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করিত সামাজিক প্রথা। এইরূপ প্রথা ছিল যে মহাজন যে-টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করিত সুদসমেত কোনমতেই তাহার দ্বিগুণের অধিক আদায় করিতে পারিত না। কালক্রমে এই সকল প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়; গ্রাম্য সমাজের অনুশাসনও শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে মহাজনের পক্ষে নীতি-বিগর্হিত ব্যবহারের পথ ক্রমে সুগম হইয়া উঠে; হিসাবের সুকৌশল পরিবর্তনসাধন (manipulation of accounts) এবং অন্যান্য উপায়ে প্রবঞ্চনার পন্থাও সে ক্রমশ অবলম্বন করিতে থাকে। ইহার উপর অর্থশালী বলিয়া প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থায় তাহার পক্ষে প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য সকল অর্থ আদায় করিবার সুবিধা থাকায় গ্রাম্য মহাজন সুদখোর ও প্রবঞ্চকের ভূমিকায় দরিদ্র অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য কৃষককে শোষণ করিতে থাকে।

কৃষি-ঋণের কারণের উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন, "গ্রাম্য ঋণের কারণ হিসাবে অমিতব্যয়িতা ও কলহস্পৃহাকে নির্দেশ করিয়া হতভাগ্য কৃষককে অপরিণামদর্শী বলিয়া অকারণে অপরাধী করিলে সুস্পষ্ট অনুধাবনের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।" কৃষি-ঋণের প্রধান কারণ মুনাফাহীন কৃষিকর্ম। যে অসম্বদ্ধ জোতে কৃষক ঋণভার বহন করিয়া চলিতেছে তাহা হইতে মুনাফা লাভ করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়—এমনকি ইহা হইতে দৈনন্দিন অন্নসংস্থানও করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল থাকিলেও ইহাকে বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। "কিন্তু ভারতীয় কৃষককে যখন বিশ্বের বাজার দামের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হইয়াছে তখন তাহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মেনী প্রভৃতি দেশের কৃষকশ্রেণীর ন্যায় সংগঠন বা ঋণ-ব্যবস্থার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই।"*

উপসংহার—কৃষি-ঋণের দুইটি প্রধান কারণ

মুনাফাহীন কৃষিকর্ম

ঋণ-ব্যবস্থার বন্দোবস্তের অভাব

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষক আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের বাজারে কৃষিজ পণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাহার ভাগ্য বিজড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটের দাম সহসা যদি কমিয়া যায় তবে ইহা ভারতীয় কৃষককে আঘাত করিবে। কিন্তু আঘাত সহ্য করিবার জন্য, প্রতিযোগী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে সংগঠনগত

* Wadia and Merchant—Our Economic Problem. Ch. 12

শক্তির প্রয়োজন, যে সহজপ্রাপ্য ঋণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কৃষকের আয়ত্তা নহে। ফলে কোন কিছু ঘটিলেই তাহাকে মূর্তিমান অকল্যাণ গ্রাম্য মহাজনের দ্বা হইতে হয়। কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের সংগঠন বলিয়া একবার ঋণগ্রহণ করিলে ইহা হই কৃষকের আর পরিত্রাণ নাই। তাহার ঋণভার ক্রমশই বাড়িতে থাকে।

কৃষি-ঋণের প্রতিবিধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধান (Measure adopted to tackle the Problem of Rural Indebtedness): ভারতে কৃষি ঋণের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার প্রথম সচেতন হয় উনবিংশ শতাব্দী শেষের দিকে। ইহার ফলে ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী পরিত্রাণ আইন (Deccan Agriculturists Relief Act, 1879) পাস হয়

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

এই আইনের দ্বারা সুদের অত্যধিক হার হ্রাস করা হইয়াছিল এবং মহাজনদিগকে রীতিমা হিসাবপত্র রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। উপরন্তু, দায়াবদ্ধ না থাকিলে কৃষকের নিক হইতে জমির হস্তান্তরিকরণও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৮৩ সালে ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন (Land Improvement Loans Act, 1883) এবং ১৮৮৪ সালে কৃষিজীবী ঋণ আইন (Agriculturists Loans Act, 1884) প্রণীত হয়। প্রথমোক্ত আইনটির দ্বারা কৃষি-জমি উন্নয়নের জন্য কৃষিজীবিগণকে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবা এবং দ্বিতীয়োক্ত আইন দ্বারা চলতি খরচ মিটানর জন্য অল্পমেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা কর হইয়াছিল। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইল ১৯০১ সালে পাঞ্জাবের জমি হস্তান্তরি করণ আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901)। এই আইনের দ্বারা অ-কৃষিজীবিগণের নিকট কৃষি-জমি হস্তান্তরিকরণ এবং ২০ বৎসরের অধিক জমিকে দায়াবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবা আন্দোলনের প্রচেষ্টাই হইল গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে সমবায় আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ১৯০৪ সালে সরকার সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করে। ১৯১২ সালে এই আইনকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হয়।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (worldwide trade depression) ফলে ঋণগ্রস্ত হিসাবে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আইন দ্বারা ঋণের পরিমাণ কমান, ঋণসালিসির ব্যবস্থা করা, মহাজনদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি হইল অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

স্যর এডওয়ার্ড ম্যাক্‌ল্যাগ্যানকে (Sir Edward Maclagan) অনুসরণ করিয়া কৃষি-ঋণের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়: (ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ; (খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ; (গ) জমি হস্তান্তরিকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাসমূহ;

অবলম্বিত ব্যবস্থা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ

, ঋণ সরবরাহের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ; (ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের বস্থাসমূহ ; এবং (চ) কৃষককে সাহায্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

(ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures dopted to encourage the avoidance of unnecessary debts):

ক্ষার প্রসার, প্রচার াাদি

কৃষিজীবিগণ যাহাতে অনর্থক অনুৎপাদনশীল ঋণগ্রহণ করিয়া ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইল শিক্ষার সার। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়া অনেকাংশে হাদিগকে অনর্থক ঋণগ্রহণের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। ধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলি এদিকে কিছু কিছু কার্য রিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচারকার্যও চালান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য ভারতের ধিকাংশ অধিবাসীই এখনও এই শিক্ষাবিস্তার, প্রচারকার্য বা সমবায় সমিতির সংশ্রবে সে নাই। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে এই দিকে কিছু কিছু কার্য করা ইলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

(খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for the mprovement of civil law): কৃষি-ঋণ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির সংগে সংগেই রকার দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। পূর্বোল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের ষিজীবী পরিত্রাণ আইন দ্বারা ঋণ পরিশোধ না করিলে কারারুদ্ধ করিবার যে-ব্যবস্থা ল তাহা বিলুপ্ত করা হয়। ইহা ছাড়াও ঋণের পরিমাণ ও সুদের হার হ্রাস করিবার ং দায়াবদ্ধ না থাকিলে জমি হস্তান্তরিকরণ রহিত করিবার ক্ষমতা আদালতকে ওয়া হয়। ১৯১৮ সালের সুদখোরী আইন (Usurious Loans Act, 1918) রা কৃষিজীবী ও অ কৃষিজীবী উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার হ্রাস করা হয়। ১৯২৯ সালে দাবাজারের পর মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকাংশ প্রদেশই মহাজনী আইন স করে।

(গ) জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for restricting enation of land): কৃষিজীবিগণের নিকট হইতে কৃষি-জমি অ-কৃষিজীবিগণের নিকট স্তরের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে। ইহার পর ৩৮ সালে প্রণীত বিহার মহাজনী আইন (Bihar Money-lenders Act, 1938) তের একটি ন্যূনতন মাত্রা নির্ধারিত করিয়া দেয়, যাহা কোনমতেই ঋণ পরিশোধের কৃষকের নিকট হইতে হস্তান্তরিত করা যাইবে না। দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী পরিত্রাণ ইনের দ্বারা জমি হস্তান্তরিকরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার থ পূর্বেই করা হইয়াছে।

জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ায় জোতের আয়তনবৃদ্ধির সম্ভাবনা সংকুচিত হইয়া পড়ে। ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য ব্যাহত হইতে থাকে। উপরন্তু, এইরূপ

আইন সকল সময় কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজীবী মহাজনদের (agricultur money-lenders) নিকট জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে নাই

এই ব্যবস্থার কুফল

ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন হইতে থাকে কিন্তু কৃষিজী মহাজনগণের জোতের আয়তন দিন দিন বাড়িতে থাকে।

(ঘ) ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures undertake with the object of providing credit to agriculturists): জমি হস্তা নিষিদ্ধকরণ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সংগে সংগে কম সুদে ঋণ প্রদানে ব্যবস্থাও করা হয়। অল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রদে

তাকাভি ঋণ

তাকাভি ঋণ আইন (Taccavi Loans Act) পাস করা হ সাধারণত অজন্মার বৎসরে এবং কৃষিকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই প্রদান করা হইত। তাকাভি ঋণ জটিল অনুষ্ঠান সাপেক্ষ ছিল এবং প্রয়োজনের তুলনা অত্যল্প ছিল বলিয়া ইহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

তাকাভি ঋণ ছাড়া ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা কর হয়। কৃষকগণ ভূমি উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত না হওয়া

ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন

এই ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

সরকারী ঋণ যে কখনই পর্যাপ্ত হইতে পাবে না ইহা উপলব্ধি করিয়া সরকার বি শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সা প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আইন পাস করা হয়।

সমবায় আন্দোলন

সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠা করা হ কিন্তু সমবায় আন্দোলনও বিশেষ সার্থক না হওয়ায় গ্রাম্য মহাজনের উপর কৃষিজী নির্ভরশীলতা অনেকাংশে অব্যাহতই থাকে।

(ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for del conciliation and liquidation): উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই শতাব্দীর বি ব্যাপী মন্দাবাজার সংঘটিত হইবার পূবে অবলম্বিত হইয়াছিল। মন্দাবাজারের ফ দেখা গেল যে কৃষিজীবিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ইহার প্রতি কারার্থে অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বেই প্রয়োজন। ফলে কেন্দ্রী ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির (Central Banking Enqui Committee) সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে ঋণসালিসি ঋণভার হ্রাসের (liquidation) জন্য আইন পাস করা হ

ঋণসালিসি ও ঋণভার হ্রাসের আইন

কৃষকের ঋণভার হ্রাস করিবার জন্য আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুস হইলেও কয়েক স্থানে ইহা বাধ্যতামূলক করা হয়।

(চ) কৃষককে সাহায্য ও কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measur to help the agriculturists and to effect improvement in agri culture): কৃষির উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিই হইল কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার

ঁকার। বলা চলে, এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৪ সাল হইতেই প্রচেষ্টা করিয়া ‍াসিতেছে। ঐ সালে প্রথম কৃষি-বিভাগ (Department of Agriculture) ‍ীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারত যে খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয় ‍ার ফলে কৃষিগত উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর পরিকল্পিত -ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম পর্যায়ে কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব ‍রোপ করা হয়।

ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল (Effects of Debt Legislation) : ‍ভিন্ন প্রদেশের সাম্প্রতিক ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা কৃষি-ঋণের সমস্যাকে দুই ‍ দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমত, ঋণের পরিমাণকে সালিসির ‍্যমে বা বাধ্যতামূলকভাবে কমাইয়া ইহাকে কৃষিজীবীর পরিশোধের ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, মহাজনগণের অপপদ্ধতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঋণভারের বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। বলা যায়, উভয় দিক দিয়াই ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে।

‍সংক্রান্ত আইনগুলি ‍রূপ ব্যর্থ হইয়াছে

সালিসির মাধ্যমে ঋণভার হ্রাস করিবার যে-ব্যবস্থা তাহা সালিসি পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ‍র দ্বারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। অশিক্ষিত কৃষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‍সির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিশালী মহাজনগণ বার বার ‍ ও বে-আইনীভাবে সালিসিকে কার্যকর করিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ‍র পরিমাণ কমাইয়া দিলেও দারিদ্র্য হেতু তাহা পরিশোধ করিয়া উঠা অধিকাংশ ‍জীবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে চুক্তিভংগের অজুহাতে সালিসি ব্যর্থ হইয়াছে।

বাধ্যতামূলকভাবে ঋণভার হ্রাস এবং মহাজনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার সমস্যাকে (problem of rural indebtedness) কিছুটা সরল করিলেও ঋণ সরবরাহের সমস্যাকে (problem of supply of credit) আরও জটিল ও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। মহাজনগণ এখন আর তাহাদের বিশ্বস্ত খাতক ছাড়া কাহাকেও ঋণদান করিতে চাহে না। বিশ্বস্ত খাতকগণের ‍তেও তাহারা নানারূপ নূতন অপপদ্ধতি অবলম্বন করে—যথা, অল্প ঋণ দিয়া অধিক ‍র খত লিখাইয়া লয়, ঋণপ্রদানের সময়ই ঋণের টাকা হইতে সুদ কাটিয়া লয়, বিক্রয় ‍না লিখাইয়া লইয়া জমি বন্ধক হিসাবে রাখে, ইত্যাদি।

‍ক্রান্ত আইন ‍রবরাহের ‍কে জটিল ‍তুলিয়াছে

বলা হয়, ঋণ সংক্রান্ত আইন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের সূত্রকে সংকুচিত ‍য়া একদিক দিয়া ভালই করিয়াছে—কারণ ইহাতে অনুৎপাদনশীল ঋণের সম্ভাবনা বিশেষ মাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে কৃষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ঋণগ্রহণ ব্যাহত করিয়াছে তাহাও ‍রাখিতে হইবে। গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একজন লেখক

‍হার

এই উক্তি করিয়াছেন যে, "ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি মাত্র এ্যাম্বুলেন্সের কার্য করিয়াছে ইহারা আহত স্থানকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া প্রতিষেধকও প্রদান করিয়াছে যাহাতে ক্ষতের বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে; কিন্তু রোগের উৎসকে নির্মূল করিতে পারে নাই। বর্তমান গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থায় গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকাকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় গ্রাম্য মহাজন থাকিলেই তাহার সংগে তাহার অপপদ্ধতি থাকিবেই। সুতরাং প্রয়ো হইল নূতন করিয়া গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করিবার। আমাদের বর্ত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে। এবং এখন এই সম্পর্ আলোচনা করা হইবে।

কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit) মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে দুই প্রকার ঋণের প্রয়োজন হয়—(১) কৃষি পরিচালনা করিবার জন্য, এবং (২) মামলা-মকদ্দমা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করিবার জন্য। বীজরোপণ ইত্যাদির সময়ে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও কৃষিকর্ম পরিচা করিবার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ কৃষিকর্মের জন্য ঋণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কৃষিকর্মের ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ এবং অন্যান্য কারণে গৃহীত ঋ অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়।

প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণের প্রকৃতি

উৎপাদনশীল ঋণ আবার তিন প্রকারের হইতে পারে। অল্পমেয়াদী, মধ্যমে এবং দীর্ঘমেয়াদী। অল্পমেয়াদী ঋণ হইল কয়েক মাসের জন্য। সাধারণত শস্য বোপ সময় বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এবং সংসারযাত্রা ও অন্যান্য আনুষ ব্যয়নির্বাহের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া সেই বৎসরে পরিশোধ করাও হয়। মধ্যমেয়াদী ঋণ কূপ খনন এবং বলদ ইত্যাদি ক্রয়ের উ দুই হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রহণ করা হয়। স্বভাবতই ইহা ঐ সময়ের মধ্যে ধীরে পরিশোধ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সময় হইল দশ হইতে বিশ বৎ ইহা কৃষক পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, কৃষি-জমি ক্রয়ের জন্য অথবা জমির উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করে। ঐ দীর্ঘ সময়ে সে ধীরে ধীরে কিস্তিতে ঐ পরিশোধ করে।

কৃষিগত ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র (Different Agencies for Supply of Agricultural Credit): ভারতে কৃষিজীবী নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করে—যথা, পেশাদার মহাজন, কৃষিজীবী মহাজন, আত্মীয়-ব্যবসাদার, সরকার, সমবায় সমিতি প্রভৃতি। ইহার উপর অবশ্য জমিবন্ধকী ব্যাংকও কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (All-India Ru

...edit Survey Committee) রিপোর্ট অনুসারে উপরি-উক্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে ...লিখিত অনুপাতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ সংগৃহীত হয়ঃ

ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র	ঋণ সরবরাহের অনুপাত শতকরা ভাগ
১। পেশাদার মহাজনগণ	৪৪.৮
২। কৃষিজীবী মহাজনগণ	২৪.৯
৩। আত্মীয়-স্বজন	১৪.২
৪। ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ	৫.৫
৫। সরকার	৩.৩
৬। সমবায় সমিতিসমূহ	৩.১
৭। জমিদারগণ	১.৫
৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	০.৯
৯। অন্যান্য	১.৮
	১০০.০

...ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে এখনও প্রভুত্ব করিতেছে পেশাদার ও কৃষিজীবী মহাজনগণ; এখনও মোট গ্রামাঞ্চলের ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে।*

...নগণ এখনও ...ন-সূত্র

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্বে কৃষিঋণ-ব্যবস্থায় ...ম্য মহাজনের ভূমিকা সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ধারণা বর্তমান ছিল। মনে করা হইত, ...ভিন্ন রাজ্যে ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলে গ্রাম্য মহাজনগণ কার্যক্ষেত্র হইতে অনেকটা ...য়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অনুসন্ধানের ফলে দেখা ...ল যে, তাহাদের আধিপত্য এখনও একরূপ অব্যাহত রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের ঋণের যোগানে গ্রাম্য মহাজনের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনমতেই ...নীয় নহে। এ-সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান বা জরিপ কমিটি বলিয়াছে, "যদিও বা গ্রাম্য মহাজনগণ বিশেষভাবে অনুভূত অন্যতম অভাব পূরণ করে, তবুও তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদের যোগ্য বণ্টনের কোনরূপ সহায়ক নহে।" গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার এই ...ত্রর প্রধান ত্রুটি হইল যে, মহাজনগণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। উপরন্তু, অনেক ...ত্রে তাহারা আবার মহাজনীর সহিত কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ...ন তাহারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম্য অর্থ ও ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। এই ...র্কে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, তাহারা এই কাযে সমগ্র দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী

...জনের এই ভূমিকা ...নীয়

* All-India Rural Credit Survey—General Report (Vol. II)-এর ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা।

(Indigenous Bankers), নগরাঞ্চলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বা
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে পূর্ণ সহায়তা পাইয়া থাকে।

ব্যবসায়ীদের ভূমিকা

গ্রামাঞ্চলের ঋণ সরবরাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল ব্যবসায়িগণ ও তাহা প্রতিনিধিবর্গ। মহাজনশ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য এইখানে যে, মহাজনীই মহাজনদের প্রধান ব্যবসা এবং ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য গৌণ মাত্র; দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বেলায় ক্রয়বিক্রয়ই মুখ্য ব্যবসা এবং এই উদ্দে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দাদন দিতে হয় বলিয়া মহাজনী কারবার করিতে হয়। দ দিয়া ফসল অগ্রিম ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর তাহ নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক। এই দিক দিয়া তাহারা গ্রাম্য মহাজনগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সরকারের ভূমিকা

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্য যে-ভূমিকায় গ্রাম্য মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ভূমিকা সরকারের পক্ষেই গ্র সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকার বর্তমানে মোট প্রয়োজ ঋণের সামান্য এক অংশ—মাত্র শতকরা ৩·৩ ভাগ সরবরাহ ক থাকে। উপরন্তু অন্যান্য কারণেও সরকারী ঋণ বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিতে পারে ন কমিটির মতে, তাকাভি ঋণের (Taccavi Loans) ন্যায় সরকারী ঋণকে অকাম্যত অপর্যাপ্তির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। (ক) পরিমাণে ইহা অ-প বণ্টনে ইহা অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপযুক্ত; (খ) ঋণ প্রদান আদায়ের দিক হইতে ইহা অসুবিধাজনক এবং আনুষংগিক ও অন্য নানা প্র ব্যয়ভারাক্রান্ত; (গ) তদারকের দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ দক্ষতাবিহীন এবং সামগ্র দিক দিয়া অসম্পূর্ণ।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা

সমবায় সমিতিগুলির ঋণ সরবরাহের পরিমাণ হইল আরও অল্প। তাহারা ঋণের মাত্র শতকরা ৩·১ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই শতকরা ৩·১ ভাগ ঋণে অধিকাংশ বড় বড় কৃষিজীবীর হস্তগত হয় এবং সামান্য অংশমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের ভ জুটিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবিশ্বাস্য ভূমিকা অনুধাবনের পর একটিমাত্র অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে—এবং ইহা "অর্ধ শতাব্দী অভিযানের পর ভারতে সমবায় আন্দোল ব্যর্থতা।" ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ১৯০৪ সাল হইতে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Cr Societies Act, 1904) পাস হয় তখন হইতে ১৯৫৪ সাল* পর্যন্ত সমবায় আন্দ চালাইয়া সমবায় সমিতিগুলি হইতে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয় ঋণের মাত্র শতকরা ভাগ সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাকে আন্দোলনের ব্যর্থতা ছাড়া আর কি যাইবে ?

* গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (**Remedial Measures**): গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহাকেই এখন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার ভিত্তিতেই গ্রামাঞ্চলের ঋণ ব্যবস্থার নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিতে হইবে। কমিটি এই নূতন কাঠামো বা ব্যবস্থার নাম দিয়াছে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit)।

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনায় সমবায়কেই ভিত্তি করা হইয়াছে। কারণ, সরকারী ঋণ বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং মহাজনগণ দ্বারা সংগঠিত ব্যক্তিগত ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অকাম্য। সুতরাং প্রয়োজন হইল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগত ঋণ-ব্যবস্থার (System of Institutional Credit)।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি অনুমোদিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রতি স্তরে আছে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (State Partnership)।—অর্থাৎ রাজ্যসরকার-গুলিকে বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সমবায় ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া ঋণপ্রদানের সহিত শস্য বিক্রয়করণ ও বিক্রয়-যোগ্যকরণ (marketing and processing) ব্যবস্থা সংযুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে বৃহদায়তন প্রাথমিক সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য দেশের সবত্র পণ্য সংরক্ষণের (warehousing) ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে, সবস্তরে সমবায় কর্মীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পরিকল্পনার অংগ

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার আর একটি অংগ হিসাবে কমিটি রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সৃষ্টি করিতে বলে যাহার শাখা-প্রশাখা দেশের সর্বত্র থাকিবে এবং যাহার উপর পরোক্ষ অথচ সুস্পষ্টভাবে গ্রাম্য ঋণ ও কৃষিজপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং ইহার সহিত হায়দরাবাদ ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক প্রভৃতি রাজ্যসরকার সম্পর্কিত ব্যাংকগুলিকে (State associated) সংযুক্ত করিয়াই এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনের সুপারিশ করিয়াছিল।

রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য কমিটি রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে একটি 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] নামে একটি তহবিল গঠন করিতে নির্দেশ দেয়। এই তহবিল হইতেই রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যসরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য ঋণপ্রদান করিবে। ইহা ছাড়া কমিটি রাজ্যসরকার ব্যাংকসমূহকে মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদানের জন্য একটি

দুইটি তহবিল

'জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল' [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] সৃষ্টির সুপারিশ করে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ইত্যাদির বৎসরে স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করিবে।

জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল হইতে ঋণ লইয়া প্রত্যেক রাজ্যসরকার রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে একটি করিয়া সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। এইভাবে প্রণীত সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এবং কৃষিজপণ্য সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। উপরন্তু, কমিটির মতে, প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড

সুপারিশগুলির মূল্য নির্ধারণ (**Appraisal of the Recommendations**): গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি গতানুগতিক নহে। ইহার মূলে আছে পটভূমিকার পরিবর্তন। পূর্বে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়া কিছুই ছিল না। তাই বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে প্রতিবিধান অনুমোদন করা হইত। বর্তমানে ত' আর ইহা চলিতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুপারিশ সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া নগরাঞ্চলের শিল্পে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইত। বর্তমানে কিন্তু পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজনেই ঐ অঞ্চলের সঞ্চয়ের ব্যবহারের অনুমোদন করা হয়। এমনকি গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নগরাঞ্চল হইতে সঞ্চয় লইয়া গিয়াও গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছে।

সুপারিশগুলি গতানুগতিক নহে

যে পরিবর্তিত পটভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে—অর্থাৎ যে-বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি গ্রামাঞ্চলের ঋণের উপরি-উক্ত পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে তাহা হইল আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গৃহীত কৃষিজ উন্নয়নের জন্য গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme of agriculture)। ভারতের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নয়নের এই গতিশীল কার্যক্রম অপরিহার্য। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, এই গতিশীল কার্যক্রমকে সফল করিবার জন্য আবার অপরিহার্য হইল একটি গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থার (dynamic programme of agricultural credit)।

কৃষির উন্নয়নের গতিশীল কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন গতিশীল কৃষি-ঋণ ব্যবস্থা

এই ঋণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে, কারণ ইহাকে উত্তরোত্তর বর্ধমান কৃষি-[গে]ণের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে হইবে। ইহা অবশ্য গ্রাম্য মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিতে পারিবে না; তাহার প্রয়োজনও নাই। গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় মহাজনের ভূমিকা এখনও কিছুদিন বর্তমান থাকিবে। নব-পরিকল্পিত ঋণ-ব্যবস্থা গ্রাম্য মহাজনের [গ্রা]ম্য বিকল্প সূত্র হিসাবে বর্তমান থাকিয়া মহাজনগণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে; [ফ]লে সার্থক গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আশাই গ্রাম্য ঋণ জরিপ [ক]মিটি পোষণ করিয়াছিল এবং সেদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনও মানিয়া লইয়াছিল।

[ঋণ]-ব্যবস্থাকে গতিশীল [বল]া হইয়াছে কেন

কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট* প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা [আ]বশ্যকার যে ঋণ পরিকল্পনাকে ইতিমধ্যেই কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে।

[সু]পারিশগুলির [যৌ]ক্তিক সমালোচনা

কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Plan Implemented [S]o Far): গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির নির্দেশানুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের (State Bank of India) প্রতিষ্ঠা করা হয়। [রা]ষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত বিভিন্ন রাজ্যসরকার সম্পর্কিত ব্যাংক (State-associated [B]anks)—যথা, হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক প্রভৃতিও [স]ংযুক্ত করিবার সুপারিশ কমিটি করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত এই [স]ংযুক্তিকরণ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল হইতে উহাদিগকে [রা]ষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiaries of the State Bank) পরিণত করা [হ]য়। ফলে উহাদের মালিকানার অর্ধেকের বেশী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের হস্তগত হইলেও [উ]হাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় আছে।

[রা]ষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের [অ]ভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, ৪০০টি শাখা স্থাপন করিবার ভার ন্যস্ত আছে। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৩১১টি শাখা স্থাপন করিয়াছে; বাকী ১০০টি শাখা উহা ১৯৬০ সালের মধ্যে স্থাপন করিবে। দ্বিতীয়ত, ইহা স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের অধিকতর সুবিধা [(R]emittance facilities) প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা [ক]রিবে। পরে শস্যভাণ্ডার ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক [ই]হার বিস্তৃততর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম্য ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধির প্রধানতম সূত্র হইবে।

[ন]বগঠিত রাষ্ট্রীয় [ব্যা]ংকের কার্যক্রম

* "Certain Aspects of Co-operative Movement in India."

—Malcolm Darling, 1958.

দাঁড়াইবে। এই শাখাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার সাধন করিবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অন্যান্য সুপারিশকেও কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমবায় সমিতির মালিকানায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্ট করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে ইহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটি টাকা হইবে। এই তহবিল হইতে রাজ্যসরকারগুলিকে বৎসরে গড়ে ৬ কোটি টাকার মত ঋণ দেওয়া হইতেছে।

২। জাতীয় কৃষি-ঋণ তহবিল

কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল

তৃতীয়ত, ঐ সালেই ১ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সাল অবধি এই তহবিলের মূলধন ৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এ পর্যন্ত এই তহবিল হইতে ঋণপ্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে 'কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করপোরেশন আইন' [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act 1956] পাস করা হয়। এই আইনের বলে ১৯৫৬ সালের অগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) এবং ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (Central Warehousing Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়। করপোরেশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে ১০০-এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা (warehouses) স্থাপন করিবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন' প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য প্রদান করিবে। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যেই সকল রাজ্যেই পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনগুলির পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ২৫০এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা স্থাপন করিবার কথা আছে। পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজ পণ্যের বাজারিকরণ, আমদানি-রপ্তানি উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রভৃতি হইল পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনের কার্য।

৪। কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন বোর্ড ও পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্যও বহুদূর অগ্রসর হয়। সমবায় কর্মীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, ১০ হাজারের উপর বৃহদায়তন সমিতি এবং ১,৮০০-এর মত পণ্য বিক্রয়করণ সমিতি গঠন, মোট ২২৫ কোটি টাকা ঋণপ্রদান ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সম্প্রসারণের

৫। সমবায়ের পুনর্গঠন

কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর উল্লিখিত রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ইহার গতিতে বাধা পড়িয়াছে। স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় সমিতিগুলিকে বৃহদায়তনে সংগঠিত করিবার সুপারিশ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা-সাপেক্ষ। সমবায় আন্দোলনের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক বর্তমানে যতটা ঘনিষ্ঠ ততটা হওয়া উচিত নয় বলিয়াও স্যার ম্যালকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক গতি

স্যর ম্যালকমের এই অভিমতের ফলে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার রূপদান কিছুটা মন্থরগতি হইয়াছে। এখন লক্ষ্য পড়িয়াছে ক্ষুদ্রায়তন সেবা সমবায় সমিতি (service co-operatives) গঠনের প্রতি। এ সম্পর্কে সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and extent of Agricultural Indebtedness in India and review the measure that have been adopted to tackle the problem.

(১২৩-১২৫ এবং ১২৮-১৩২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the causes of Agricultural Indebtedness in India. Review the measures that have been adopted to tackle the problem.

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের ইংগিত: ভারতে কৃষকের ঋণগ্রস্ততার কারণ হিসাবে ছয়টি বিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করা যায়—যথা, (১) কৃষকের আয়ের স্বল্পতা, (২) পুরুষানুক্রমিক ঋণ (৩) মামলা-মকদ্দমা, (৪) ভূমিরাজস্বের হার ও আদায়ের সময়, (৫) মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্ব, এবং (৬) গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্টকে অনুসরণ করিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় যে, কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রধান কারণ হইল মাত্র দুইটি: মুনাফাহীন কৃষিকর্ম এবং ঋণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব। (১২৫-১৩২ পৃষ্ঠা)]

3. What are the main sources of supply of Agricultural Credit ? Indicate the defects of each of them. (C. U. B.A. 1955) (১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Give your own evaluation of the scheme of Integrated structure of rural credit recommended by the All-India Rural Credit Survey Committee.

(C. U. B. Com. 1959) (১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃষিগত সংগঠন

(Organisation of Agriculture)

ভারতের কৃষিগত সংগঠনের ত্রুটি প্রধানত দুই প্রকারের—(ক) কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি, এবং (খ) কৃষিকার্যে অবলম্বিত পদ্ধতির ত্রুটি। প্রথমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা (Marketing of Agricultural Produce) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষক জাতীয় এবং বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় কৃষককে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ-ব্যবস্থা (system of credit), যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত বহির্জগতের বাজারের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি বিশেষ কিছুই করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে সে ঋণগ্রস্ত হইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে।* সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে অন্যতম প্রাথমিক করণীয় কার্য হইল কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা।

এখন কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় এবং ভারতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি, সে-সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়

ভারতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা নানা অংশে বিভক্ত। প্রথম হইল সামান্য সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য কৃষকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এক বা একাধিক স্থানে জমায়েৎ করা (assembling) তাহার পর আছে পণ্যের গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাকে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা (grading)। নমুনা পাঠান (sampling), বাজারে প্রেরণ করা, মূল্য বৃদ্ধির আশায় শস্য মজুত রাখা প্রভৃতি হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়।†

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the System of Agricultural Marketing) : সাধারণভাবে বলা যায়, অন্যান্য দেশেও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে

১। বিক্রয়-ব্যবস্থা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হস্তেই ন্যস্ত

এই সকল কার্য কৃষকেরা নহে—মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরাই সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ ভারতে কৃষিকার্য অতি ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের পক্ষে সামান্য উৎপন্ন লইয়া বাহিরের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন

---

* ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† First Five Year Plan—২৪২ পৃষ্ঠা।

:ক্ষতে উৎপন্ন একই ফসলে এরূপ গুণগত তারতম্য দৃষ্ট হয় যে তাহাকে পর্যায়ভুক্ত না করিয়া বাহিরের বাজারে লইয়া গেলে উচিত মূল্য কোনদিনই পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের দুরবস্থার জন্য ফসল বাহিরের বাজারে লইয়া যাওয়াও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। চতুর্থত, কৃষকের দারিদ্র্যও তাহাকে মহাজন ও ব্যাপারীদের নিকট দায়বদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া সে তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে কৃষিজ পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন প্রভৃতি 'বিশেষজ্ঞদের' হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অধিক ও ইহাদের প্রভাব এত ব্যাপক যে, ইহারা অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য-ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের অর্ধাংশের উপর গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার উপরও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটি আছে—যথা, উপযুক্ত সংখ্যায় সুসংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাব, বাজারে ওজন ও পরিমাণের তারতম্যজনিত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অপপদ্ধতির প্রচলন, বাজার দর সম্বন্ধে কৃষকের অজ্ঞতা, গুদামঘরের অভাব ইত্যাদি।

হার কারণ

। অন্যান্য ত্রুটি

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কৃষক গ্রামে ফড়িয়া, ব্যাপারী ও আড়তদারের নিকট অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়; সামান্য পণ্য লইয়া সে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাইতে পারে না। ইহার উপর আবার পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কৃষকের নিকট হইতে চুংগি (octroi) আদায় করে বলিয়া সে সহরের বাজারে পণ্য লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও চাহে না।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের কুফল

কৃষক তাহার পণ্য গ্রামে বিক্রয় করুক বা সহরের অনিয়ন্ত্রিত বাজারে লইয়া গিয়াই বিক্রয় করুক ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার ও মহাজনগণের অপপদ্ধতির হাত হইতে সে সচরাচর রেহাই পায় না। গুণগত তারতম্যের দোহাই দিয়া অনেক সময় তাহাকে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করা হয়, নানা অজুহাতে তাহার নিকট হইতে ফাউ আদায় করা বা দাম কাটিয়া লওয়া হয়, অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া প্রকৃত বাজার-দাম তাহাকে জানান হয় না। ইহার উপর আবার বাজারে প্রচলিত ওজন ও পরিমাণের বিশেষ তারতম্যও দৃষ্ট হয়। অধিক ওজনের পাল্লার দ্বারা ক্রয় করা ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণের পক্ষে যেন একটা রীতি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজন ও পাল্লা থাকে বলিয়া ব্যাপারীদের পক্ষে অজ্ঞ সরল কৃষকগণকে প্রবঞ্চিত করা সহজসাধ্য হয়।

বাজারে প্রচলিত নানা অপপদ্ধতি

সময়গত উপযোগ (time utility) সৃষ্টি করিয়া কৃষক যে পণ্যের অধিক মূল্য আদায় করিবে তাহার অন্তরায় হইল শস্য মজুত রাখিবার মত স্থানের অভাব। ফলে সে মহাজন বা আড়তদারের নিকট দায়বদ্ধ না থাকিলেও শস্যকর্তনের অব্যবহিত পরেই, যখন কৃষিজ পণ্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা কম থাকে, তখনই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

শস্যসঞ্চয়ে অসুবিধা ও অক্ষমতা

অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ (Remedial Measures) : কৃষিজ পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারকে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণ সমস্যার প্রধান প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণ সমস্যার সমাধানকল্পে দুইটি প্রধান প্রতিবিধান নির্দেশ করা যাইতে পারে—(ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের (regulated markets) প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির (co-operative marketing societies) প্রসার। এই দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অধিকাংশ ত্রুটি দূর করা যায়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অপচয় নিবারণ ও বিক্রয়করণ-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (warehousing) স্থাপন, পথঘাটের উন্নতিসাধন, গ্রেড বা নির্ধারিত মান চালু করা প্রভৃতি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দুইটি প্রধান প্রতিবিধান

অন্যান্য ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রকাশ্যভাবে নিলামের মাধ্যমে অথবা সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা হয়, এবং এক একটি কমিটির হস্তে এই সকল বাজারের পরিচালনার ভার থাকে। বাজারে ওজন, পরিমাণ, দর, বাজারের দরুন প্রাপ্য (market charges) প্রভৃতিও নির্দিষ্ট থাকে। পরিচালকমণ্ডলীতে বিক্রেতাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষককে ঠকান ক্রেতাদের পক্ষে বড় একটা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার সমবায় সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া বাজারকে অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এর কিয়দংশ এইভাবে সমবায় সমিতিগুলির হস্তে তুলার বাজার পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

১। নিয়ন্ত্রিত বাজার

সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ

সমবায় বিক্রয় সমিতিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিযোগী হিসাবে নয়—পরিপূরক হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির অভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার সফল হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যাপারীদের অপপদ্ধতি দূর করা হয়, কিন্তু কৃষকের পক্ষে যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পণ্য লইয়া আসা সম্ভবই না হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সার্থকতা কোথায়? ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণ এবং কৃষককে প্রয়োজনমত ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি কার্যের সম্যক সম্পাদন যে একমাত্র সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির দ্বারাই সম্ভব, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতিগুলি নামমাত্র কমিশন লইয়া পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, সভ্যগণের পক্ষে যৌথ দরাদরির (collective bargaining) ভার লয়, ঋণের মাধ্যমে দাদন প্রদান করিয়া কৃষককে মহাজন, ব্যাপারী ও আড়তদারদের কবল হইতে রক্ষা করে, ইত্যাদি। ইহার উপর সুসংগঠিত হইলে সমবায় সমিতি শস্যভাণ্ডার স্থাপন করিয়া শস্য

২। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি

দামজাত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, সুলভ যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারে, ৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনের জন্য সভ্যগণকে উৎসাহিতও করিতে পারে। এইভাবে মধ্যবর্তী বসায়িগণের হস্ত হইতে কৃষককে রক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সময়ে পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত রিয়া, পণ্যের গুণগত উন্নয়নে সহায়তা করিয়া সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি সর্বতোভাবে ষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিতে পারে।

শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ সকল সময় সমবায় সমিতির সংগতিতে লায় না বলিয়া সরকারের পক্ষেও এইদিকে সচেষ্ট হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

সরকারী সাহায্যে সংখ্যক গুদামঘর র্মাণ করা

১৯৫৪ সালের গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় গুদামঘর নির্মাণ কৃষিগত ঋণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কমিটির মতে, এই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন তহবিলের (National Warehousing Development und) সৃষ্টি এবং একটি সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (All-India Warehousing Corporation) স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী * (State Warehousing ompany) থাকিবে। উপরি উক্ত জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ তহবিল হইতে সাহায্য াপ্ত হইয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান শস্য গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট াকিবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনগুলিকেও ই উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন হইল আর একটি প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। হু কমিটি ও কমিশনের মত গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটিও ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

। গ্রামাঞ্চলের পথ-টের উন্নয়ন করা

করিয়াছে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতিতে পথঘাটের সাধারণ উন্নয়ন ছাড়াও জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই িষয় সম্পর্কে অধিকতর যত্নবান হইতে হইবে।

ইহার পর আছে গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত স্তর বা মান (grading)

নির্ধারিত স্তর বা ান চালু করা

চালু করা এবং বিশেষ করিয়া রপ্তানি দ্রব্যসমূহের বেলায় নমুনা পাঠানর বন্দোবস্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন পশম, লোমশচর্ম, লাক্ষা, মেষ ও ছাগচর্ম, বনস্পতি তৈলবীজ, কয়েক প্রকারের যোজনীয় তৈল, কাজু বাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মান নির্ধারণ ও প্রচলন বার জন্য সুপারিশ করিয়াছে। অনেকের মতে, মান নির্ধারণ করিবার ভার সমবায়

সম্পর্কে পরিকল্পনা মিশনের সুপারিশ

বিক্রয় সমিতির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে যাহাতে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, স দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

* কোথাও কোথাও—যেমন, পশ্চিমবংগে ইহাকে 'রাজ্য পণ্যসংরক্ষণ করপোরেশন'ও বলা হয়।

কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তাও বি... অধিক। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ১৯৩৯ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সা... আইন পাস করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের আইন দ্বারা মেট্রি... ব্যবস্থায় ওজন ও মাপ (metric weights and measure... চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যাহাতে প্রসারিত হয় তাহার দি... বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা

পরিশেষে আছে গবেষণা। পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়া... যে, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অর্থগত, সংগঠনগত এবং পরিচালনাগত সকল সমস্যা... বিরতিবিহীন গবেষণার দাবি করে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে... পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন... এই কমিটি রাজ্যসরকার এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থার পরি... কল্পনাসমূহ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে এবং বিশেষ সময়ান্তরে সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থা... গুণাগুণের পর্যালোচনা করিবে।*

৭। গবেষণা

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures Adopted): কৃষিজ পণ্য... বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে যে-সকল প্রতিবিধান এ-পর্যন্ত অবলম্বন কর... হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃ... কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার (Directorate of Marketing and Inspection) সৃষ্টিকে সর্বপ্রথম বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কৃষিজ... পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তথ্যানুসন্ধান করিয়া রিপো... প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন উপায়ে বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা... করা ইহার কার্য। সংস্থা এ-পর্যন্ত প্রায় ১০০টি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা:

১। গবেষণা

কেন্দ্রীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণে বিভিন্ন রাজ্যও এইরূপ সংগঠন স্থাপন করিয়াছে। সুতরা... দেখা যাইতেছে যে গবেষণার কার্য রীতিমত সুরু হইয়াছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান হইল কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট স্তর বা মান নির্ধারণ... প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করা; এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কৃষিজ পণ্য (নির্দিষ্ট মান এ... বিক্রয়) আইন [Agricultural Produce (Grading and Marketing Act, 1937] পাস করা হয়। এই আইনের ফলে কেন্দ্রী... কৃষিজপণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থা ১৯৫৯ সালের জুন মা... পর্যন্ত ১১৭টি পণ্যের মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আইনে 'আ... মার্কা' (Ag Mark) শব্দটি গুণ ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আগ মার্কা' কৃষিজ পণ্য গুণ ও বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট মানের বলিয়া বিবেচিত হয় এ... বাজারে ইহাদের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য 'আগ মার্কা... পণ্যের মধ্যে ঘৃত, বনস্পতি তৈল, মাখন, চাউল, আটা, তুলা, গুড় এবং ফল এই কয়টি

২। কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ

* AICC Economic Review—June, 1959.

শ্যভাবে উল্লেখযোগ্য। রপ্তানির জন্য তামাক চন্দনকাষ্ঠ পশম চর্ম প্রভৃতিতে গ মার্কা' দেওয়া হয়। এইভাবে কৃষিজ পণ্যের মান-নির্ধারণ কার্য কতকটা সুরু াছে বলা যায়।

নিয়ন্ত্রিত বাজার ষ্ঠা

নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার পথে কিন্তু বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ অবধি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, প্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল, মহীশূর ও উড়িষ্যা—এই ৮টি রাজ্যে এবং দিল্লী ও ত্রিপুরা এই টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় অন্যান্য রাজ্যও এই দেশ্যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছে দেখা যায়। ভারতের মোট ১,৮০০টি প্রাথমিক কারী বাজারের মধ্যে ৫৪৯টিকে ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। প্রথম কল্পনার সূত্রপাতে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৫টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ের া আরও ৪৫০টি বাজার নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ পরিদর্শন সংস্থার অধীনে একটি উপদেষ্টা শাখা (an Advisory Wing) গঠন করা াছে এবং এইরূপ বাজারের সম্পাদকদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যার স্বল্পতাজনিত ত্রুটি দূর করিবার একটি চেষ্টা করা হইতেছে তারের মাধ্যমে প্রচারকার্যের দ্বারা। ভারতীয় বেতার বিভাগ হইতে নিয়মিতভাবে

বেতারের মাধ্যমে বকার

কৃষিজ পণ্যের দাম, মজুতের অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলাভিমুখে পণ্যের গতি সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়। ইহার ফলে অনিয়ন্ত্রিত বাজার-সমূহও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনেও সরকার ইতিমধ্যেই কিছু কার্য সম্পাদন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম-

সমবায় সমিতির মে বিক্রয়-ব্যবস্থার ঠন

জাতকরণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) ৭ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই অর্থ সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি গড়িয়া তুলিবার জন্য রাজ্য সরকারসমূহের হস্তে প্রদান করা হয়। এইরূপ িতি প্রধানত শস্য বিক্রয়যোগ্যকরণ কার্যেই (processing activities) নিযুক্ত ক। ইহার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী সহায়তায় সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি য়া উঠিতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে ৫৫৪টি সমবায় াত এই বিক্রয়যোগ্যকরণ কার্যে নিযুক্ত আছে।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

* **Statistical Statements Relating the Co-operative Movement in India, 58 (Published in June, 1959)**

শেষে মোট বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের এক-দশমাংশ সমবায় বিক্রয়-সমিতির মাধ্য বিক্রীত হইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হ প্রধানত 'সেবা সমবায় সমিতির' (service co-operatives) মাধ্যমে। কং দলের নাগপুর প্রস্তাব (১৯৫৯ সাল) অনুসারে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে 'সেবা সম সমিতি' সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে।

১৯৫২ সালে আগাম বাজার (নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Forward Mark (Regulation) Act, 1952] পাস এবং তৎপরবর্তী বৎসরে আগাম বাজার কমি (Forward Markets Commission) প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্প কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করা হইয়াছে। কমিশন কৃষিজ পণ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও আগাম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম ঘ দূরিকরণের প্রচেষ্টা করে।

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূরিকরণার্থে অন্যান্য যে সকল উল্লেখযোগ্য প্রতিবি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্ধারিত ওজন ও মাপ কার্যকর করি প্রচেষ্টা, গুদামঘর নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও কৃষিজ প বিক্রয় ব্যাপারে শিক্ষার প্রসার প্রভৃতিই হইল বিশেষভাবে উল্ল যোগ্য। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৫৬ সা 'নির্ধারিত ওজন ও মাপ আইন' (Standard Weights and Measures Ac 1956) দ্বারা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারে মেট্রিক প ওজন ও মাপ চালু করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশের সর্ একমাত্র মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হইবে এইরূপ লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। পণ্য সংরক্ষ জন্য গুদামঘর নির্মাণের ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা পূর্ব অধ্যায়েই করা হইয়াছে।*

৬। অন্যান্য অবলম্বিত প্রতিবিধান

এ-পর্যন্ত আলোচনার পর ইহা আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, আমা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের কার্যক্রম উপরি উ প্রতিবিধানসমূহ লইয়াই রচিত। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা, নি মান চালু করা, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমন্বয়ে যে কার্যক্রম প্র পরিকল্পনায় প্রণয়ন করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাহাকেই অনুসরণ করা হইতেছে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঋণ-ব্যবস্থা ও বিক্র ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত হিসাবে দেখিতে হইবে এবং উভয় ব্যবস্থারই উন্নয়ন প্রচেষ্টা করিতে হইবে মূলত সমবায়ের ভিত্তিতে। এই উদ্দেশ্যে ১,৮০০-র মত সমব বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৬ হাজারের কাছাকাছি ছোটবড় গুদামঘর ছাড়াও অ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কার্যক্রম

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

।যিক চিনির কল এবং ১৬৬টি বিক্রয় যোগ্যকরণ সমিতি (processing societies) ষ্ঠার কথা ছিল। তবে বর্তমানে 'সেবা সমবায় সমিতি' (service co-operatives) নের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই সেবা সমবায় সমিতিগুলির প্রকৃতি কটা বহু উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) সমিতির ন্যায়; ইহারা কৃষককে বহুভাবে া' করিতে চায়।

ষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতি (Existing Method of Agriculture) ঃ

কার্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। ভারতে কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে। জল-সেচ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের রে। ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনকেও কৃষিকার্যের পদ্ধতির একটি দিক হিসাবে গণ্য করা তে পারে। তবে এ-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে -পদ্ধতির অন্যান্য দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

চাষের বর্তমান ৬ব ত্রুটিসমূহের প্রসার

এই অন্যান্য দিকের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল কৃষিকার্যে পশুশক্তির বিশেষ কা। পশুশক্তি ব্যতিরেকে সাধারণ কৃষক কৃষিকার্য পরিচালনার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। হলকর্ষণ, সেচের জন্য জল উত্তোলন, উৎপন্ন শস্যের পরিবহন প্রভৃতি সকল কার্যই পশুশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণত পশুশক্তি বলিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত গো-মহিষাদিকেই বুঝায়। গো-মহিষাদি আবার কৃষি-জমিতে সাধারণ ব্যবহার্য সারও বাহ করিয়া থাকে। এইজন্য এই উক্তি করা হইয়াছে যে, ভারতে গো-জাতি ার স্কন্ধে সমগ্র কৃষিকার্যের ভার বহন করিয়া আছে।

কৃষিকার্যে পশু-র বিশেষ ভূমিকা ৬ব অন্যতম ত্রুটি

কিন্তু ভারতের গো-মহিষাদি উৎকৃষ্ট জাতের নয়। একেবারে অকর্মণ্য গো-মহিষও তে বহু আছে; কৃষককে ইহাদের জন্য চারণজমি ছাড়িয়া দিতে হয় এবং খাদ্যের প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে সক্ষম গো-মহিষাদির খাদ্যে ঘাটতি পড়ে। সুতরাং ত্রুটির প্রতিবিধান বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের র্টে বলা হইয়াছে যে এই ত্রুটির প্রতিবিধান ব্যতীত কৃষির পুনর্গঠন কোনমতেই সম্ভব *

কৃষিকার্যের পদ্ধতির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতে কৃষি-জমির সম্যক ব্যবহার করা যায় না। এখানে বৎসরের কয়েক মাস কৃষি-জমি অকর্ষিত রাখা যেন একটা রীতি। উন্নত দেশসমূহে কৃষি-জমি কোন সময়ে অকর্ষিত রাখা হয় না। এই সকল দেশে কাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালটি শস্য উৎপাদনের (rotation of

কৃষি জমির ব্যবহারে ত্রুটি

* Report on India's Food Crisis and Steps to meet it.

crops) ব্যবস্থা করিয়া কৃষি-জমির পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ইহা সম্ভব না হইলে প খাদ্য (fodder crops) উৎপাদন করিয়া জমিকে কাজে লাগান হয়।

বীজ, সার এবং কৃষি-জমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ভারতে বিশেষ ত্রুটিপূ উন্নত বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা, নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ এবং ভারতে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। উক্ত ফে ফাউণ্ডেশন দলের মতে, সার প্রয়োগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা কি উঠিতে না পারিলে জলসেচ, উন্নত বীজ প্রভৃতির পূর্ণ সুবিধা ভে করিতে পারা যাইবে না।

৩। বীজ, সার ও কৃষি-জমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ

জমিকে কৃষির উপযোগী করিবার ব্যবস্থাও অতি পুরাতন। জমির উপরের স্ত একটি সামান্য অংশকে কোনমতে কর্ষিত করিয়া বীজ বপন করিতে পারিলেই ভার কৃষক সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে যে যথেষ্ট উৎপাদন সম্ভব নয় এ-বিষয়ে হয় সে অ নহে, না-হয় সে উদাসীন।

পরিশেষে আছে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রশ্ন। বস্তুত, যন্ত্রিকরণ (mechanisatio কৃষিকার্যের পদ্ধতির উপরি-উক্ত সকল দিকের সহিতই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যন্ত্রি সম্ভব হইলে স্বভাবতই বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে হ কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে, জ পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হইবে এবং স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে উ বীজ সার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। এখন এ-সম্ব আলোচনা করা হইতেছে।

৪। যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি এখনও বিশেষ অবলম্বিত হয় নাই

কৃষির যন্ত্রিকরণ (Mechanisation of Agriculture) :

কৃ যন্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় কৃষিকার্যের সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানব ও পশুশক্তির পরি যন্ত্রশক্তির ব্যবহার করা, অথবা যন্ত্রশক্তি দ্বারা মানব ও পশুশক্তি সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ, কর্ষণ ব্যাপারে ট্রাক্টর নি করিলে পশুশক্তির ব্যবহার পরিহার করা যায় এবং মানবশ্রমকে বিশেষ পরিম সহায়তা করা হয়। আবার 'কম্বাইন ড্রিল' (combine drill) দ্বারা একই সংগে বপন ও সার প্রোথিত করার কার্য সমাধা করা যায়; অথচ ইহাতে পশুশ ব্যবহারের প্রয়োজন মোটেই হয় না। বর্তমানে অন্যান্য এরূপ সব যন্ত্রপাতি আবি হইয়াছে যে, জমি চাষোপযোগী করা হইতে ফসল কর্তন অবধি সকল পর্যায়েই পশুশ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার এবং মানবশ্রমের পরিমাণকে বিশেষভাবে হ্রাস ক কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। ব্যাপক অর্থে যন্ত্রিকরণ বলিতে ইহাই বুঝায়।

যন্ত্রিকরণের অর্থ

ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ বলি কিছু প্রয়োজন হয় না। যে-দেশে কৃষিকার্য শতকরা ৭০ ভ লোকের জীবিকা, যে-দেশে বিশেষ করিয়া পদ্ধতিজনিত ত্রুটির কৃষিকার্য অনগ্রসর, যে-দেশে খাদ্যাভাবের আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে সে-দে

যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

়র উন্নয়নের জন্য যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা লইয়া সাফাই গাহিতে হয় না। উপরন্তু মান ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটছে। ভারতীয় কৃষককে আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পণ্যের গুণবৃদ্ধি ও পাদনের ব্যয়হ্রাস। এই দুইটিই কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। ণ্ডিত নেহরুর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ীই আমাদের পাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে; পুরাতন পদ্ধতিতে চলিলে আমরা নিমতেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিব না। পরিশেষে কার্যের সহিত সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় আছে—যথা, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি, যাহা যান্ত্রিক কৃষি ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা য় না।

যন্ত্রিকরণের অসুবিধা (**Difficulties of Mechanisation**): ভারতে ষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে উপরি-উক্ত ভাবে ওকালতি করা গেলেও র প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, দেখা প্রয়োজন যে রতে কৃষির যন্ত্রিকরণ বিশেষ কাম্য হইলেও বর্তমানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ ম্ভব কিনা ?

ব্যাপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইল কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা। খণ্ডিকরণ ও খণ্ডতার দরুন ভারতে কৃষি-জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ষিকার্য সম্পাদন করিবার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে বৃহদায়তনে কৃষিকর্ম বুঝায়। কিন্তু বৃহদায়তনে কৃষিকর্মের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের অস্তিত্ব। সুতরাং ইহাদের সংহতি-সাধনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া পরে যন্ত্রিকরণের কথা চিন্তা করা হইতে পারে। এইজন্য অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে যন্ত্রিকরণ-ব্যবস্থা ন সমবায়িক খামার এবং সরকারী মালিকানাভুক্ত পুনরুদ্ধৃত পতিত জমিগুলিতেই বর্তিত হইতে পারে।

অন্তরায়—কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা

দ্বিতীয়ত, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের (co-operative ming) প্রসারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি জোত বৃহদায়তনই হইবে, তবে তখন ব্যাপক যন্ত্রিকরণের পথে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে মূলধনের সমস্যা। যন্ত্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেওয়া বায় সমিতির পক্ষে বর্তমানেই সম্ভব হইবে না; স্বভাবত ঐ ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ রিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারী নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা বিশদভাবে চিন্তা করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

মূলধনের সমস্যা

তৃতীয়ত, কৃষির যন্ত্রিকরণের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে কৃষি-শ্রমিক বেকারত্বের প্রশ্ন। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে এই সকল কর্মচ্যুত কৃষি শ্রমিক ব্যবস্থা কি হইবে? ইহারাই প্রথমে সম্পূর্ণ বেকার হইয়া পড়িবে—কারণ, ইহা স্থানাধিকার করিবে যন্ত্র। ক্রমে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকদের সং বাড়িতে থাকিবে। বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৪ কোটি। সুতরাং অনেকের মতে, বৃহদায়তন এবং কৃষিগত শি (agro-industries) সম্যক উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপায়ে এই সকল কৃষি-শ্রমি বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া যান্ত্রিক কৃষির ব্যাপক রূপ দেওয়া উচিত নয়।

৩। কৃষি শ্রমিকের বেকারত্বের প্রশ্ন

চতুর্থত, যন্ত্রিকরণ-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে বহুসংখ্যক অপ্রয়োজনীয় গো মহিষাদির ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা হইল আর একটি সমস্যা। আমরা দেখিয়াছি ভারতের গো-মহিষাদি সংখ্যায় বহু হইলেও ইহাদের এক-দশম একেবারেই অকেজো।* সুতরাং ইহাদের অপসারণ প্রয়োজ কিন্তু ভারতের ন্যায় ধর্মান্ধ ও ভাবপ্রবণতার দেশে ইহা সহজ কার্য নহে। ইহার উপর যদি আবার যন্ত্রিকরণের ফলে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় গো মহিষাদি চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে সমস্যা আরও গুরুতর রূপ ধারণ করিবে।

৪। অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদির সমস্যা

পঞ্চমত, যান্ত্রিক কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকগণে পক্ষে যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার। কিন্তু যে-দেশে সাধারণ কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষ অভাবই রহিয়াছে সে-দেশে কৃষকগণ রাতারাতি যন্ত্র-ব্যবহার করি শিক্ষিত হইয়া উঠিবে এরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুত কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য আমাদিগকে ভাবীকালের কৃষকগণের দি তাকাইয়া থাকিতে হইবে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হই গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিতে পারিবে।

৫। যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার ব্যাপক রূপ দেওয়ার প্রশ্ন

ষষ্ঠত, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে এককপ ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণ (specialisation of crops) বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক বিশেষিকরণের সহিত পরিচিত নহে বিশেষিকরণ তাহার আয়ত্তাধীনও নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে সনাতন পদ্ধতিতে এবং অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সে কোনক্র কৃষিকর্ম সম্পাদন করিয়া চলে। সুতরাং, কৃষি-পদ্ধতির সর্বাংগী সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণের ব্যবস্থা করিয়া যন্ত্রিকরণে আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাইতে পারে না।

৬। ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণের প্রশ্ন

৭। সেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির অপরিহার্যতা

পরিশেষে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, শক্তি সরবরাহের প্রসার প্রভৃতি যান্ত্রিক কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। কৃষিতে যন্ত্রনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলে না সুতরাং যন্ত্রিকরণের পূর্বেই সেচ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতিসাধন করিতে হইবে

* ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

অবদিকে আবার যন্ত্র-ব্যবহারের জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন। এই শক্তি প্রধানত তৈল হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তৈলের উৎপাদন ও সরবরাহ বিশেষভাবে না বাড়িলে কৃষির যন্ত্রিকরণের ব্যাপক রূপদানের প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে না।

উপসংহার ঃ উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, বর্তমান ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহার অনুসরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাই বলিয়া প্রতিবন্ধকসমূহ দূর হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতে হইবে—এরূপ অভিমতও প্রদান করা সম্পূর্ণ সংগত নহে। সুতরাং যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ধীরে ধীরে। বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যন্ত্রিকরণকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কার্য সুরু করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবর্তনের দিক দিয়া প্রথমে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বা সমবায়িক খামারগুলিকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে; যন্ত্র প্রয়োগের দিক দিয়া হাল্‌কা ধরনের ট্রাক্টর প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দেশ করা যাইতে পারে; ইত্যাদি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ইহার উপলব্ধি সম্ভবপর। শ্রীনেহরুর ভাষায় 'অল্প দিনের মধ্যে যান্ত্রিক কৃষির কথা চিন্তাও করা যায় না।'*

কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ

কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়াস (Steps taken towards Mechanisation of Agriculture): ভারতে যন্ত্রিকরণের প্রথম প্রয়াস হিসাবে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিতে হয়।** এই সংগঠন বর্তমানে এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ইহা মার্কিন সৈন্যবাহিনী পরিত্যক্ত মাত্র ২০০ ট্রাক্টর লইয়া কার্য সুরু করিলেও বর্তমানে ভারী ও হাল্‌কা উভয় প্রকার ট্রাক্টরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫০০-র উপর। ইহার উপর কতকগুলি রাজ্য সরকারও তাহাদের নিজস্ব ট্রাক্টর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা ট্রাক্টর-সংগঠনগুলির প্রধান কার্য হইলেও, সাধারণ কৃষিকার্য বা ভূমিকর্ষণের কার্যেও ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কৃষকগণকে ইহা আবার ভাড়াও দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠন ও যান্ত্রিক কৃষির সূচনা

রাজ্য সরকারসমূহের ট্রাক্টর সংগঠন

কিছুদিন পূর্বে অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী ভূস্বামিগণ ট্রাক্টরের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে —অর্থাৎ, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই কৃষিকার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কৃষি জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের (fixation of ceiling) জন্য ভূস্বামিবর্গের মধ্যে এ-বিষয়ে উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে পূর্বের তুলনায় ট্রাক্টর আমদানিও কমিয়া

* AICC Economic Review May, 1959.

** ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

গিয়াছে। কিন্তু এদিকে দেশের মধ্যে ট্রাক্টর নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে। মাদ্রা একটি প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত সহযোগিতায় ট্রাক্টরের বিভিন্ন আমদানি করিয়া ট্রাক্টর নির্মাণকার্য করিতেছে। একটি জার্মান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা সহযোগিতায় উড়িষ্যায় আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও এই কার্য সুরু করিয়াছে। ট্রা চালনাকার্যে শিক্ষাদানের জন্য ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষিখামার স্থাপন করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এইরূপ আরও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠার কথা আছে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না

অবশ্য, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না, কৃষিকার্যে মান পশুশ্রমলাঘবকারী অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহারও বুঝায়। এইদিকেও কার্য সুরু হইয়াছে চলে। কিছু দিন হইতে কৃষিকার্যে ইলেকট্রিক মোটর, ডি ইঞ্জিন প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিচালিত যন্ত্রসমূহের ব্যবহার উত্তরো বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই সকল যন্ত্রপ নির্মিত হইতেছে। 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের সহি সম্পর্কিত বলিয়া সরকার এইদিকেও নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করিতেছে। অনে সময় কৃষকগণকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘকালীন ঋণদান করা হয়; অনেক স আবার যন্ত্রাদি ভাড়াও দেওয়া হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একরের মত জমিকে যান্ত্রিক কৃষি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ১৫ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার হইবে তাহার একাংশে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ (Japanese Method of Padd Cultivation)ঃ আত্যন্তিক পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ—যাহাকে সাধারণত জাপা পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ বলিয়া অভিহিত করা হয়, কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের আর এক দিক। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ২১ লক্ষ একর জমিতে এই উন্নত পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ করা হয় ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মোট ১ কোটি একরের মত ধান্যের জমি এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান (Production of Improved Seeds and Rabi Production Campaign)ঃ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, উন্নততর বীজ উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৯ শতের কাছাকাছি বীজ উৎপাদন খামার (seed farms) স্থাপন করা হয়।*

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan এবং India—1959

অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার. বোম্বাই প্রভৃতি ৯টি রাজ্যে রবিশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এক আত্যন্তিক অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। মূলত ইহার ফলেই গম বার্লি ছোলা ও জোয়ার এই চারিটি রবিশস্যের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মিশ্র কৃষিকার্য (Mixed Farming) : মিশ্র কৃষিকার্যও কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত। মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে বুঝায় একই কৃষিগত সংগঠন হইতে এক বা একাধিক ফসল ও নানাপ্রকার প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করা। অর্থাৎ কৃষক যদি ধান্য, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপাদনের সহিত গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি প্রভৃতি পালন করে, শাকসব্জীর বাগান ইত্যাদি করে, তবে এইরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মিশ্র কৃষিকার্য বলা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিশ্র কৃষিকার্যে কৃষক ফসল উৎপাদনের সহিত এমন সকল কার্য মিশ্রিত করে যাহা প্রধান উৎপাদনকার্য বা ফসল উৎপাদনের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ—যাহা সে প্রধান উৎপাদনকার্যকে কোনরূপ ব্যাহত না করিয়াই সহজে সম্পাদন করিতে পারে।

মিশ্র কৃষিকার্য কাহাকে বলে

১৯৫০ সালের দ্বিতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন ভারতে মিশ্র কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করার পরই এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে এইরূপ ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই গুণ বা সুবিধাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

এই ব্যবস্থার গুণ :

প্রথমত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষিক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করিবে। ভারতে কৃষকগণ যে-সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় সে-সময়ে তাহারা গো-মহিষাদি পালন, মৎস্যের চাষ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবে। ফলে, সারা বৎসর ধরিয়াই তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ নিয়োগের ফলে তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়া জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। তৃতীয়ত, মিশ্র কৃষিকার্য একরূপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (a system of natural insurance)। প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতিতেই বিশেষ ঝুঁকি (risks) আছে; আমাদের কৃষিকার্যের ত' কথাই নাই। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ভারতে কৃষিকার্যের ফলাফল সম্পূর্ণ দৈব নিভরশীল। আবার ভারতীয় কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া ফসল উৎপাদন কোনক্রমে ব্যাহত হইলে কৃষকের অবস্থা সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু মিশ্র কৃষিকার্য অনুসরণ করিলে কৃষক গো-পালন, মৎস্যের চাষ ইত্যাদি হইতে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করিয়া অজন্মার বৎসরে এইগুলি হইতে কোনমতে দিন গুজরান করিতে পারে। চতুর্থত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষককে অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলে। গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৎস্য ইত্যাদি হইতে কৃষক নানাপ্রকার প্রাণিজ খাদ্য পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহার

ইহা অনেকাংশে অর্ধ-নিয়োগের সমাধান করিবে

কৃষকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইবে

ইহা একরূপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা

আহার্য দ্রব্যের খাদ্য-মূল্য (food value) বাড়িয়া যায়। নিজে উৎপাদন ন

৪। ইহা খাদ্যে কৃষককে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে

করিলে ঐ পরিমাণ খাদ্য-মূল্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অধিকা ক্ষেত্রেই সম্ভব হইত না। পঞ্চমত, মিশ্র কৃষিকার্য বলি একই ক্ষেত হইতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন বুঝায়। ইহাতে

৫। আর একটি কারণে আয়বৃদ্ধি

অনেকাংশে কৃষকের অর্থ-নিয়োগের সমস্যার সমাধান হয় আয়বৃদ্ধি ঘটে, স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, ইত্যাদি পরিশেষে, ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য প্রতিবিধানের সহিত মিশ্র কৃষিকার্যও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করি হইবে; এক একটি ক্ষেত হইতে মাত্র এক একটি ফসল তুলিয়া বর্ধমান জনসংখ্যা জন্য খাদ্য যোগান সম্ভব হইবে না।*

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়া মিশ্র কৃষিকার্যকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই, বস্তুত, সংকীর্ণ অর্থে দেখিলে ভারতের অধিকাংশ কৃষকই মিশ্র কৃষিকার্য অনুসর কারী—অধিকাংশ সময় একই ক্ষেতে তাহারা বিভিন্ন ফসল জন্মাইয়া থাকে এ সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাহারা কৃষিকার্যের সহিত গো-মহিষাদি এবং হাঁস-মুর পালনও করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের এই 'মিশ্র কৃষিক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। উক্ত ফিস্‌ক্যাল কমিশনের অভি হইল, কৃষির পুনর্গঠনের জন্য এই ব্যবস্থাকে বৃহদায়তনে পরিণত করিবার বিশে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রয়োজনের আলোচনায় সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। মিশ্র কৃষিকার্যের প্র স্তর হিসাবে জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদনের কথা লইয়া আলোচনা করিলে দে

বর্তমানে মিশ্র কৃষি-কার্য প্রবর্তন কতদূর সম্ভব

যায়, ভারতে অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকা এরূপ রাসায়নিক গুণে স যে একই জমি হইতে নানাপ্রকারে ফসল উৎপাদন করা অস নহে। প্রকৃতপক্ষে, পালটি ফসল উৎপাদনকে (rotation of crop (যাহা মিশ্র কৃষিকার্যের অংগীভূত) ভারতীয় কৃষির উন্নয়নক অন্যতম অবশ্য গ্রহণীয় পন্থা হিসাবে নির্দেশ করা হয়। প্রাণিপালন সম্বন্ধে বলা যায় ভারতীয় কৃষক এই ব্যবস্থা অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়াই থাকে; সুতরাং ইহার ব্য

প্রতিবন্ধক:
১। ক্ষুদ্রায়তন জোত এবং কৃষকের দারিদ্র্য

রূপদান করাই প্রয়োজন। অতএব, সামগ্রিক অর্থে মিশ্র কৃষিক ব্যাপক রূপ দেওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপক রূপদানের অনেক বাধা রহিয়াছে। রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধির জন্য প ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকিলেও ক্ষুদ্রা জোতের জন্য অনেক স্থলে ইহা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। আর্থিক সংগতির অ হইল এই পথে আর একটি প্রতিবন্ধক।

* **Report on India's Food Crisis and Steps to meet it'**

ক্ষুদ্রায়তন জোত এবং কৃষকের দারিদ্র্য মিশ্র কৃষিকার্যের অপরদিক—অর্থাৎ প্রাণী-পালন ইত্যাদির পথেও ইহা বিরাট বাধাস্বরূপ। ভারতীয় কৃষক প্রাণী-পালন ইত্যাদি কার্য সাধারণভাবে সম্পাদন করিয়া আসিলেও ক্ষুদ্রায়তন জোত ও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে বৃহদায়তনে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হইল জোতের সংহতিসাধন ও কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের। দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তনে মিশ্র কৃষিকার্য কৃষকের নিকট হইতে পরিবর্তিত এবং উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল দাবি করে। এই উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল হইল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন। সুতরাং ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যাপক রূপের কল্পনা করা একরূপ অযৌক্তিক।

২ উন্নততর দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয়ত, ভারতীয় কৃষকের ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারও মিশ্র কৃষি-কার্যের পক্ষে অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষকগণ শূকর পালন করিতে চাহিতেছে না অথবা যে-পদ্ধতিতে গো পালন করা উচিত ধর্মান্ধতা হেতু সে-পদ্ধতিতে গো-পালন করিতে অস্বীকার করিতেছে। পরিশেষে বলা যায়, কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন না করিয়া ব্যাপকভাবে মিশ্র কৃষিকার্য প্রবর্তন করিতে বলা অর্থহীন। যদি পণ্য মূল্যের অধিকাংশ ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতিই খাইয়া ফেলে তবে অধিকতর ব্যয়ে কৃষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়নের সার্থকতা কোথায়? বিক্রয়ব্যবস্থার সংস্কার ব্যতিরেকে অনেক সময় হয়ত মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যয়ই সংকুলান হইবে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষক আবার পূর্বের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইবে।

কৃষকের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার

কৃষিজ দ্রব্যের ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষির অন্যান্য দিকের সংস্কারের প্রশ্নের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। কৃষির ভূমিগত, মূলধনগত এবং সংগঠনগত অধিকাংশ সমস্যার সমাধান না করিয়া মিশ্র কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া চলিতে পারে না। অনেকে তাই এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, কৃষির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনার অন্যতম অংগ হিসাবেই মিশ্র কৃষিকার্যকে গ্রহণ করা উচিত—এককভাবে নহে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the main defects of the present system of Agricultural Marketing and suggest remedies which you consider desirable (C U B A 1952) (১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠা)

2. Review the measures that have been adopted to improve the system of agricultural marketing in India

[ইংগিত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলের ঋণ ব্যবস্থাকে একত্র অংগীভূত করিয়া উভয়ের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভিত্তি হইল সমবায় নীতি। ১৪৪-১৪৭ পৃষ্ঠা এবং সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।]

3. Point out the main defects in the existing method of agriculture. How would you remedy them ?

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে যে-সকল প্রতিবিধানের নির্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (ক) কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকাকে লঘু করা, (খ) কৃষি-জমির পর্যাপ্ত ব... করা, (গ) উন্নততর বীজ, সার সরবরাহ এবং কৃষি-জমিতে জলসেচ করা এবং (ঘ) যথাসম্ভব যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।

ভারতে যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে কৃষিকার্য বৃহদায়তনে সম্পন্ন করিতে হইবে। বস্তুত ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন বর্তমান ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান ত্রুটি। সুতরাং যন্ত্রিকরণ এবং অন্যান্য ব্যয় সংক্ষেপের (economies) প্রয়োজনে বৃহদায়তন কৃষির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যন্ত্রিকরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক থাকার দরুন এ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। স্বভাবতঃ কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন হইল দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন।]

4. Discuss the possibilities and limitations of Mechanised Farming in India.
(C. U. B. A. 1951, 1955

[ইংগিত : যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ......(১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠা।

5. Discuss the merits and possibilities of Mixed Farming in this country. What are the obstacles in its way ? (C. U. B. Com. 1950) (১৫১-১৫৫ পৃঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন

(Co-operative Movement in India)

সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Co-operation) : 'সমবায়' বলিতে ব্যবসায়-সংগঠনের অন্যতম রূপ বুঝায়। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায়-সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে কোন উপায়েই হউক সর্বাধিক মুনাফা লাভ (profit maximisation) করাই হইল ব্যবসায়-সংগঠনের এই সকল রূপের আসল উদ্দেশ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়ারী হয় এবং দরিদ্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে ইত্যাদি। এক শ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (co-operation) ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন করা।

সমবায় ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়-সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করিতে চেষ্টা করে

সমবায়েব নানা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্যালভার্ট (Calvert) প্রদত্ত সংজ্ঞা হইল এইরূপ : কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে সমবায় আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালের ভারতের ম্যাকলাগান কমিটির (Maclagan Committee) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে সমবায়ের মাধ্যমেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-সমুদয় ধনীদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে ; ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) সম্ভব করিয়া তোলাই সমবায়ের আদর্শ।

সমবায়ের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, সমবায় সূচনা হয় দারিদ্র্যের পীড়নে। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চায়। দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলধন থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠন ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব, সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলধন মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই মিলিত হয়।

সমবায়ের নীতি বা বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক। এখানে মালিক শ্রমিকে কোন ভেদ নাই, ম্যানেজার ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদস্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী।

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে ইহাই সমবায়ের নীতি। সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি সম্ভব হয় না। জোর করিয়া লোককে সকলের জন্য কাজ করান যায় না।

পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সাধন করা। সুতরাং, সদস্যগণ ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্যগণের মধ্যেও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না।

দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথনির্দেশ করে। সুতরাং, যাহারা দরিদ্র, যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

কাহাদের সমবায় বিশেষ উপযোগী :

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তাহার ক্ষুদ্র জোত খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ বলিয়া, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিসম্পন্ন বলিয়া, ঋণ-ব্যবস্থা অসংগঠিত বলিয়া কৃষি হইতে সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলে। এই অবস্থার অবসানকল্পে সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়।

১। কৃষি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে। কারণ, এইরূপ শিল্পে অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালন-দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী। নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে লাভ হয় তাহাও সভ্যগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্য সমসাময়িক কার্যকলাপের মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্তদেরও স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল।

২। ক্ষুদ্র শিল্প

৩। ভোগ্যপণ্য ক্রয়

৪। মধ্যবিত্তের ঋণ-ব্যবস্থা

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (Different Types of Co-operative Societies): জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ঐ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়—যথা, (ক) গ্রাম্য (rural), এবং পৌর (urban)। গ্রাম্য সমিতিগুলি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক একজন সমাজ-সংস্কারক। রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্য সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' (Raiffeisen Type of Societies) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ: (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে এবং ফলে সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়; (২) যাহাতে দরিদ্র কৃষক ও স্বল্পবিত্ত গ্রাম্য কারিগরগণ সহজেই সমিতির সদস্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্য শেয়ারের মূল্য অতি অল্প রাখা হয়; (৩) সমিতি যাহাতে মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত না হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সদস্যদের দায়

৫। গ্রাম্য ও পৌর সমিতি

গ্রাম্য সমিতিকে রাইফিজেন ধরনের সমিতি বলা হয়

ইহার বৈশিষ্ট্য

দায়িত্ব অসীম (unlimited) হয় ; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে (productive purposes) বা বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণদান করা হয়—যথা, নূতন জমি ও যন্ত্রপাতি য়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি ; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা বিশ্রমিকে কার্য করেন।

জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন করেন সমাজসেবী স্থলজ-ডেলিতস্ (Schulze-Delitsch)। সুতরাং, এই ধরনের সমিতি 'স্থলজ ডেলিতস্ ধরনের সমিতি' বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই স্থলজ-ডেলিতস্ ধরনের। এইপ্রকার সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য-লি পরিলক্ষিত হয়ঃ (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং হার কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না ; (২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়, (৩) সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited) থাকে ; (৪) সদস্য কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করিতেছে হার বিচার বিশেষ করা হয় না ; (৫) বেতনভুক্ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য চালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

রাইফিজেন এবং স্থলজ-ডেলিতস্ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই 'প্রধানত' ঋণদান তি (credit society)।* কিন্তু ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের কার্যকারিতা রহিয়াছে—যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ, বীমাকার্য ইত্যাদি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি ভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়। ভারতে সমবায়ের এই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির বিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত সকল ধরনের সমবায় সমিতি অবশ্য এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়—যথা, হয় তাহারা ঋণদান করে, না-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। এ-ধরনের সমিতিকে এক-উদ্দেশ্যসাধক (single-purpose) সমিতি বলা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) হইতে —অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে ঋণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, উৎপাদনবৃদ্ধি তি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটির o-operative Planning Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে সব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির

(Margin notes:) ীর সমিতি স্থলজ-লিতস্ ধরনের নামে অভিহিত | ার বৈশিষ্ট্য | ঋণদান ও ান্য প্রকার সমিতি | এক উদ্দেশ্য-ক এবং বহু-দ্দেশ্যসাধক সমিতি | সমবায়

* ঋণদান ছাড়াও ইহারা অন্যান্য কার্য করিতে পারে ; তবে সাধারণত ইহারা ঋণদানেই ইহাদের ক সীমাবদ্ধ রাখে।

রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। অপরদিকে ইহার একপ্রকার পরিবর্তিত রূপ সেবা সমবায় সমিতি (service co-operatives) গঠনে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short History of the Co-operative Movement in India): ভারতে সমবায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা সরকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায় তাহাদের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়া সরকার সিভিলিয়ান ফ্রেডারিক নিকলসনকে জার্মেনীর গ্রাম্য সমবায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য ঐ দেশে প্রেরণ করে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার রিপোর্টে নিকলসন ভারতে জার্মেনীর রাইফিজেন ধরনের ঋণদান সমবায় সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। মূলত এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act, 1904) পাস হয়।

নিকলসনের রিপোর্ট

আইনটির উদ্দেশ্য ছিল "কৃষক, কারিগর ও স্বল্পসহায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় নীতির প্রসারসাধন।" এই আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতিগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। গ্রাম্য সমিতিগুলি রাইফিজেন সমিতির নীতিকে অনুসরণ করে।

১৯০৪ সালের আইন ও ঋণদান সমিতি

কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৪ সালের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, ফলে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন পাস হয়। এই আইন দ্বারা—(১) ঋণদান সমিতি ছাড়া ক্রয়বিক্রয়, উৎপাদন প্রভৃতি অন্যান্য প্রকারের সমিতিগুলি স্বীকৃত হয়। (২) প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান, হিসাব পরীক্ষার জন্য (ক) ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণপ্রদান করিবার জন্য (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও (গ) প্রাদেশিক ব্যাংক* মোট এই তিন প্রকারের কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) পূর্বে সমিতিগুলিকে যে গ্রাম্য এবং পৌর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তে সমিতিগুলিকে সসীম ও অসীম দায়যুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে-সমিতির উদ্দেশ্য সভ্যদের ঋণপ্রদান করা এবং যাহার অধিকাংশ সভ্য কৃষক তাহার দায় হইল অসীম, আর যে-সমিতির সভ্য রেজিস্ট্রারিভুক্ত সেই সমিতিসমূহের দায় হইল সসীম।

ফলে ১৯১২ সালের আইন প্রণয়ন—এই আইনের বৈশিষ্ট্য

---

* প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৫ সালের ম্যাকলাগান কমিটির সুপারিশের পর।

১৯১২ সালের পর সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। সমিতিসংখ্যা, সংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দুগ্ধ সরবরাহ, ন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশু-বীমা, সুতা ও সার ক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন র সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি ব-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১৪ সালে সরকার ম্যাক্‌লাগান (Maclagan) কমিটি নিযুক্ত করে। এই কমিটি যে-রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকার কমিটির প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করিতে পারে। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনে সমবায় বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত ক্ষমতাভুক্ত হইলে বিভিন্ন প্রদেশ আপনাপন প্রয়োজন অনুসারে নিজস্ব সমবায় আইন প্রবর্তন করিতে থাকে এবং আন্দোলনও আশাতীতভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের (Worldwide Trade Depression) ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় সমবায় আন্দোলন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়। সমিতিগুলির দায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ধ্বংসের পতিত হয়। তখন সরকারকে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রতি শেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত -ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) সংযুক্ত করা হয়। ইহা য় আন্দোলনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে থাকে।

(মার্জিন: গান কমিটি; সালের শাসন-র ও সমবায়; বাজার ও য়ের সংকট)

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় তখনও সমবায় আন্দোলন আপন কে টিকাইয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য সমবায় আন্দোলন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে; ফলে সমিতিগুলির অবস্থাতেও উন্নতি দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন অনাদায়ী ঋণ কমিয়া গিয়া প্রায় অর্ধেকে দাঁড়ায়। এই র মধ্যে সমিতিগুলি এবং তাহাদের সদস্যসংখ্যাও যথাক্রমে শতকরা ৪১ এবং ৭০ র মত বাড়িয়া যায়। ইহা ব্যতীত একাধিক প্রদেশে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় দি সরবরাহের জন্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operatives) ষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদক যাহাতে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার-মূল্য পাইতে তাহার জন্য সমবায় পন্থায় বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়। ছোটখাট শিল্প-কেও সরকারী সমবায় দপ্তর নানাভাবে সাহায্যদান করিতে থাকে। এই সকলের সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন পায় এক নূতন প্রেরণা। তবুও সন্দেহ থাকিয়া যে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় সমবায় আন্দোলন যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা ত্তর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থায়ী হইবে কিনা?

(মার্জিন: বিশ্বযুদ্ধ ও আন্দোলনের)

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সরকার সমবায় পরিকল্পনা কা (Co-operative Planning Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। ক

সমবায় পরিকল্পনা কমিটি

সুপারিশ করে যে প্রাথমিক এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগু যথাসম্ভব বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে পরিণত করিতে হইবে ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম ও শতকরা ৩০ জনসংখ্যাকে এই প্রকার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে হই কমিটির সুপারিশ মত কার্য সুরু হইবার পূর্বেই আসিল দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা।

স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movem in Free India): স্বাধীনতা ভারতের সমবায় আন্দোলনে এক নূতন অধ্য সূচনা করে। স্বাধীনতালাভের পর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিতে যে-সমস্ত বৈশি সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

প্রথমত, সমিতি ও সদস্যসংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের দিক হইতে বিচার ক দেখা যাইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্নভাবেই হইয়া চলিয় ১৯৪৬-৪৭ সালে সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ছিল ১·৩৯ হাজার, সদস্যসংখ্যা

বৈশিষ্ট্য: ১। সমিতি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাংশই সমবায় আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে

৯১ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৫৬ কোটি ট ১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিগুলির সংখ্যা হয় ২·৫৭ লক্ষ, সদস্য ২·৪৪ কোটি এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬·৯৬ কোটি ট উপর। সমিতি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের মনে র হইবে যে, সমবায় আন্দোলন জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অং স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ১৯৫ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্তার করিবার প্রবণতা দে

২। ঋণদান সমিতিগুলির প্রাধান্য অপরিবর্তিতই রহিয়াছে

দিলেও এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিলেও ঋণদ সমিতিগুলির প্রাধান্য এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। স প্রকার সমিতির সংখ্যা ধরিলে মোট ৭৩ ভাগ হইল ঋণদান সমি এই ঋণদান সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধন হ যথাক্রমে মোট সদস্যসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধনের শতকরা ৬৫ ও ৭৭ ভাগ।

তৃতীয়ত, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির প্রবর্তন সমবায় আন্দোলনের আর এ

৩। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রবর্তন আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৫ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমি রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীন ভারতে এ-বিষয়ের প্রতি বিশেষ দেওয়া হয়। ফলে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি

* Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in Indi the Year 1957-58.

হাদের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার এবং ৫'৫ লক্ষ। ১৯৫১-৫২ সালে মিতি ও সদস্যসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৪০ হাজার এবং ২১'৫ লক্ষ। ১৯৫৪ সালে গ্রাম্য ণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে বাধা পড়ে—কারণ জরিপ মিটি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির পরিবর্তে প্রধানত ঋণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন রিতেই উপদেশ দেয়।

। রিজার্ভ ব্যাংক ও বায় আন্দোলনের ধ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাংক আন্দোলনকে সাহায্য করিতেছে। সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে কৃষি সংক্রান্ত কাজ-কারবার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অধিকমাত্রায় অর্থসাহায্য করিতেছে; ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ণদান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও প্রসারসাধন কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে।

। সমবায় আন্দোলনকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামী করা হইয়াছে

পঞ্চমত, সমবায় আন্দোলনকে অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামী রা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত আন্দোলনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশ যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার সমাধানে সমবায় আন্দোলনকে নিয়োজিত করা হয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, দুষ্প্রাপ্য নিয়ন্ত্রিত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বণ্টনের ভার সমবায় আন্দোলনের উপর পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও সমবায় আন্দোলনের এক রুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সমবায় কৃষি-সমিতি, সেচ-সমিতি প্রভৃতি ধরনের সমবায় তিষ্ঠানও কৃষিজ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে। জমিবন্ধকী ্যাংকগুলি তাহাদের ঋণদানের নীতিকে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বের তুলনায় জমি উন্নয়নের দ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ঋণপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন এবং নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সমবায় পন্থার সাহায্য গ্রহণ করা ইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষ রুত্বপূর্ণ। ইহাদের সংগঠন ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় পন্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বেচিত হইয়াছে।

রিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় মবায় পন্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ রা হইয়াছে

সর্বোপরি ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলনের জন্য এক বিশিষ্ট ূমিকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; স্বভাবতই সমবায় আন্দোলনের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শুধু কৃষি কেন, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় পন্থাকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষি ছাড়াও মবায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রায়তন

ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্যও ঐ পরিকল্পনায় সমবায় গঠনের উপর অনেকাংে নির্ভর করা হয়।

ঐ পরিকল্পনার সূত্রপাতেই (১৯৫১ সালে) গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ইহার পুনর্গঠন সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমি নিযুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থ যে পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তাহা পুনর্গঠিত সমবায় সংগঠনের উপর ভি করিয়াই করা হয়।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগের সংস্থ করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিব শিল্পের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতর পূর্ণাংগ গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা, কৃষি ও পল্লী সংগঠন করা ছাড়াও রাষ্ট্রকে শি ক্ষেত্রে সমবায়েব সম্প্রসাবণে অধিকমাত্রায় সচেষ্ট হইতে হয। ১৯৫৮ সালে পূর্বোল্লিখি স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে কিছুটা ব পড়ে।** ইহার পর আবার ১৯৫৯ সালেব নাগপুর কংগ্রেসেব প্রস্তাব অনুযায়ী সে সমবায় সমিতি (Service Co-operatives) এবং সমবায প্রথায় কৃষিকার্যের উপর গুরু আরোপ করা সুরু হয়।† অনুমান করা যাইতেছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে বিবোধি সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাব বাকী সময়ে এই সেবা সমবায়ের সম্প্রসাবণকার্যই চলিবে, এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় ইহাব এবং সমবায প্রথায় কৃষিকার্যেব জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হইবে। সেবা সমবায় সমিতি ও সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সার্থক রূপদানের জন্য ইস্রায়েল, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের সমবায় সমিতির পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে বা হইতেছে। এ-সম্পর্কে এই অধ্যায়েব শেষে আরও আলোচনা করা হইবে।

সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Co-operative Societies) ঃ ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমত প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয়—এই দুই ভাগে ভাগ কবা হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলি (Primary Societies) সদস্যদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, আর ইউনিয়ন (Unions), কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Banks) ও রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক (State Co-operative Banks) প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সহিত সম্পর্কিত। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে আবার ঋণদান সমিতি (Credit Societies) ও অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কৃষি ও অ-কৃষি এই দুই প্রকারের সমিতি আছে। বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জোতে

প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি

ঋণদান ও অ-ঋণদান প্রাথমিক সমিতি

* ১৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† Implementation of Nagpur Resolution—A. I. C. C. Economic Review May, 1959.

সংহতিসাধন (consolidation of holdings), গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধন, সেচ, বীমা, বাজারিকরণ প্রভৃতি কার্য অ-ঋণদান কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, গৃহনির্মাণ, স্বলভে কারিগরদের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হইল অ-ঋণদান অ-কৃষি সমবায় সমিতি। নিম্নে প্রদত্ত ছকটির সাহায্যে সমবায় সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ মোটামুটিভাবে বুঝান যাইতে পারে :

ঋণদান ও অ-ঋণদান কৃষি ও অ-কৃষি সমিতি

সমবায় সমিতি (Co-operative Societies)

- প্রাথমিক সমিতি (Primary Societies)
  - ঋণদান সমিতি (Credit Societies)
    - কৃষি (Agricultural)
    - অ-কৃষি (Non-Agricultural)
  - অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies)
    - কৃষি (Agricultural)
    - অ-কৃষি (Non-Agricultural)
- কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Societies) : (ক) ইউনিয়ন (Unions) (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Banks) ও (গ) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক (State Co-operative Banks)

(ক) প্রাথমিক সমিতি (Primary Societies) : প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। ইহাদের মধ্যে আবার কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় সবাধিক। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকারের ২'৫৭ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১'৬৬ লক্ষ বা মোট প্রাথমিক সমিতির শতকরা ৬৫ ভাগের উপর।* প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির এইরূপ গুরুত্বের জন্য ইহাদের সম্পর্কে সামান্য বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কৃষি ঋণদান সমিতির প্রাধান্য

প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমবায় সমিতি (Primary Agricultural Credit Societies) : অনধিক ১০ জন সদস্য লইয়া এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেকটি সমিতির কার্যক্ষেত্র সাধারণত এক একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হইল পারস্পরিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যেই সমবায় এইরূপ সমিতিগুলি সাধারণত অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে।

গঠন

* Statistical Statements relating the Co operative Movement in India for the year 1957-58.

মধ্যে অবশ্য গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বৃহদায়তন প্রাথমিক কৃষি সমিতির গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। পরে কিন্তু ১৯৫৮ সাল হইতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের* ফলে সসীম দায়সম্পন্ন সমিতি গঠনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে এবং সম্প্রতি সেবা সমবায় সমিতি গঠনে গুরুত্ব আরোপ করায় পূর্ণ কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রসারও কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক গতি

প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন শেয়ার-বিক্রয়, সভ্যদের ভর্তি ফী, সংরক্ষিত তহবিল, সদস্যদের আমানত প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সূত্র এবং সরকারী ঋণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ, সদস্য নয় এমন সমস্ত ব্যক্তির আমানত প্রভৃতি বহিঃসূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

কার্যকরী মূলধন

সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যায় যে, উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫ কোটি টাকা আর আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮'৬৩ কোটি টাকা। স্বভাবতই বাকী অংশ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা :

আমানতের অপ্রতুলতা এবং ঋণেব উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে সমবায় কৃষি-ঋণ আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই—ইহা কৃষকগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত কবিতে পারে নাই।*

১। আমানতের অপ্রতুলতা—ইহা কৃষি-ঋণদান সমিতির ব্যর্থতার পরিচায়ক

সমিতিগুলি কেবল সভ্যদেরই ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। উৎপাদন, অনুৎপাদনশীল কাজকর্ম এবং পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, এই তিন উদ্দেশ্যে ঋণপ্রদান করা হইয়া থাকে। উৎপাদনের জন্য যে ঋণপ্রদান করা হয় তাহার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণের উদ্দেশ্য হইল বর্তমান কৃষিকার্যকে সাহায্য করা আর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উদ্দেশ্য হইল কৃষিকর্মের স্থায়ী উন্নতিসাধনে সহায়তা করা। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মত অনুৎপাদনশীল কাজকর্মের জন্য ঋণপ্রদান করা সমবায় সমিতির কর্তব্য না হইলেও ঐরূপ ঋণ কৃষকদের দেওয়া হয় এই কারণে যে, অন্যথায় তাহারা মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন ঋণ গ্রহণের চাহিদা ব্যাপক হইলেও সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিল বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মারফত প্রাপ্ত মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্য এইরূপ ঋণ খুব বেশী প্রদান করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অনেক সময় কাগজপত্রে যাহাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা

২। ঋণপ্রদান নীতিই ত্রুটিপূর্ণ

---

* ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সলে হইয়া দাঁড়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ—কারণ অনেক সময় পরিশোধের সময় দ্ধি করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেক সময় দেখা যায়, যে উৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণ-গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা তাহাতে নিয়োগ না করিয়া অনুৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার ফলে সময় মত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। প্রদত্ত ঋণের নিয়োগ সম্পর্কে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। সাধারণত ব্যক্তিগত জামিনেই ঋণপ্রদান করার নিয়ম থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বন্ধক দিবার প্রয়োজন হয়। সহজ কিস্তিবন্দীতে ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। সুদ সম্পর্কে নীতি হইল যে উহা যাহাতে চাষীদের সামর্থ্যের বাহিরে না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবুও দেখা যায়, কতিপয় রাজ্যে সুদের হার শতকরা ১২-র উপর।

। সুদের হারও অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক

ঋণদান বিষয়ে সমিতিগুলির বর্তমান অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ঋণপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ৯৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৭·২৯ এবং ১৩·১০ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে উহাদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৭·১৫ এবং ২৪·১৮ কোটি টাকায়। অবশ্য মোট অনাদায়ী ঋণের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের শতকরা ভাগ ৭·৫ হইতে কমিয়া ৫·৩ এ দাঁড়াইয়াছে।

। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনদিক দিয়াই প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নহে, অথচ ইহারাই ভারতের সমবায় সংগঠনের ভিত্তি। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, এই ভিত্তির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে সমবায়কে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হইবে না এবং গ্রাম্য ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেও রূপদান করা সম্ভব হইবে না।

জরিপ কমিটি প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে: (১) প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিতে হইবে। সদস্যসংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয় তাহার জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া সমিতি সংগঠিত করা সমীচীন। (২) বৃহদাকারের সমিতিগুলিকে সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। (৩) পর্যাপ্ত শেয়ার-মূলধন যাহাতে নিশ্চিত করা যায় তাহার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিবে। রাজ্য ব্যাংক আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থপ্রদান করিবে। (৪) প্রাথমিক সমিতিগুলি কেবল স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে। (৫) প্রাথমিক সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য জরিপ কমিটির সুপারিশ

তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখে তাহার জন্য সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করি
হইবে। (৬) ঋণদান ব্যাপারে শস্যের ভিত্তিতে ঋণদানের (crop loans) উপর অধি
লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন উৎপাদনকার্যের জন্য মধ্যমেয়াদী ঃ
(medium-term loans) প্রদান করিতে পারে। (৭) প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমি
এবং বিক্রয় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মা
পণ্য বিক্রয় করিবার সর্তে প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতি সভ্যদের ঋণপ্রদান করি
(৮) অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের সমিতিতে বেতনভুক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মসচিব থাকিবে।

১৯৫৪-৫৫ সাল হইতেই এই সকল সুপারিশ অনুসারে কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলি
পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বৃহদায়তন ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে গঠি

স্যর ম্যালকমের সমালোচনা

প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া য
পরে ১৯৫৮ সালে স্যর ম্যালকম ডার্লিং এই গতির যৌক্তিক
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিবেচ
সহিত অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিলে এই গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। কৃষি-ঋণদান সমি
গুলিকে বৃহদায়তনে ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করার অর্থ হইল রাইফি
আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়া। স্যর ম্যালকমের মতে, ইহা করিবার পূর্বে বি
পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এখনই এই সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমি
সুপারিশগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। বর্তমানে সেবা-সমবায় (Serv
Co operatives) সমিতি গঠন ব্যাপারে স্যর ম্যালকমের এই নীতিকেই গ্রহণ
হইয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইহারা সাধারণত এক একটি গ্রাম লইয়া অসীম দা
ভিত্তিতেই গঠিত হইবে।* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পরিকল্পনা অনুস
ভবিষ্যতে এই সেবা সমিতিগুলিই প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতির স্থানাধিকার করিবে।

(খ) **কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান** (**Central Co-operative Societies**
কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন তিন ধরনের হয়—যথা, তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন, কে
ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ইউনিয়ন। (১) তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন (Supervis

সমবায় ইউনিয়নের গঠন

Unions) : প্রত্যেক সমবায় ইউনিয়ন একাধিক প্রাথমিক সমি
লইয়া গঠিত হয়। কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিগুলিই ইহাে
সদস্য হইতে পারে। ইউনিয়নের কাজকর্মের ভার সভ্য-সমিতিগুলি
প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ইউনিয়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। ইহাদের কার্যের ম
অন্যতম হইল প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করা এবং উহাদের সহিত কেন্দ্র

ইহাদের কার্য

সমবায় ব্যাংকগুলির সংযোগ স্থাপন করা। তত্ত্বাবধানকা
ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
সংখ্যায় নিতান্ত অল্প না হইলেও ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে স
হয় নাই।

---

* A. I. C. C. Economic Reivew May, 1959.

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন (Central Banks and Banking Unions) : ভারতে প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধন পর্যাপ্ত নহে, এইজন্যই প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাজ্য ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের। ইহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুলি নিজেদের কাজকর্মের জন্য বাহির হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধনের ঘাটতি বা বাড়তির সমন্বয়সাধনের কেন্দ্র (balancing centre) হিসাবে কার্য করে। অর্থাৎ, যে সমস্ত প্রাথমিক সমিতির হাতে বাড়তি মূলধন পড়িয়া থাকে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিয়া যে-সমস্ত সমিতিতে অর্থের অভাব দেখা দেয় তাহাদের সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির এইভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা অপেক্ষা মূলধন সংগ্রহ করিয়া প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সাহায্য করা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আমানত গ্রহণ, বিল, চেক ও হুণ্ডির অর্থ আদায়, মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কোন কোন রাজ্যে ব্যক্তিবিশেষকেও ঋণপ্রদান করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

প্রথম পরিকল্পনার শুরু হইতে এ-পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়নগুলির গতি ও কার্যবিবরণ নিম্নলিখিত ছকটি হইতে পাওয়া যাইবে :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮
সংখ্যা	৫০৯	৪১৮
সদস্যসংখ্যা (লক্ষ)	২·৩১	২·৯২
প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকায়)	১০৫·৬৪	১৫৯·৮৩
কার্যকরী মূলধন "	৬০·১১	১৪৭·০০

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইউনিয়নগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের জন্য আমানতের উপর অধিক নির্ভরশীল। শেয়ার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ আশানুরূপ নহে। পূর্ববর্তী বৎসর বা ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের মাত্র ১৭ ভাগ ছিল নিজস্ব তহবিল, আমানতের শতকরা ভাগ ছিল ৫৩ এবং বাকী ৩০ ভাগ ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত হইয়াছিল।

মূলধন : কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসে আমানত হইতে

এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সংগঠনের পক্ষে কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসিবে নিজস্ব তহবিল (owned funds)—যথা, শেয়ার হইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত তহবিল হইতে। অতএব ব্যাংকগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির আর একটি অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য হইল অনাদায়ী ঋণ ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণের আধিক্য। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ৭১'৯০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আবার যে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চলে (bad and doubtful debts) তাহার শতকরা ভাগ হইল ১৩

অনাদায়ী ঋণ ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণবৃদ্ধি আর একটি ত্রুটি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে:

(১) যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ না হয় তাহার জন্য সাধারণত প্রত্যেক জিলায় মাত্র একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকিবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

(২) শেয়ার মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ রাজ্য সরকার যোগান দিবে।

(৩) ঋণপ্রদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমিতিগুলির প্রয়োজনকে প্রথম স্থান দিবে। ব্যক্তিবিশেষকে ঋণপ্রদান সংকুচিত এবং ব্যবসায়ীদের ঋণপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক কাজকর্মে লিপ্ত হইবে না।

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি কিছু কিছু কার্যকর করায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-গুলির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ব্যাংকগুলির মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১'১৮ কোটি টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বাড়িয়া ২'১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে কিন্তু মুনাফা অর্জনে সক্ষম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ৩৭৪ হইতে কমিয়া ৩৫৬-তে পরিণত হয়।*

(গ) রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-operative Banks): রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ১৯১৫ সালের ম্যাক্লাগান কমিটির সুপারিশ অনুসারে তৎপরবর্তী কালে বৃহৎ প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়।** প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে যেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পক্ষে সেইরূপ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অর্থসাহায্য, তাহাদের কার্যের শৃংখলাসাধন ও তাহাদের কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি-বাড়তির সমন্বয়সাধনেই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উপযোগিতা। রাজ্য সমবায় ব্যাংক টাকার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগসূত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কও রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে রাজ্য ব্যাংক সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রাজ্য

কার্যাবলী

---

* Statistical Statement relating to the Co-operative Movement in India for the year 1957-58.

** পূর্বে ইহাদিগকে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক (Provincial Co-operative Bank) বলা হইত

্যাংক প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে না। ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি আবার প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্য ব্যাংক পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ পাইতে সাহায্য করিয়া থাকে।

ঠন

রাজ্য ব্যাংকগুলির গঠন সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা যায়। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের সমবায় সমিতিগুলিই কেবল রাজ্য ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষ উভয় শ্রেণীর সদস্যই আছে।

নিম্নলিখিত ছকটি হইতে প্রথম পরিকল্পনার সুরু হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংকগুলির অবস্থা বুঝা যাইবে:

রাজ্য সমবায় ব্যাংক

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮
রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা	১৬	২১*
সদস্যসংখ্যা	২৩,২৭২	৩২,১৮১
শেয়ার মূলধন	১'৯ কোটি টাকা	৪'৩৬ কোটি টাকা
মোট নিজস্ব তহবিল	৩'৮ ”	৭'৬৫ ”
আমানত	১৯'১ ”	৩৬'৬৭ ”
বিভিন্ন সূত্র হইতে গৃহীত ঋণ	১১'২ ”	৮৬'২৩ ”
কার্যকরী মূলধন	৩৬'৭১ ”	১০৯'১৪ ”
প্রদত্ত ঋণ	৫৫'৭২ ”	২১৯'০১ ”
দীর্ঘ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ	২০'০১ ”	৫৫'০০ ”

রাজ্য ব্যাংকের অবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনায় সন্তোষজনক

ছকটি হইতে দেখা যাইবে রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা এবং উহাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; শেয়ার-মূলধনের পরিমাণও বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু নিজস্ব তহবিল (শেয়ার মূলধন, সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল লইয়া গঠিত) বৃদ্ধি পাইলেও উহা কার্যকরী মূলধনের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ মাত্র। বাকী ৯৩ ভাগ আমানত ও অন্যান্য ঋণ হইতে প্রাপ্ত। রাজ্য ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অনাদায়ী ঋণের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক। যাহা হউক, মোটের উপর রাজ্য ব্যাংকগুলির আর্থিক অবস্থা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক ভাল।

* সংযুক্তি সাধনের ফলে রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা ২৩ হইতে কমিয়া ২১ এ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৬টির সংগে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকারবার চলিতেছে।

রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে : (১) সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের সহি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অন্যান্য ব্যাংকগুলিকেই রাজ্য ব্যাং সভ্যপদভুক্ত করা হইবে। ব্যক্তিবিশেষকে অতি অল্প সংখ সদস্যপদ দেওয়া যাইতে পারে। (২) রাজ্য সরকার শেয় মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগাইবে। (৩) ঋণদান বিষয়ে রাজ্য ব্যাংক কৃষি ঋ দানকে প্রথম স্থান দিবে; ব্যবসায়িগণকে ঋণদান ক্রমশ কমাইয়া দিতে হই (৪) রাজ্য ব্যাংককে সমবায় ব্যাংকের বাড়তি অর্থের জিম্মাদার করিতে হইবে; এই যাহাতে সমস্ত সমবায়িক কেন্দ্রীয় অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের বাড়তি অর্থ ব ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিতে হইবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

সমবায়ের পুনর্গঠন কার্যে উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহকে কার্যকর করা হইতে রাজ্য সরকারসমূহ উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে রাজ্য ও অন্যান্য সমবায় ব্যাংকের শেয়ার-মূ যোগাইতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতিতে র সরকারগুলির শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৬·৫০ কোটি টাকা।

পৌর সমবায়িক ঋণ-ব্যবস্থা (Urban Credit) : পৌর সম ঋণদান আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। পৌর ঋণদান সমিতিগুলি নগরাঞ্চলের অধিবাসীদে অথবা অফিসের কর্মচারী কিংবা কারখানার শ্রমিকদের মত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদে ঋণদান করে। গ্রাম্য ও পৌর ঋণদান সমিতির মধ্যে কয়েক পার্থক্য রহিয়াছে। পৌর সমিতির সদস্যসংখ্যা অধিক হইতে পা সদস্যদের দায়িত্ব সাধারণত সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ হারে লভ্যাংশ বণ্ট করিবার ব্যবস্থা থাকে। পৌর সমিতিগুলিকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে বিভক্ত ক হয়—যথা, (১) পৌর ব্যাংক (Urban Banks); এবং (২) বেতনভুক কর্মচারী সমিতি, মিল-কর্মচারীদের সমিতি প্রভৃতি ধরনের সহরাঞ্চলের অন্যান্য ঋণদান সমিতি।

গ্রাম্য ও পৌর ঋণদান সমিতির মধ্যে পার্থক্য

অনেকক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল রকমের কাজকর্মই পৌর সমবায়িক ব্যাংকগু সম্পাদন করিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহারা শুধু আমানত গ্রহণ ও ঋণদা করিয়াই থাকে।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যেই পৌর ঋণদান সমিতিগুলি অধিক প্রসারলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য ধরনের সমবায় আন্দোলন (Other Aspects of Co-operation) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমবায়ের বিভিন্নমুখী প্রসার ঘটে। পরিকল্পি অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতে ইহা আরও ব্যাপক হয়। বর্তমানে শুধু ঋণদান ন বিভিন্ন উৎপাদন ও বিনিময় ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভূমিকা রহিয়াছে। এখন প্রথ উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ক হইতেছে।

(ক) **সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন (Co-operation and Agricultural oduction):** কৃষির ক্ষেত্রে অধিক খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-জমির বমাণ বৃদ্ধি, জমির ক্ষয় নিবারণ, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজের সহিত সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত আছে। ইহাদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা (Co-operative Farming) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য স্থাপিত সমিতি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, ম কৃষিকার্য সমিতি (Joint Farming Societies), কৃষি-প্রজা সমিতি (Tenant rming Societies) এবং উন্নত ধরনের কৃষিকার্য সমিতি (Better Farming ocieties)। ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ভূমি-সংস্কার প্রসংগে পরে করা হইবে।

সমবায় প্রথায় কাষ

সমবায় কৃষি সমিতি ছাড়া সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে সেচ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিকে অগ্রণী হইল ম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ।

সমবায়িক সেচ

অনেক রাজ্যে আবার জন্তু-জানোয়ার ও চোরের হাত হইতে ক্ষেতের শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য-সংরক্ষণ ও বেড়ানির্মাণ সমিতি (Crop Protection and Fencing Societies) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা পাহারাদার গ এবং বেড়ানির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষেতের শস্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

শস্য সংরক্ষণ সমিতি

কৃষিজ উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে পনিবেশন (Land Colonisation), পতিত জমির পুনরুদ্ধার (Land Reclamation), জমির জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings), গো-প্রজনন (Cattle-breeding) প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত সমবায় সমিতিসমূহই প্রধান। ইহারা সকল রাজ্যে সমভাবে স বলাভ না করিলেও বর্তমানে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ইহাদের য়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

কৃষি জমি ও গো-জনন সমিতি

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় নীতি বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় পন্থায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও যোগানের পর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

। সমবায় দুগ্ধ মতি

বর্তমানে মাদ্রাজ, পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে দুগ্ধ ব্যবসায়ে সমবায় ান্দোলন কতকটা প্রসারলাভ করিয়াছে।

(খ) **সমবায় ও শিল্পজ উৎপাদন (Co-operation and Industrial 'roduction):** কৃষির ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পন্থা বিশেষ পযোগী। বস্তুত দরিদ্র কৃষক এবং কুটিরশিল্পীদের সমস্যা প্রায় একই প্রকৃতির।

কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। তাহাদের এমন কো সম্বল নাই যাহার জামিনে তাহারা সহজে ঋণ পাইতে পারে। ফ তাহাদিগকেও মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হ ইহারাও কারিগরদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগ স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহা ব্যতীত কারখানাদার বা মালি কারিগররাও আছে। ইহারা মহাজন কিংবা ব্যবসাদার অপেক্ষাও অধিকমাত্রায় ছোট কারিগরদের শোষণ করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা অর্থের যোগান দিয়া শিল্পীদের বেতনভুক শ্রমিকে পরিণত করে দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের অভাব কুটির শি একটি প্রধান দুর্বলতা। কুটির শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে অল্প পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ক বলিয়া জিনিসও ভাল হয় না এবং দামও বেশী পড়ে। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পের উপযে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সহায়সম্বলহী কুটির শিল্পীদের আয়ত্তের বাহিরে এবং ফলে তাহাদের চিরাচরিত যন্ত্রপাতি লইয়াই কে রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। চতুর্থত, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের লোভ ও ন কারিগরদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসহায় অজ্ঞ কারিগরদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের বিশেষ বে পাইতে হয় না।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সমবায়

কুটির শিল্পীদের সমস্যা

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল সমবায়। উৎপাদন, কাঁচামাল ক্র অধিক মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ইত্যা সমস্তই সমবায় সংগঠনের দ্বারা সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পা পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সমবায় সংগঠনই সংরক্ষি করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত বিশে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহারাও মত প্রকাশ করিয়াছে কুটির ক্ষুদ্র শিল্পকে পুনঃসঞ্জীবিত ও সংরক্ষিত করিতে হইলে সমবায় সংগঠন ভিন্ন অন্য কো উপায় নাই। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ প্রসারসাধনের জন্য সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।* এ-সম্পা কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

কিভাবে সমবায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সহায়তা করিতে পারে

বর্তমানে ভারতে যে-সমস্ত দিকে শিল্প-সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে তাহ মধ্যে বয়ন শিল্পই প্রধান। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১১ হাজার শি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৬ হাজা উপর। তন্তুবায় সমিতি সমবায়িক আন্দোলনে মাদ্রাজই প্রথ স্থান লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবংগ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্য রাজস্থান ও কেরালা রাজ্যেও তন্তুবায় সমিতিগুলিও মোটামুটিভাবে সক্রিয়।

শিল্প-সমবায়ের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির প্রাধান্য

* Second Five Year Plan--২২৯ ও ৪৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা এবং First Five Year Pl (A Summary)—অষ্টম অধ্যায়।

অন্যান্য রাজ্যে এই আন্দোলন যে বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই তাহার কারণ হইল, কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক সমিতিসমূহের কার্যের সমন্বয়সাধন, কাঁচামাল সররাহ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান নাই, আর যে সমস্ত রাজ্যে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয় না। উৎপাদন ও বিক্রয়করণ পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে অন্য কোন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

এই আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ না করিবার কারণ

(গ) সমবায় ও ভোগ্যপণ্য ক্রেতা (Co-operation and the Consumer): ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে সমবায় বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইল ব্যবহার্য দ্রব্য সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা। ইহাতে খাঁটি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং প্রতারণার হাত এড়ান যায়।

ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমিতি অতি সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছিল। যুদ্ধাবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বহু দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়ে; চোরা কারবার আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এমত অবস্থায় সরকার এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সমবায় সমিতির হাতে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বণ্টনভার অর্পণ করে। ফলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী সমবায় সমিতি ও সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এবং উহাদের ব্যবসায় আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে। এই প্রসার ১৯৫০-৫১ সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ইহার পর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইলে ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহকারী সমবায় আন্দোলনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। সমিতিগুলিকে তখন সংগঠিত ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হয়। জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া যাওয়ায় অসুবিধা আরও প্রকট হইয়া উঠে। অনেক সমিতিই এই নূতন অবস্থার চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। অবশ্য যেসব সমিতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিয়াছিল তাহারা নূতন দিকে ব্যবসা প্রসার করিয়া টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আসাম ও মাদ্রাজেই ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সুসংগঠিত। ঐ দুই রাজ্যে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হইয়াছে। তবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই বলা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র ভারতে ক্রেতা সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৮,০৭৭ এবং ইহাদের পণ্য বিক্রয়ের মূল্য ছিল মাত্র ৪৪½ কোটি টাকা।

ক্রেতা সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই

ভারতের ভোগ্যদ্রব্য ক্রেতা সমিতিগুলির অসফলতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি রহিয়াছে: (১) সমিতির প্রতি সদস্যদের আনুগত্যের অভাব; (২) সুদক্ষ পরিচালনা ও

যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাব; (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগ; (৪) নগদ দামে এবং সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় সীমাবদ্ধ করিবার নীতি প্রতিপালনে উপেক্ষা।

(ঘ) **সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা (Co-operative Marketing):** ভারতে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি এবং এই সকল ত্রুটি দূরীকরণে সমবায়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপযোগিতা সত্ত্বেও সমবায়িক কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা এখনও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তবে সম্প্রতি এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।* বর্তমানে সকল প্রকারের বিক্রয়করণের সমিতির মোট সংখ্যা ২ হাজারের কিছু বেশী হইবে। ইহার মধ্যে ২ হাজারের কিছু অধিক বিক্রয়করণ ইউনিয়ন ও ফেডারেশন (Marketing Unions and Federations) এবং বাকীগুলি প্রাথমিক বিক্রয়করণ সমিতি (Primary Marketing Societies)। কয়েকটি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য বিক্রয়করণ সমিতিও (State Marketing Societies) আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকার বিক্রয়করণ সমিতির বিক্রীত পণ্যের মূল্য ছিল ১২ কোটি টাকার উপর।

সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার সামান্য প্রসার

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু সমিতি, বোম্বাই রাজ্যের তুলা সমিতি, বিহার রাজ্যের ইক্ষু সমিতি ও মাদ্রাজের তামাক সমিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে ফল ও শাকশব্জি বাজারিকরণের জন্য কিছু কিছু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতি

মাদ্রাজের সমবায়িক বিক্রয়করণ আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 'নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা' (Controlled Credit Scheme)। এই পরিকল্পনা অনুসারে কৃষকদের প্রয়োজনমত কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণদান করা হয় এবং ঋণ পরিশোধ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত করা হয়। ঋণ গ্রহণের সময় কৃষককে এই চুক্তি করিতে হয় যে, স্থানীয় প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে তাহাকে পণ্য বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সমিতির পাওনা কাটিয়া রাখিয়া বাকী অর্থ কৃষককে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা যে বিশেষ সফলতা অর্জন করিয়াছে ইহা বলা যায় না।

মাদ্রাজের নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা ও বিক্রয়করণ

সমবায় বিক্রয়করণ আন্দোলন প্রসার না হইবার কতকগুলি স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কচ্যুতভাবে বিক্রয়করণ আন্দোলনকে সফলকাম করা যায় না।

---

* ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ

াদকের হাত হইতে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছান পর্যন্ত যে-সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে ইহাদের সমস্তগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের উন্নতিসাধন, অধিকতর পরিমাণে অর্থসাহায্য, গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পূর্বে মস্ত প্রক্রিয়ার (processing) প্রয়োজন তাহা সমবায় পন্থায় সংগঠিত করা, সুদক্ষ চালনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমবায়িক বিক্রয়করণকে সফল করিয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। সরকারকেও আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে । তত্ত্বাবধান, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা, সমিতির মূলধনের যোগান প্রভৃতির ায্য সরকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে।

নতার কারণ

১৯৫৪ সালের সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে ত সুপারিশ করে। কমিটির মতে, ( ) প্রাথমিক ও অন্যান্য পর্যায়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা বা উহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে। (২) বিক্রয়করণ ইউনিয়ন বা ফেডারেশনগুলিকে হয় আঞ্চলিক আর না হয় পণ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। (৩) প্রাথমিক ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিবে। (৪) সমবায় য়করণ সমিতির মাধ্যমেই পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে এই সর্তে ঋণদান করা হইবে। সমস্ত প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির শেয়ার মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ কারকে যোগান দিতে হইবে।

য় বিক্রয়করণ সব ভারতীয় ঋ জরিপ টির সুপারিশ

কমিটি আরও সুপারিশ করে যে বিভিন্ন সমবায়িক কাজকর্মের, বিশেষত বিক্রয়- ব্যবস্থার, সুপরিকল্পিত প্রসারসাধনের জন্য একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ বোর্ড' (a National Co operative Development and archousing Board) থাকিবে। ইহা ব্যতীত পণ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের ও ত বাজার পরিচালনার জন্য একটি 'সর-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান' (an All dia Warehousing Corporation) এবং রাজ্যগুলিতে 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ পানী' (State Warehousing Companies) থাকিবে। বড় বড় গ্রামগুলিতে য় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় য়িক উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ডের পরিচালনাধীন 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল' National Co-operative Development Fund) এবং 'জাতীয় গুদামঘর ন তহবিল' (National Warehousing Development Fund) নামে টি তহবিল সৃষ্টি করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে বিক্রয়করণ ও অন্যান্য র্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে পারে র জন্য বোর্ড জাতীয় সমবায়িক তহবিল হইতে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান

করিবে। আর জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে বোর্ড সর-ভারতীয় গুদাম প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য গুদামঘর কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া ভার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (The State Bank of India) বিক্রয়করণ সমবায়িক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিবে।

সাধারণভাবে উপরি উক্ত সুপারিশগুলি সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃ হয়। সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অংগীভূত করিয়া গ্রাম্য ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্র করা হয়। জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল এবং জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিক তহবিল গঠন করা হয়, কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন দ্বারা বো পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, বিভিন্ন রাজ্যও পণ্য সংরক্ষণা স্থাপনের দ্বারা কার্যে অগ্রসর হয়। এ-সম্পর্কে কৃষি-ঋণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যব প্রসংগে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।*

(ঙ) **সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি** (**operative Housing Societies, Co operative Insurance Societies**

উপরি উক্ত ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতে কিছু কিছু সমবায় গৃহনির্মাণ সমি সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি আছে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি বাস্তুহারাদের সাহায্য করি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু বর্তমানে ইহারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারলাভ করিতেছে।

সমবায় বীমা আন্দোলন এ পর্যন্ত যতটুকু প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা জীবন ও বীমাতেই সীমাবদ্ধ, এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবংগ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ কয়েকটি রাজ্যে মাত্র বীমা সমিতিগুলি অবস্থিত। সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে বীমা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে ৩০টি সমবায় বীমা সমিতি ছিল।

অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান

সমবায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের প্রকাশ হিসাবে উন্নততর জীবনযাপন স (Better Living Societies), স্বাস্থ্য সমিতি এবং চিকি সাহায্য সমিতি (Health Societies and Medical Societies), শিক্ষা সমিতি (Educational Societies) প্রভৃ উল্লেখ করা যায়। এই সকল সমিতিও অল্প সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি (Multi-purpose Co-operative Societies) : কিছুদিন পূর্বে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার দি বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির দিকে এই প্রবণতার মূ মতবাদ ও প্রয়োজনীয়তা—উভয়েরই প্রভাব ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ অভি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য জীবনের সমস্যা একমাত্র ঋণপ্রদানের সাহায্যেই সম

* ১৩৮ এবং ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

রা যায় না। গ্রামবাসীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অংগাংগিভাবে জড়িত বলিয়া ঋণদান সমিতি তাহার কার্য কেবলমাত্র ঋণদানে সীমাবদ্ধ রাখিয়া গ্রাম্য জীবনের কোন বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং সমবায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে যাহাতে সমিতি গ্রামবাসীর আর্থিক জীবনের সমস্ত দিক তো বটেই, সম্ভব হইলে মাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকেরও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সমিতির দ্দেশ্য সম্পর্কে এই মতবাদের সহিত যোগ হয় যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি বায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বণ্টন-ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা। যুদ্ধকালীন ও দ্ধোত্তর অবস্থায় বহু সমিতিই খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি বণ্টনের ভার গ্রহণ র।

উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতি ষ্ঠার দিকে ঝোঁক

যে সকল কমিশন ও কমিটি বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছে হার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ, সমবায় সম্পর্কিত মাদ্রাজ কমিটি (১৯৪০), কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটি এবং সমবায় পরিকল্পনা কমিটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমবায় পরিকল্পনা কমিটির মতে, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে এমনভাবে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত রিতে হইবে যে যেন উহারা সভ্যদের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির কেন্দ্র হিসাবে য় করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমিতিগুলিকে—(১) শস্য উৎপাদনের জন্য অর্থ-হায্য করিতে হইবে, (২) উৎপন্ন শস্য নিকটতম সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতির ধ্যম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৩) সার, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি এবং পড়, লবণ, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈলের মত ভোগ্যপণ্য চাষীকে সরবরাহ করিতে বে· (৪) নিকটতম ডেয়ারীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিতে বে, (৫) সভ্যগণের ব্যবহার্য কৃষিযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং (৬) সর্বতো-ভাবে তাহাদের আয়বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

প্রকার সমিতি র্তনের সুপারিশ

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই ধান:

(১) গ্রাম্য মহাজন কেবল ঋণের কার্যই করে না, সে ব্যবসায় পরিচালনাও করে। ঋণগ্রহণ ব্যতীত কৃষক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাহার নিকট যায়। সুতরাং মহাজন বা সাহুকারের হাত হইতে চাষীদের রক্ষা করিতে হইলে সমবায় সমিতিকে ঋণদান ব্যতীত ক্রয়বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন রিতে হইবে।

ক্ষ যুক্তি: এইরূপ সমিতি কে মহাজনের হইতে রক্ষা করে

(২) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি তাহার সভ্যদের নিকট হইতে আনুগত্য ও সহযোগিতা তে পারে না—কারণ যতদিন পর্যন্ত ঋণ পাইবার আশা থাকে ততদিন পর্যন্তই তাহারা

সমিতিতে থাকে। অপরপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি সভ্যদের সহিত প্রতিনিয়ত সম্ব স্থাপন এবং বিভিন্ন দিকে তাহাদের প্রকৃত উপকারসাধন করে তাহাদের নিকট হইতে অধিকমাত্রায় আনুগত্য পাইতে সমর্থ হ সুতরাং সমিতিগুলিকে বহু উদ্দেশ্যমুখী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

২। ইহা সভ্যদের অধিক আনুগত্য পাইতে সমর্থ হয়

(৩) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে ব্যয়সংক্ষেপ এবং সুদক্ষ পরিচালনা নিশ্চি করা যায়। কারণ, সমিতির আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কর্মপরিধি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বলিয়া কর্ম-পরিচালনার বেতনভুক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

৩। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ ও সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হয়

(৪) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠার ধারণা সর্বতোভাবে কার্যকর করি হইলে কৃষকের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কিত যতগুলি সমস্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইভাবে ভার সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করা অসম্ভব বলিলেও চলে। অ না হইলেও এই ব্যবস্থা দ্বারা শক্তি ও সংগতি অপচয় করা হই

৪। বহু সমিতি গঠন অপচয়মূলক

(৫) কৃষকের সর্বাংগীণ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ কৃষকের শিক্ষাদীক্ষা নাই, তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ জীবনযাত্রার উন্নয়ন করিবার প্রেরণা সে কোথাও হইতে পায় না। এই অবস্থায় ত বিভিন্ন ধরনের সমিতির সদস্য হইবার জন্য উৎসাহিত করা বি কঠিন। সে একই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার বিভিন্ন প্র মিটাইতে চায় এবং গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে এই সু পাইতে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু উদ্দেশ্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষকের একাধিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতে হই

৫। অজ্ঞ রক্ষণশীল কৃষককে একসংগে বহু সমিতিতে যোগদান করান কষ্টকর

(৬) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির বিভিন্ন প্রকারের কার্য কোন এক দিকে ক্ষতি হইলে তাহা অন্যান্য দিকের লাভের দ্ পূরণ করা সম্ভব হয়।

৬। ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও অল্প

(৭) ঋণদান সমিতিগুলির কার্য সীমাবদ্ধ হওয়ায় অনেক ক্ষে ইহারা নিষ্প্রাণ। ইহাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা আনয়ন প্রাণ সঞ্চারিত করিবার উপায় হইল ইহাদের বহু উদ্দেশ্য করিয়া তোলা।

৭। ঋণদান সমিতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সম্ভাবনা

(৮) বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির আর একটি সুবিধা হইল যে, ইহার শক্তি ও স অধিক হওয়ায় ইহা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি বহু-উদ্দেশ্যসাধক স গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পা সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিই হইল গ্র জীবনের সংস্কারসাধনের উপযুক্ত সংস্থা।

৮। ব্যাপক গ্রাম্য জীবনের সমস্যার সমাধান

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রবর্তনেব বিপক্ষেও অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালেব কৃষি সম্পর্কিত বাজকীয় কমিশন (Royal Commission of Indian Agriculture) তাহাব বিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশ করে: "নীতিব দিক হইতে এক-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতিই হইল শ্রেষ্ঠ, এক একটি কবিয়া কার্য কবাই সমীচীন পন্থা।" ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিবও অবতাবণা কবা হইয়া থাকে: (১) ঋণদান সমিতিব কার্য পবিচালনা কবা যত সহজ এবং উহাব নীতিগুলি যত সহজবোধ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিব কার্য তত সহজসাধ্য নয়; নীতিও গ্রামবাসীদেব পক্ষে সহজবোধ্য নয়। উপবন্তু, সুদক্ষ পরিচালকেব অভাবও রহিয়াছে।

পক্ষে যুক্তি: বিপক্ষে যুক্তি

পরিচালনা সহজসাধ্য নয়

(২) একই সমিতিব পক্ষে একাধিক কার্য সম্পাদন কবিবার বিপদও আছে। এক দিকেব ব্যর্থতা অন্যান্য দিকেব কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পাবে।

এক দিকের ব্যর্থতার বিপদ

(৩) আবাব বলা হয় যে, ঋণদান সমিতিব অর্থ যোগান এবং সভ্যদেব পাবস্পবিক তত্ত্বাবধানেব জন্য প্রয়োজন হয় অসীম দায়িত্ব, কিন্তু অ-ঋণদান কার্য পবিচালনাব জন্য প্রয়োজন হয় সসীম দায়িত্ব। বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে এই দুই এব মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান কবিয়া চলা কঠিন। অবশ্য বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি গঠনেব জন্য সকল ক্ষেত্রেই সসীম দায়িত্বেব ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়।

ঋণদান ও অ-ঋণদান কার্যের সমন্বয়ের সমস্যা

(৪) বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতিব কর্মক্ষেত্র একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ফলে সদস্যরা একে অপবেব খববাখবব জানিবে সমবায়েব এই নীতি পালন কবা সম্ভব হয় না।

পারস্পরিক জানাশোনার অসুবিধা

এই প্রসংগে সব ভাবতীয় গ্রাম্য ঋণ জবিপ কমিটি যে মতামত প্রকাশ কবিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। কমিটিব মতে, সমবায়-ব্যবস্থা যদি কেবল ঋণদান কার্য লইয়াই পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ইহাব কোন সম্ভাবনা নাই, এমনকি উহা ঋণদান কার্যেও সফলতা অর্জন কবিতে পাবিবে না। সুতবাং সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত কবিতে হইবে। কিন্তু ইহাব অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি সমবায়িক প্রতিষ্ঠানকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত কবিতে হইবে। প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলিকে অন্যান্য বিশেষ ধবনেব কার্য যথা বিক্রয়করণ প্রভৃতি কায গ্রহণ কবিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ ধবনেব কার্যেব জন্য বিশেষ ধবনের সমিতি থাকিবে। ঋণদান এবং অন্যান্য কার্যের মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয়সাধনেব ব্যবস্থা কবা হইবে। যে সমস্ত অ-ঋণদান কার্যে যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি বহিয়াছে তাহাব দায়িত্ব প্রাথমিক সমিতিগুলিব পক্ষে গ্রহণ কবা সমীচীন নয়। যে-সকল অ-ঋণদান কার্য প্রাথমিক সমিতি অতি সহজেই

সারা ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অভিমত

দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে তাহার দায়িত্বই শুধু সমিতি গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ বীজ, সার, কৃষি, যন্ত্রপাতি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের বণ্টন সহজেই প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যেখানে কোন সমিতি একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে দক্ষতা দেখাইয়াছে সেখানে উহার সম্ভাবনা অপরিমেয়। কিন্তু, কমিটির মতে, সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটি সমিতিকে নহে। এখানেও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় কর্মীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং বিপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং সরকারী সাহায্য লইয়া ঋণদান ছাড়া বাজারিকরণ, সমবায়িক চাষ প্রভৃতি সমবায়িক কাজকর্ম আরম্ভ করা সমীচীন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার যে সাড়া পড়ে যুদ্ধোত্তর যুগেও তাহা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এইরূপ সমিতি ও সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৬ হাজার এবং ৩৪৪ লক্ষ। ১৯৫১-৫২ সালে সমিতি ও সভ্যসংখ্যা বর্ধিত হইয়া যথাক্রমে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ হাজার এবং ২১ লক্ষের উপর। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজস্থান, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গেই এই ধরনের সমিতি অধিক প্রসারলাভ করে। তাহার পর হইতে অবশ্য বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতি স্থাপনে মন্দার সূচনা দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুসারে সরকার সমবায়ের ঋণদানকার্যের সহিত বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংযুক্ত করিলেও ঠিক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। ফলে এই প্রকার সমিতির আর বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায় না।

বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রসার

গতি পরিবর্তন

যাহা হউক, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই বলা চলে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং বিভিন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে রাজস্থানের মাত্র কয়েকটি সমিতি ছাড়া অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক নহে।* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দলও (Study Team) এই উক্তি করিয়াছে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি প্রকৃত ক্ষেত্রে ঋণদান ছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন করে না।**

এই আন্দোলন একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

* Sir Malcolm Darling—"Certain Aspects of Co-operative Movement in India" 1958.

** Report of the Team for Study of C. D. P. and N. E. S.. ৮৬ পৃষ্ঠা।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করা যায় না। তবে বর্তমানে যে সমবায় সেবা সমিতি (Service Co-operatives) গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা এই বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিরই ন্যায়।* সুতরাং পরিবর্তিত আকারে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি অন্তত কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

।২

জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) : কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী ঋণদান বা মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদানের (medium-term loan) ব্যবস্থা করিলেই চলে না ; তাহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের সুব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যতীত সে তাহার পূর্বতন ঋণের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং জমির স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির পক্ষে এই সমস্ত কাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করা সম্ভব নয়। কারণ, উহাদের কার্যকরী মূলধন সংগৃহীত হয় স্বল্পমেয়াদী আমানত বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী ঋণ হইতে। ইহা ব্যতীত জমিজমার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিতে হইলে জমির মূল্য বা মালিকানাস্বত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি কাজের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু স্বল্প সংগতিসম্পন্ন প্রাথমিক সমিতির পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংকের মত বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জমি বন্ধকের ভিত্তিতে কৃষকগণকে দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদান করা। বর্তমানে জমির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়ায় জমির স্থায়ী উন্নতিসাধনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে। ফলে জমিবন্ধকী ব্যাংকের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

[margin: ...মেয়াদী ঋণ ও ...বন্ধকী ব্যাংকের ...য়োজনীয়তা]

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি তিন ধরনের হয়, যথা, সমবায়িক (co-operative), বাণিজ্যিক (commercial) ও আধা-সমবায়িক (quasi-co-operative)। পুরাপুরি সমবায়িক ব্যাংকগুলি সমবায়িক নীতির উপর ভিত্তিশীল এবং ক্ষুদ্র কৃষক ও জমির মালিকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয় ; আর্থিক সংগতি অধিক থাকায় ইহারা জমির বড় বড় মালিকদের ঋণপ্রদান করিতে সমর্থ হয়। আধা-সমবায়িক জমিবন্ধকী ব্যাংক সমবায়িক নীতি অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত ব্যক্তিসংঘ হইলেও, যাহাতে প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ সম্ভব এবং ব্যাংকের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য ঋণগ্রহণেচ্ছু নহে এমন কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তিকেও সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ভারতে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাংকের সংখ্যাই অধিক।

[margin: ...প্রকার জমিবন্ধকী ...ংক]

---

* ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বর্তমান অবস্থা (Present Position) : জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রথমে পাঞ্জ সংগঠিত হইলেও সার্থকভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয় মাদ্রাজে। যাহা হউক, ভারতে জ বন্ধকী ব্যাংক সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত মাত্র ১২টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল এবং প্রাথমি জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল মাত্র ৩২৬টি। প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শতক ৭৪ ভাগের মত অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূর—এই ৩টি রাজ্যে অবস্থিত

জমিবন্ধকী ব্যাংকের অতি সামান্য প্রসার ও আঞ্চলিকতা অত্যধিক

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির সদস্যসংখ্যা ৯০.৭ হাজা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৬.৫ হাজারে দাঁড়ায় এবং ঋণপ্রদানের পরিমা ২.৮৩ কোটি টাকা হইতে ৩.৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। বিক্রী ডিবেঞ্চারের মূল্যও ১৪.৯৪ কোটি টাকা হইতে ১৬.৯৫ কো টাকায় পরিণত হয়।

তবে দিন দিন সম্প্রসারণ ঘটিতেছে

প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের সভ্যসংখ্যা ১৯৫৫ ৫৬ সালে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার হই বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩ লক্ষ ৩৩.৫ হাজারের কিছু অধিক হয়। ইহার ঋণপ্রদানের পরিমাণ এই দুই বৎসরের মধ্যে ১.৭৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পা ২.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, জমির উন্নয়ন, নূতন জমি ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জমিবন্ধ ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদান করিলেও ঋণ প্রধানত পূর্বতন পরিশোধের জন্যই দেওয়া হয়। অবশ্য সম্প্রতি কতি রাজ্যে জমির উন্নতিসাধন, কূপ খনন, ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

ত্রুটি :
১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণশোধের উদ্দেশ্যে ঋণদান

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদানের সুদের হার অত্যধিক। ১৯৫৬-৫৭ সা প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির সুদের হার শতকরা ৫½ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য ছিল। একমাত্র বোম্বাই রাজ্যে মাত্র কতিপয় উদ্দেশ্যে শতকর টাকা সুদে ঋণপ্রদান করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্য প্রদত্ত ঋণের সুদ উচ্চ এবং ইহার উপর প্রাথমিক ব্যাংকগু ঋণদানের সময় সুদের হার আরও চড়াইয়া দেয় বলিয়াই সুদের হার এই অত্যধিক হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাংকগুলির পরিচালনা ব্যয় যথেষ্ট বলিয়া সুদের হ অধিক করিতে হয়।

২। ব্যাংকগুলির সুদের হার অত্যধিক

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কার্যকরী মূলধনের মধ্যে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অত অল্প। সুতরাং ব্যাংকগুলিকে ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং সরকার ও অন্যান্য সূত্র হইতে গ্রহণ করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিবেঞ্চা মূলধন সংগ্রহের সর্বপ্রধান সূত্র। ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধ ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধন ২১.৩২ কোটি টাকার ম ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ১৬.৫ কোটি টাকা। ঐ সালে প্রাথমিক ব্যাংকগু

৩। নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অত্যল্প

কার্যকরী মূলধন ১২.৭০ কোটি টাকার মধ্যে ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১.৩২ কোটি টাকা। ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ সংগ্রহ করে এবং প্রাথমিক ব্যাংকগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের জন্য কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

যাহাতে জমিবন্ধকী ব্যাংকের ডিবেঞ্চার অধিক বিক্রয় হইতে পারে তাহার জন্য সরকার সুদ এবং আসল টাকা সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার হইতে এইভাবে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব হইতে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ডিবেঞ্চারের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া ক্রয় করিয়া সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগানের ব্যবস্থা করিতেছে।

এই ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি আবার 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural debentures) বিক্রয় করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে গ্রাম উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার প্রচেষ্টাও চলিতেছে। ১৯৫৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক আহূত সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারগণ এবং কতকগুলি জমিবন্ধকী ব্যাংকের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি দুই শ্রেণীর 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural debentures) বিক্রয় করিবে। প্রথম শ্রেণীর গ্রাম্য ডিবেঞ্চার ৭ বছর মেয়াদী হইবে এবং ইহাদের সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় করা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য ডিবেঞ্চার হইবে ১৫ বৎসর মেয়াদী এবং উহা রিজার্ভ ব্যাংক ক্রয় করিবে; ইহাদের সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর ও সৌরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' বাজারে ছাড়িয়াছে। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়োপযোগী ৭ বৎসর মেয়াদী গ্রাম্য ডিবেঞ্চারের উপর সুদের হার হইল শতকরা ৪½ হইতে ৫ টাকা আর রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট যে ১৫ বৎসর মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইবে তাহার সুদ হইল শতকরা ৪ টাকা।*

গ্রাম ডিবেঞ্চার পরিকল্পনা

ঋণপ্রদান সম্পর্কে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ঋণ মঞ্জুর করিতে অযথা বিলম্ব করে। অবশ্য জমির মূল্য নির্ধারণ এবং স্বত্বের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য ঋণদানে কতকটা দেরী হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু চেষ্টা করিলে বেশ কিছু পরিমাণে সময়সংক্ষেপ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, স্বল্প পরিমাণ ঋণদানে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে অনিচ্ছুক দেখা যায়। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী এইরূপ ব্যাংকের সাহায্য

৪ ঋণদান সম্পর্কে ত্রুটি

* Reserve Bank Bulletin, July 1959.

হইতে বঞ্চিত হয়। পরিশেষে, জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের কার্যের মধ্যে কোন রকমের সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা নাই।

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির উন্নয়নের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেঃ (১) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক থাকিবে। (২) ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে যোগান দিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির জমির উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ঋণদান করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে।

জমিবন্ধকী ব্যাংক সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

(৫) বিভিন্ন মেয়াদের ঋণদানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবে। যাহাতে এইগুলির বিক্রয়ের পথ সুগম হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (The State Bank of India) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (৬) রিজার্ভ ব্যাংক নিজেও নির্দিষ্ট ধরনের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে। (৭) সরকার ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা সম্বন্ধে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া, জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করিয়া, ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিষ্ট্রারি করিবার ফী হইতে অব্যাহতি দিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে।

রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলন (The Reserve Bank of India and the Co-operative Movement): সমবায় আন্দোলনের সহিত রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিগত ঋণের সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের সার্থকতা কোথায়? এই কারণেই রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং যুক্তিসংগতভাবেই কার্য করা হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতেছে

রিজার্ভ ব্যাংক নানাভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারে। ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত উহা নিম্নলিখিতভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পারিত:

প্রথমত, 'সময়োচিত কৃষিগত কাজকর্ম' ও শস্য বিক্রয়করণ ব্যাপারে অর্থসাহায্যের জন্য যে-সমস্ত হুণ্ডি বা প্রতিশ্রুতিপত্র (promissory notes) প্রস্তুত করা হইত এবং যাহা ৯ মাসের মধ্যে প্রদেয় ছিল এইরূপ বিল বা হুণ্ডির পুনর্বাট্টা অথবা উহাদের ভিত্তিতে রাজ্য ব্যাংকগুলিকে ঋণদান করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের ছিল। সরকারী

১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা

ট্রাস্টী-সিকিউরিটির ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে স্বল্পমেয়াদী দান করিতে পারিত। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি-ত্রর ভিত্তিতেও ঋণদান করিতে পারিত। কিন্তু এই প্রমিসরি নোটের সহিত পণ্যের স্বত্ব ক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করার প্রয়োজন হইত।

১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ংকের ঋণপ্রদান করিবার এই ক্ষমতা বর্ধিত করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের দুইটি সংশোধনের প্রথমটি অনুসারে প্রকৃত ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত সম্পর্কিত হুণ্ডি বা প্রমিসরি নোট ক্রয়বিক্রয় ও পুনর্বাট্টার ব্যাপারে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক তপশীল ব্যাংকের মতনই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। দ্বিতীয় সংশোধনের দ্বারা সময়োচিত কৃষিগত জকর্ম ও শস্য বিক্রয়করণের জন্য ঋণদানের মেয়াদ ৯ মাস হইতে বাড়াইয়া ১৫ মাস হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংক
ক সমবায় প্রতি
ক ঋণপ্রদানের
তাবৃদ্ধি

১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা মিশ্র কৃষিকার্য ও শস্য বিক্রয়করণোপযোগী করিবার ...সমূহের (processing) জন্যও ঋণদান করা রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। ...শিল্প, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণ সম্পর্কিত কার্যেও ঋণদানের ...স্থ করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংককে রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিতে ...কার্যের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ...নের মেয়াদ ১৫ মাসের কম এবং ৫ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

উক্ত সংশোধন ব্যতীত ঋণদান কাজকর্ম অধিক প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পদ্ধতিগত পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। আবার যাহাতে সমবায় ব্যাংকগুলি উপরি-উক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সমগ্র সমবায় আন্দোলন, বিশেষত রাজ্য সমবায় ব্যাংকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সংস্কার অনুমোদন করে। ইহার ফলে কয়েকটি রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদের ...পারেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলিকে সুবিধা দান করে। ইহা 'ব্যাংক রেট' (Bank Rate) অপেক্ষা শতকরা ২ টাকা কম হারে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ...দান করিয়া থাকে।*

রিজার্ভ ব্যাংকের
...িত উন্নয়ন

সুদের ব্যাপারে
...য় প্রতিষ্ঠান-
...কে সুবিধা প্রদান

দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উহাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural deben-

জমিবন্ধকী
...র ডিবেঞ্চার
...াদি

*...মানে 'ব্যাংক রেট' শতকরা ৪ টাকা, কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের হার শতকরা ২ টাকা মাত্র।

tures) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাং 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' ক্রয় করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে।

অন্যান্যভাবেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় আন্দোলনে স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা কর রিজার্ভ ব্যাংকের যে কৃষি-ঋণ বিভাগ আছে তাহার কার্য হইল কৃষি-ঋণ সং সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা এবং সরকার ও স সমবায় প্রতিনিধিগুলিকে পরামর্শপ্রদান করা। ইহা ছাড়া রি ব্যাংকের কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত কার্যাদি এবং রিজার্ভ ব্যাংকের স রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সম্বন্ধের সমন্বয় করিবার দায়িত্বও বিভাগের উপর ন্যস্ত। আবার সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যের জন্য কৃষিগত ঋণ সংক্রান্ত স কমিটি (a Standing Advisory Committee on Agricultural Cre নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৫। রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ কর্তৃক নানাপ্রকার সহায়তা

রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্যোগেই আবার কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা কমিটি (Cent Committee for Co-operation Training) গঠন পুণায় সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ (Co-operative Colle প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার উপর পাঁচটি আঞ্চলিক স শিক্ষাদান কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। সমবায় কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা

১৯৫১ সালে গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি স করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সর্ব ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিয়োগ ক ১৯৫৪ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত করিবার জন্য কতক সুদূরপ্রসারী সুপারিশ করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সুপারিশস কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কে কমিটির কয়েকটি উল্লেখ সুপারিশ হইল এইরূপ: (১) সমবায়িক ঋণদান প্রতিষ্ঠান সমন্বয় ও পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যাপারে রিজার্ভ ব রাজ্য সরকারগুলির সহিত সহযোগিতা করিবে। যা সরকারগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠান শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক 'জাতীয় কৃ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' [National Agricultural Credit (Long Operations) Fund] নামক যে অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করা হইবে তাহা হইতে রাজ্য সরকারগুলিকে ঋণদান করিবে। (২) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের মাধ্যমে রি ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করিয়া যাইবে। অবশ্য রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদে মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। এ উদ্দেশ্যে 'জাতীয় কৃষি ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল' [National Agricultural Cred

রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি

abilisation) Fund] নামক অপর একটি তহবিলের সৃষ্টি করিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিতেও হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় ডিবেঞ্চার ক্রয় দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। এক্ষেত্রেও আসল এবং সুদের টাকা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে গ্যারান্টি দান করিতে হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই তহবিলের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।* 'জাতীয় কৃষি ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল'ও স্থাপিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে অর্থপ্রদান করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করিতে পারে। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি টাকা।

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন (The State and Co-operation):

ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন ও প্রসার উভয়ই হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সমবায়ের ক্ষেত্রে যে-যৎসামান্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা। অনেকে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত ভারতীয় অবস্থায় সমবায় আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই প্রসংগে সমবায়িক পরিকল্পনা কমিটির অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন যে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই তাহার একটি প্রধান কারণ হইল রাষ্ট্রের 'নিষ্ক্রিয় নীতি'। বর্তমানে যখন রাষ্ট্র পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিয়াছে তখন ইহা স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র গ্রাম্য জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবে। এইজন্যই রাষ্ট্র রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগিতায় আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইয়াছে

বিভিন্ন দিক দিয়া সরকার আন্দোলনকে সাহায্য ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথমত, সমবায় সমিতিগুলিকে পরিচালনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় দপ্তরের অধীনে বহু কর্মচারীর ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প সুদে ঋণদান করিয়া সাহায্য করে।

রাষ্ট্র কিভাবে সহায়তা করে

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমবায়িক ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের জন্য অর্থপ্রদান করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনকে সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে হইবে। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই উদ্দেশ্যেই 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্ট করা হইয়াছে।

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

চতুর্থত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার অর্থমঞ্জুর (subsi and grants-in-aid) করিয়া থাকে।

পঞ্চমত, যাহাতে অর্থসংগ্রহ বা ঋণসংগ্রহ সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য সরকার সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট ধরনের সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য কর যেমন, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ডিবেঞ্চার বিক্রয় ব্যাপারে সরকার সুদ ও আসল ট সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

ষষ্ঠত, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ; ধরনের আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনকে সংশোধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্য আইনের বিভিন্ন সংশোধন, রাজ্য সরকারসমূহকে সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনে নিয়োগের অনুমতি হইল এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইহা ব্যতীত সম আন্দোলন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঋণ পরি সাহায্য আইন (Debt Relief Acts) প্রবর্তন করা হয়, ঋণ পরিশোধ ব্যাপ সমবায় সমিতির দাবিকে অগ্রগণ্য করা হয়।

সপ্তমত, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান কা থাকে। যেমন, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয় কর, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজি করিবার ফী প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দান করিয়া থাকে।

অষ্টমত, রাজ্য সরকারগুলি সবক্ষণই সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্যবে করিয়া উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই কার্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দে বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ আলো চালাইয়া রাজ্য সরকারগুলির নিকট সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করে, এবং রাজ্য সরক সমূহ এককভাবে বা সম্মেলনের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া সম আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

পরিশেষে, সমবায়িক কর্মী শিক্ষাদানেও সরকার সাহায্য করিয়া আসিতেছে। শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এবং রিজ ব্যাংক এক সহযোগে সমবায়িক শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Centr Committee for Co operation Training) নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমি তত্ত্বাবধানে পুণার সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ প্রবীণ কর্মচারীদের শিক্ষাদান করিতে ইহার উপর উক্ত কমিটির নির্দেশে ৫টি আঞ্চলিক সমবায়িক শিক্ষাকেন্দ্র (Region Training Centres) এবং ৮টি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।* ভারত সরকার এ রিজার্ভ ব্যাংক উভয়েই এইজন্য অর্থসাহায্য করিয়া থাকে।

সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ পরিকল্পনা কমি সুপারিশ অনুধাবনযোগ্য। কমিটির মতে, সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বা

* ১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মূহের বিরুদ্ধে সফল করিয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। এই সহযোগিতার দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সমবায় আন্দোলন গ্রাম্য উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের স্বার্থে অব্যাহতভাবে কার্য করিতে রে। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারকে অংশীদার করিয়া (১) সমবায়িক ঋণ, (২) মবায়িক অর্থনৈতিক কাজকর্ম—যেমন, বিক্রয়করণ, (৩) গুদামঘর নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের ত সম্পর্কিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র শেয়ার মূলধন যোগানে রাজ্য া'কগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক ব্যা'কগুলিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ রিবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বেলায় সাধারণত সরকার মোট শেয়ার-মূলধনের তকরা ৫১ ভাগ অর্থ যোগান দিবে। সুপারিশগুলিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে হার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।*

ষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ম্য ঋণ জরিপ কমিটি

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের ম্পর্ক নিবিড়তরই হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডালিং-এর রিপোর্টের ফলে এই গতিতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সম্প্রতি আবার সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। পরিকল্পিত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা (Co-perative Farming) এবং সেবা সমবায় সমিতির (Service Co operatives) ভিত্তি হইবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

মান গতি

সমবায় আন্দোলনের সফলতা (Achievements of the Co-operative Movement): আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন করা হয় যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আন্দোলন কতখানি সফলতা অর্জন করিয়াছে, কতদূর দেশের উপকার সাধন করিতে মর্থ হইয়াছে এবং কতদূরই বা সমবায় নীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে রিয়াছে ?

যাহারা আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে গুণকীর্তন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে, নৈতিক শিক্ষার দিক দিয়া আন্দোলন বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছে। আর্থিক দিক সম্পর্কে বলা হয় যে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সহজলভ্য হইয়াছে। কৃষক বা সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে স্বল্প সুদে ঋণ পায় বলিয়া গ্রাম্য মহাজনও সুদের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে গ্রাম্য মহাজনের কচেটিয়া ব্যবসাকে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরাও মহাজনের শোষণের কবল ইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত চাষীদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভ্যাস প্রসারলাভ করিয়াছে। পূর্বতন ঋণের ভারও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পূর্বের

ন্দোলনের কার্যতার কথা

* ১৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

তুলনায় কৃষকদের ভোগের জন্য ঋণগ্রহণ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বৃ পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের ফলে তাহারা স্বল্প দামে যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্টতর বীজ সার ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমবায় পন্থায় সেচ-ব্যবস্থা, জমির সংহতিসাধন, কা কার্য সম্পাদন, গো-প্রজনন প্রভৃতির ফলে চাষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হইল সমবায়িক বিক্রয়করণ। ইহ ফলে চাষীরা মধ্যজীবীদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে এবং উপযুক্ত বাজার মূ পণ্যবিক্রয় করিতে পারিতেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু বিক্রয়করণ সমিতি, বোম্ব এর তুলা বিক্রয়করণ সমিতি এবং মাদ্রাজের ধান্য ও তামাক বিক্রয়করণ সমিতি বি দক্ষতার সহিত কায পরিচালনা করিতেছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও সম আন্দোলনের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষা করিবার নয়। হস্তবয়ন শিল্পে সমবায় আন্দো অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বল যে, সমবায় আন্দোলনের ফলে মামলা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি হ্রাস পা কৃষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি প্রসার কর করিয়াছে। হিসাবপত্র রাখা এবং প্রমিসরি নোটে সহি প্রদান ইত্যাদির প্রয়োজন দে দেওয়ায় শিক্ষার বিস্তারও হইয়াছে।

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হইবে যেন সমবায় আন্দোলন ভারতে আশাতীত সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা সম সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাদির দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে। এ একথা অনস্বীকার্য দেশের কোন কোন অংশে সমবায় আন্দে কিছুটা প্রসারলাভ এবং বিভিন্ন দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমবায় আন্দে উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই। সমবায়িক ঋণদান আন্দোলনের ব্যর্থতা দিক হইতে পরিলক্ষিত হয়।* (১) দেশের বহুস্থানেই সম আন্দোলন প্রসারিত হয় নাই। (২) যে সমস্ত স্থানে আন্দো প্রসারলাভ করিয়াছে সেখানেও বহুসংখ্যক কৃষক আন্দোল বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। (৩) যাহারা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যভুক্ত তাহা প্রয়োজনীয় ঋণের অধিকাংশই আসে সমবায় সমিতির বাহির হইতে---অর্থাৎ মহা ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের নিকট হইতে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে

ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ব্যাখ্যা করিয়া সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থা এইভাবে দেখান যাই পারে: (১) ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাব হইতে দেখা যায়, জনসংখ্যার মাত্র শতক ২৭ ভাগ লোক সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে; সমাজোন্নয়ন পরিকল্প

* Rural Credit Survey, Vol.—II.

পর্যালোচনাকারী দল দেখিয়াছিল যে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতেও শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত হয় নাই। (২) গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কৃষকদের মোট ঋণের মধ্যে সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ শতকরা ৩·১ ভাগ মাত্র। ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ মহাজন এবং গ্রাম্য ব্যবসাদার যোগান দিয়া থাকে। সুতরাং চাষীরা গ্রাম্য মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এই ধারণা করা ভুল।* (৩) সমবায় আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে চাষীদের নিকট হইতে স্বল্পহারে সুদ আদায় করা হইবে। এই বিষয়েও সমবায় আন্দোলন বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। ১৯৫৭-৫৮ সালের তথ্য হইতে দেখা যায় যে কতিপয় রাজ্যে সুদের হার ছিল শতকরা ১০ টাকার অধিক। মণিপুরে সুদের হার ছিল ২৪ টাকা এই প্রসংগে উক্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে সুদের হার শতকরা ৬½ অধিক হওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই।† (৪) আবার সমবায় সমিতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর। ঐ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণকারী দলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৯৫৮ সালে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলিরই ঋণদান ও অ-ঋণদান সমিতির মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ৩১ ভাগ ছিল অকার্যকর। অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা যে ইহা অপেক্ষা আশাপ্রদ নহে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। (৫) সমবায়ের নীতি অনুসারে ঋণদানের ভিত্তি হইল দিতে কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা। ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণদান করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে। সম্পত্তিকে ভিত্তি করার ফল দাঁড়াইয়াছে যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষীর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী চাষীরাই সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা উপকৃত হয়। (৬) এইজন্যই অনেক ঋণ উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করা হইতেছে কিনা তাহার দিকে নজর দেওয়া হয় না। ফলে চাষীদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা উপেক্ষিতই থাকিয়া যায়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল এই অবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছে যে কৃষকের ঋণগ্রহণ যোগ্যতা অপেক্ষা যে উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করা হইতেছে তাহারই যোগ্যতা অধিক বিচার করা উচিত—অর্থাৎ উৎপাদনশীল কার্যের জন্যই যথাসম্ভব ঋণপ্রদান করা উচিত। (৭) সমিতিগুলির নিজস্ব তহবিলের অপ্রতুলতা,

(Margin notes: ...র বিশ্লেষণ: ...জনসংখ্যার মাত্র ...রা ২৭ ভাগ ...য় আন্দোলনের ...সম্পর্কিত; কৃষি ঋণের মাত্র ...১ ভাগ আসে ...য় সমিতি হইতে; সুদের হার ...ধিক; ...নেক সমবায় ...অকার্যকর; ...সম্পত্তিকে ভিত্তি ...ঋণদান করা হয়; ...উৎপাদনশীলতার ...কে দৃষ্টি দেওয়া ...না; ...প্রধান ...)

* ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† Report of the Team for Study of C. D. P. and N. E. S – ৮৭ পৃষ্ঠা।

অনাদায়ী এবং দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের আধিক্য প্রমাণ করে যে সভ্যদের মধ্যে মি ব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করা সম্ভব হয় নাই এবং সমিতিগুলিতে তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট শিথিলতা রহিয়াছে গিয়াছে।*

(৮) 'প্রকৃষ্টতর ব্যবসা' (better business) নিশ্চিত করা সমবায় আন্দোলনে অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে কৃষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি : (ক) ঋণপ্রাপ্তি সুযোগ, এবং (খ) শস্য গুদামজাতকরণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকর ও বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপো অনুসারে এই সমস্ত কার্যে মহাজন, ব্যবসাদার বা কারখানাদারে তুলনায় সমবায় সমিতিগুলি এক-দশমাংশ উপকারও করিতে সং হয় না। অবশ্য সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধী বিক্রয়করণ সমিতির প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে।

৮। কৃষক সমিতি অপেক্ষা মহাজনের নিকট হইতে অধিক সাহায্য পায়

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতে সমবায় আন্দোলন 'প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টত ব্যবসা, প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন' ('Better Farming, Better Business, Bett Living') সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করি তুলিতে পারে নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বিশে প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষত শক্তিশা স্বার্থসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমবায় আন্দোলন যতটুকু ক করিতে সমর্থ হইয়াছে ততটুকুই প্রশংসনীয়। তবে সমবায়ের সম্ভাবনার দিক হইত বিচার করিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে।

উপসংহার : সমবায়ের কোন লক্ষ্যই সাধিত হয় নাই

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of Failure o the Co-operative Movement) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সম আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে অর্থনৈতি (economic) এবং অন্যান্য (non-economic) এই দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক ন এরূপ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয় : (১) প্রাথমি সমিতিগুলি অকাম্যভাবে ক্ষুদ্রাকারের এবং ইহাদের কর্মপরিধিও সংকীর্ণ। ফলে সমিতি কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সমব ব্যাংকগুলির আকারও ক্ষুদ্র। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভ জনক হয় না এবং সুদের হারও চড়া হয়। (২) কৃষি ঋণদা সমিতির অসীম দায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহ করিয়াছে। (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি বহু-উদ্দেশ্যসাধক না হওয়ায়, বিশে করিয়া ঋণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ না থাকায়, কৃষকের আর্থিক ও সামাজি

ব্যর্থতার কারণ : অর্থনৈতিক ও অন্যান্য

অন্যান্য কারণ :
১। ক্ষুদ্রাকার সমিতি
২। অসীম দায়

---

* Statistical Statements relating to Co-operative Movement for 1957—Prefatory Note.

নের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয় নাই। (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং প্রাথমিক সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব সমবায় আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা। কৃষি-ঋণ সংগঠন কমিটি (১৯৪৭) অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় এবং তাহাদের সহিত কার্য পরিচালনা অকাম্য ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে, অপরপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত স ীকে ঋণদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আবার রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং ীয় সমবায় ব্যাংকের মধ্যেও অনেক রাজ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়।

ঋণ ও বিক্রয়ের সমন্বয়ের অভাব

বিভিন্ন পর্যায়ের ের মধ্যে াগিতার অভাব

(৫) শিক্ষার অভাব এবং সমবায় নীতির শিক্ষাদানের অব্যবস্থাও সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। (৬) অনেকের মতে, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রসারে সরকারী উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপ বর্তমান থাকায় পশ্চিমী দেশের মত ভারতে সমবায় ন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। অপরপক্ষে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি ম• প্রকাশ করিয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে মন্দ গতির অন্যতম কারণ হইল রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় নীতি। (৭) অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব, সমবায় সমিতির কর্মচারীদের অসাধুতা, মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন এবং হিসাব-পরীক্ষার সুব্যবস্থার অভাব, সমিতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ঋণ আদায় সম্পর্কে তা প্রভৃতি।

শিক্ষার অভাব
সমবায় নীতির
দানের অব্যবস্থা

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

বিবিধ কারণ

উপরি-উক্ত কারণগুলি সমবায় আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত করিলেও ইহার মূলে রহিয়াছে আসলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ।

ীক ও
ক কারণ:

(১) প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্যের জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার রসন, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি, জমির মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থার দরকার হয়। এই সমস্ত কার্য সমিতির শক্তি বা আর্থিক সংগতির বাইরে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থসাহায্য ব্যতীত কোনটাই সম্পাদিত হইতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ায় সংগঠনকে যথোপযুক্তভাবে আর্থিক বা অন্যভাবে সাহায্য করে নাই। (২) পূর্বেই থ করিয়াছি যে, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা সম্ভব করিতে হইলে একদিকে যেমন ঋণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার পণ্য বিক্রয়যোগ্য-করণ (processing) বিক্রয় ও গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই দুইটি কার্যে মহাজন ও ব্যবসাদারের দ্বন্দ্বিতার সম্মুখে সমবায় সমিতিগুলি দাঁড়াইতে পারে না। এই দুর্বলতার অন্যতম

সরকারী
তার অভাব

সমিতির সংগতির
র

কারণ হইল সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্যের অভাব। (৩) পূর্বেই উ· দেওয়া হইয়াছে যে, জমি ঋণগ্রহণযোগ্যতা বিচারের ম· হওয়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী সমবায় সমিতির দ্বারা বিশেষ উ· হয় না এবং সমৃদ্ধ কৃষকশ্রেণীই সমবায় সমিতিগুলিতে প্র· বিস্তার করিয়া থাকে। (৪) কুটির ও সমবায় শিল্প · ব্যাপারেও ব্যবসায়ী ও মহাজনের অপ্রতিহত প্রতিকূলতা · রহিয়াছে। (৫) অনেক সময় পরিচালকবর্গ নিজেদের · সমিতিগুলিকে পরিচালিত করে। পরিচালনা আবার অনেক · ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিপত্তিশালী ধনী কৃষক অথবা মহাজনদের · থাকে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই বর্ণ বৈষম্য · বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে সমিতি পরিচালিত হয়।

৩। ঋণগ্রহণযোগ্যতা বিচারে ত্রুটি

৪। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও মহাজনদের অপ্রতিহত প্রভাব

৫। সমিতির স্বার্থান্বেষী পরিচালকবর্গ

(৬) নগরাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কো· গুলির নিকট সমবায় ব্যাংকগুলি অর্থসাহায্য চাহিয়া প· বলিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিকার্যকে লাভজনক · বলিয়া মনে করেন না।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী-গুলির সহানুভূতির অভাব

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Suggested Remedies) : ··

আন্দোলনের ব্যর্থতার এই আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যাহাতে স· ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের · যথাযথভাবে কার্য করিতে পারে সেইরূপ অনুকূল · অবস্থা সৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় সমবায় আন্দোলনকে · এই পন্থার মাধ্যমেই অধিক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিগণ · সমূহকে প্রতিহত করা সম্ভব হইবে। এতদিন যাবৎ সমবায়ের পুনর্গঠনের · চেষ্টা হইয়াছে তাহা কেবল ঋণদান ব্যবস্থার কাঠামোর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে · করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রাম্য সামাজিক · কাঠামোর দুর্বলতা বা সহর অঞ্চলের ব্যবসা ও অর্থযোগানের · সহিত সমবায়ের অসামঞ্জস্যের দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় · ফলে সমবায় গ্রাম্য জীবনের কোন প্রকৃত উপকারসাধন ক· পারে নাই।

গ্রাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় নাই।

ফলে সমবায় আন্দোলনও সফল হইতে পারে নাই

সমবায় পন্থায় কৃষক ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর উন্নতি করিতে হইলে ব্যাপক দৃষ্টি· লইয়া পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সামগ্রিকভাবে ঋণদান, বিক্রয়করণ, প· বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি· হইবে। তৎপূর্বে অবশ্য প্রয়োজন হইবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বিশেষ শক্তি· করিয়া গঠন করিবার। ডার্লিং তাঁহার রিপোর্টে এই বিষয়টির উপরই অধিক ·

...প করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।* তারপর প্রচুর অর্থ ও ব্যবসায়ী কৌশলের ব্যবস্থা করিয়া সমবায় আন্দোলনে এমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে যাহা ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ...লতাকে সহজেই অতিক্রম করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সাক্ষাৎ হইতে সমবায় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য। পূর্বের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ... পরামর্শপ্রদান, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ... সুদক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার ...ক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগত ত্রুটি দূর করাও আবশ্যক।

...নীয় পন্থা

... ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি এইরূপ এই দৃষ্টিভংগি লইয়াই সমবায় ...লনের ভিত্তিতে গ্রাম্য ঋণ ... স্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme Rural Credit) গ্রহণের এবং সমবায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনগত ত্রুটি দূরিকরণের সুপারিশ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার আলোচনা পূর্বে করা হইলেও এখানে উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে: পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) গ্রাম্য ঋণদান, বিক্রয়করণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকারবার সমবায় ... সংগঠিত ও সম্পাদন এবং শস্যভাণ্ডার ও গুদামঘরের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে ... অংশ-গ্রহণ করিতে হইবে। (২) রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মূলধনের শতকরা অন্তত ৫১ যোগান দিবে সরকার। (৩) কেন্দ্রীয় ও বৃহদাকারের প্রাথমিক সংস্থাগুলিতেও সরকার রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার মূলধনের অর্থ যোগান দিয়া অংশগ্রহণ করিবে।

...জরিপ
...টির সুপারিশ:
...সমবায়ের এক
...পরিকল্পনা
...গ পরি
... বিশ্লেষণ

যাহাতে রাজ্য সরকার এইভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিতে পারে ...র জন্য রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল নামে স্বষ্ট তহবিল ...ত সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই আবার ...ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা ...গুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকেও রিজার্ভ ব্যাংক ...তহবিল হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। (৫) সমবায়িক বিক্রয়করণ, বাজারের ... শস্য প্রস্তুতকরণ, শস্যভাণ্ডার, গুদামঘর প্রভৃতি সংগঠনের জন্য সরকার সমবায় ...ষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিবে। (৬) গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য ...পারিশ হইল একটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাংকের শাখা জিলায় এবং এমনকি মহকুমায় পর্যন্ত থাকিবে। ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থপ্রেরণ এবং ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা দিয়া সাহায্য করিবে। ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগসাধন গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির ...র একটি সুপারিশ। কমিটি সমবায়িক শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রসারের উপরও অধিক

...ও বিক্রয়
...র মধ্যে সংযোগ

* Sir Malcolm Darling—"Certain Aspects of the Co-operative Movement in India.

জোর দিয়াছে। বর্তমানে সমবায়িক শিক্ষা সংক্রান্ত যে কেন্দ্রীয় কমিটি (Cent Committee on Co-operation Training) আছে ত কার্য যাহাতে প্রসারলাভ করে সেইজন্য সুপারিশ করা হই যে, ঐ কমিটির হস্তে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংককে অ অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

২। সমবায়িক শিক্ষাদান

অন্যান্য নির্দেশিত সংস্কারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্র যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বৃহদাকারও সসীম দায়ের ভিত্তিতে স করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋ কার্যের মধ্যে অধিকমাত্রায় সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। তৃত শস্যের ভিত্তিতে ঋণদান করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি প্রয়োজন। চতুর্থত, ঋণ অর্থের আকারে না দিয়া যতদূর সম্ভব জিনিসপত্রের আ প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। পঞ্চমত, জীবিকাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঋণদান করিতে হইবে। ষষ্ঠত, ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ স স্থাপন করিতে হইবে। প্রাথমিক সমিতি এই সর্তে ঋণদান করিবে যে, কৃষক স বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমে তাহার পণ্য বিক্রয় করিবে। সপ্তমত, জ ব্যাংকগুলিকে উৎপাদনবৃদ্ধি ও জমির স্থায়ী উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আ করিতে হইবে। অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রসারের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণদান করিতে হইবে। নবমত, উপযুক্ত তত্ত্ব ঋণ আদায়ের সুব্যবস্থা ও সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির দিকে অধিক যত্নবান হ হইবে। সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকিবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সম ব্যাংকগুলির উপর এবং হিসাব পরীক্ষা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাজ্য সরক পরিশেষে, রাজ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যক্তিবিশেষকে ঋণদান বন্ধ ক ঋণদান সমিতিগুলির চাহিদাকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

৩। অন্যান্য অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

অবলম্বিত প্রতিবিধান (Remedies Adopted) : ১৯৫৭ স সুরুতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে উক্ত নির্দে প্রতিবিধানগুলি অনেকদূর পর্যন্ত অবলম্বিত হয়।

প্রথমত, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা কার্যকরক ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে উহার সহিত বিকানীর ব্যাংক, প ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ক ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংশ্লিষ্টকরণ পরিকল্পনায় ঐ ৮টি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীনস্থ ব্যাংকে (Subsidiary Banks) পরিণত হইবে

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরকরণ

---

* ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

় কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিলেরও সৃষ্টি ় হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ তহবিলের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকায় দাড়াইবে।*

।় বিক্রয়ের মধ্যে ়ন সাধন

রাজ্যসমূহও সমবায় উন্নয়নের জন্য পর্যায়সমন্বিত কার্যক্রম প্রস্তুত করে। দ্বিতীয়ত, ঋণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি সমবায় সমিতিকে মিলাইয়া বৃহদাকার সমিতিতে িত করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থায় উন্নতি-নের জন্য শস্য ও গুদামজাতকরণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইহা অবশ্য ঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনারই এক অংশ। চতুর্থত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে

াদনের ক্ষেত্রে ায়ক গুরুত্ব প্রদান

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমবায়ের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং কুলার্তাত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় তিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থার পথে চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চমত, য় ব্যাপারে শিক্ষাদানেরও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫

় ব্যবস্থা

হাজারের উপর শিক্ষিত সমবায় কর্মী প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পুনার সমবায় শিক্ষাদান কলেজ, বাঁচি মীরাট মাদ্রাজ ও ইন্দোরের আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঁচটি এবং আটটি বিশেষ কেন্দ্র (Special Training Centres) ছাড়াও সর্ব ভারতীয় সমবায়িক সংঘ All-India Co-operative Union) এবং রাজ্য সমবায়িক সংঘসমূহ সরকারী ায্যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছে।

স্যর ম্যালকমের রিপোর্ট ও সমবায়ের ভবিষ্যৎ (Sir Malcolm's eport and Future of Co-operation) :

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-

কল্পিত উজ্জ্বল ়ৎ

ব্যবস্থায় সমবায়ের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পিত উন্নয়নে সমবায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ হইল জাতীয় নীতির অন্যতম মূল লক্ষ্য। কৃষির প্রায় ্র ক্ষেত্রেই ভারতের ন্যায় দেশে সমবায়ের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ়নাকেই প্রাথমিক রূপদানের নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিকল্পিত উন্নয়নকার্য অবশ্য ঋণ হইতেই সুরু হইবে। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য কের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রতিটি দিকের ব্যাপারে কিভাবে এবং কতদূর অগ্রসর

প্রসারণের পদ্ধতি লক্ষ্য

হইতে হইবে তাহা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। প্রথমে স্থির ছিল যে (ক) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে অন্তত একটি সমবায় সমিতির সদস্যপদভুক্ত করিতে হইবে, (খ) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে ঋণগ্রহণযোগ্য (creditworthy) করিয়া তুলিতে হইবে, (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনার

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

শেষে প্রাথমিক কৃষিদান সমিতির সদস্যসংখ্যা ৮৫ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি করিয়া সত্তর ও কোটিতে লইয়া যাইতে হইবে।

নগরাঞ্চলেও সমবায়ের প্রসার পরিকল্পনা হইতে বাদ যায় নাই ক্ষুদায়তন শি ব্যাংকিং, গৃহনির্মাণ, পরিবহন, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি এই অঞ্চলে সমবায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র।

নগরাঞ্চলে সমবায়

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিকেন্দ্রী একক (decentralised) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রহিয়াছে তাহা মূলত সমবায়ের ম প্রতিপালিত হইবে—ইহাই আমাদের পরিকল্পিত কার্য ব্যবস্থার নীতি।

পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণের এই নীতির যৌক্তিকতা স বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন স্যর ম্যালকম ডার্লিং। তাহার ফলে সম্প্রসারণের কতকটা প্রতিহত এবং কার্যক্রম কতকটা পরিবর্তিত হয়।

কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শদাতা (Colombo Plan Consultant) হ স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমবায় আন্দোলন সম্প্র কার্যক্রমের পর্যালোচনা করিয়া আন্দোলনের সংহতিসাধন সু সুপারিশ করিতে অনুরোধ করা হয়।

ডার্লিং-এর রিপোর্ট

কৃষি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে স্যর ম্যালকমের অভিমতগুলি হইল যে দি পরিকল্পনায় উহার যেরূপ দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত ন বর্তমানে সমবায় সংগঠন অতিশয় দুর্বল। ইহার সহিত উৎ নির্মাণকরণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ সমিতি (manufactu marketing and processing societies) সংযোজন হইলে আন্দোলন আংশিকভাবে এবং কতকগুলি অঞ্চলে সম্পূ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। স্যর ম্যালকম দেখিয়াছিলেন যে পুরাতন সকল প্রকার সমিতিই উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিনি সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য করা অনুচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় স সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্য কৃষকদিগের দিকে চাহিয়া স্থির করা হয়। ইহাতে নিম্নতর সরকারী কর্মচারিগণ উপরিওয়ালাদের কবিবার জন্য সমিতির পর সমিতি স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। ফলে কৃষকদের যে কি উপকার হইতেছে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াও দেখিতেছে দ্বিতীয়ত, স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় ঋণদান আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অং বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাতে আন্দোলনের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই সমবায়ের সফলতার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপ গ্রহণ করিয়া সরকার ভুল করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমবায় আন্দো রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথ যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে ইহার দ্বারা সমিতি

অভিমত ও সুপারিশ
১। বিভিন্ন প্রকার ও বহুসংখ্যক সমিতি গঠন অযৌক্তিক

২। রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বিতর্কমূলক পন্থা

[illegible] যত স্বল্প ব্যাহত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, বৃহদায়তন সমিতি গঠনের জন্য গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির যে সুপারিশ স্যর ম্যালকমের মতে তাহা সহসা গ্রহণীয় নহে। কারণ, ইহার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ (Raiffeisen Model) হইতে বিদায় লওয়া। রাইফিজেন আদর্শ সভ্যদের মধ্যে পারস্পারিক [illegible] শুনা এবং অসীম দায়িত্ব—বিশেষভাবে এই দুই বিষয় নির্দেশ করে এবং এই দুইটি [illegible] সমবায়বোধ (Co-operative spirit) সম্প্রসারিত করে। সুতরাং পারস্পরিক [illegible] শুনার অভাব থাকিলে এবং সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইলে সমবায়বোধ ব্যাহত [illegible] সমবায় সমিতি মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য বৃহদায়তন সমিতি [illegible] স্যর ম্যালকমের কোন নীতিগত আপত্তি নাই, তবে তিনি বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার [illegible] এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মোটকথা স্যর ম্যালকম [illegible] চাহেন যে, কৃষককে প্রধানত সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াই [illegible] গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাহির হইতে অর্থসংগ্রহের [illegible] নয়।

বৃহদায়তন সমিতি
[illegible] বিবেচনাযোগ্য
[illegible]

[illegible] দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন কৃষি ঋণ [illegible] প্রয়োজন যে আছে তাহা স্যর ম্যালকম অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু ইহার [illegible] সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির আস্থার উন্নতি না অবনতি দেখা দিবে সে বিষয়ে [illegible] করিয়াই ঋণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। অনেক রাজ্যে ঋণপ্রদানের [illegible] সংগে অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী (outstanding debts and overdues) [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু সকল রাজ্যে আন্দোলন একই প্রকার সুসংগঠিত নহে [illegible] সকল ক্ষেত্রে একই হারে ঋণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে সমবায় ঋণদান আন্দোলন এরূপ সুসংগঠিত সেখানেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে সমিতির সংখ্যা ও ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত হইবে না। অন্যান্য যে-সকল স্থানে আন্দোলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল সেখানে লক্ষ্যে পৌছিবার সময়কে ৫ হইতে ১০ বৎসর [illegible] দিতে হইবে—অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ পরিকল্পনায় লইয়া যাইতে হইবে।

[illegible] বৃদ্ধির লক্ষ্যে
[illegible] সময়
[illegible] দেওয়া
[illegible]

স্যর ম্যালকম আরও বলিয়াছেন যে সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য (target) [illegible] অনাদায়ী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যই নির্ধারণ করা উচিত। ইহার জন্য অবশ্য [illegible] প্রয়োগ করা চলিবে না, করিলে আন্দোলন সর্বনাশের সম্মুখীন হইতে পারে।

আন্দোলনের পুনর্গঠনে বর্তমানে যে পুরাতন অপেক্ষা নূতন সমিতির প্রতি অধিক [illegible] দেওয়া হইতেছে সেদিকে স্যর ম্যালকম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে [illegible] করা যাইতে পারে যে মিতব্যয়িতার প্রসারসাধনের দ্বারাই সমবায় আন্দোলনকে

সুগঠিত করিতে হইবে—ইহাই স্যর ম্যালকমের সুদৃঢ় অভিমত। তিনি এই মিতব্যয়িত শিক্ষাপ্রদান বিদ্যালয় হইতে সুরু করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৫। পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা প্রভৃতি

তারপর আছে পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা, সংরক্ষিত তহবি বিনিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ। এগুলির উন্নতিসাধনও বি প্রয়োজনীয়।

সমবায়িক শিক্ষারও পুনর্গঠন দরকার। সারা ভারতে যখন সমাজোন্নয়নের পরিক কর্মা হইয়াছে এবং সমাজোন্নয়নের মধ্যে যখন সমবায়ের এক বিশেষ ক্ষেত্র রহি তখন ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীর (B. D O.) উপর সম সম্প্রসারণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হইতে বাধ্য। এই ক অন্যান্য কর্মীর সংগে ইঁহাদেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। সমবায়িক শিক্ষার পুনর্গঠন

স্যর ম্যালকমের রিপোর্ট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের ভি ধরিয়া নাড়া দেয়। সরকার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমি সুপারিশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ভুল হইয়াছিল এবং এখন হইতে প্রধানত স্যর ম্যা প্রদর্শিত পথেই চলা হইবে। ফলে সুরু হয় সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধ

পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সমবায় নীতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাস করে। এই প্র বলা হয় যে, সমবায়কে জনগণের আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রাম্য সমাজ প্রাথমিক সংস্থা হিসাবে ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করিতে হই গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ গ্রাম্য সমবায় গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। এই প্রস্ত কার্যকর করিবার জন্য সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে ভা সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক ও র ব্যাংকের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কার্যকরী দল (Working Group) গঠন করে। এই দলের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার রাজ্য সরক গুলিকে কতগুলি নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছে। অন্যতম সিদ্ধান্ত হইল সাধারণত প্রাথমিক ঋণদান সমিতির এলাকা একটি গ্রাম লইয়া হইবে। ইহা ব্যত রাজ্যসরকার গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ করিবে না

সমবায় নীতির পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টা

সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের আর একটি দিক হইল সেবা সমবায় সমিতি গঠ নিম্নে এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives): সেবা সম সমিতি সম্বন্ধে ধারণা একেবারে নূতন নহে। তবে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক হইতেছে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দলের 'নাগপুর প্রস্তাবের' (Nagpur Resolution) পর হইতে। নাগপুর প্রস্তাব অনুসারে তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় সমিতি দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইবে এবং

নাগপুর প্রস্তাব

* Reserve Bank Bulletin, August, 1959.

নর্গঠিত সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইবে এই সেবা সমবায় সমিতিগুলি। সেবা সমবায় মিতি স্থাপনের সংগে সংগে অবশ্য সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করিতে হবে। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে আলোচনা 'ভূমি সংস্কার' অধ্যায় করা হইতেছে।

বর্তমানে সেবা সমবায় সমিতির গঠন সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নুসারে মোটামুটি এক একটি গ্রাম লইয়া এক একটি সমিতি গঠিত হইবে এবং উহারা

বা সমিতির গঠন

বহু উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) হইবে।* বহু উদ্দেশ্যসাধক বলিতে বুঝান হইয়াছে, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষককে ঋণদান ড়াও কৃষি-যন্ত্রপাতি, ধান, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবে; প্রয়োজনমত জলসেচ ও মি উন্নয়নে সহায়তা করিবে; কৃষিকার্যের অনুপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা রিবে; ইত্যাদি। মোটকথা সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষি-শিল্পের সর্বতোমুখী সেবা রিবে।

প্রথমে ঠিক হইল যে সেবা সমবায় সমিতিগুলিতে শেয়ার মূলধনে সরকার অংশ গ্রহণ রিবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ নীতির পরিবর্তনসাধন করিয়া বলা হইয়াছে, গ্রাম পর্যায়ের ান সমবায় সমিতিতেই সরকার শেয়ার মূলধন যোগান দিবে না; প্রধানত কৃষকের ক্তিকেই সমবায় সম্প্রসারণের কার্যে নিয়োজিত করা হইবে। তবে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার নগঠন ও বিবর্তনে সরকারী সাহায্য প্রধানত কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সমবায় সমিতিগুলির ধ্যমেই বণ্টিত হইবে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর সুপারিশ অনুসারে মুমূর্ষু সমিতিগুলিকে স্থ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইবে; সংগে সংগে অবশ্য নূতন সেবা সমিতি াপনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত যে সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ূমিকা বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। পরিকল্পনা মহলের ধারণা হইল যে

মাজোন্নয়ন ও সমবায়ের যোগসাধন

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতিরেকে সমবায়ের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে না। তবে সমবায় আন্দোলন প্রধানত জনগণেরই আন্দোলন। সুতরাং ব্যাপক বেসরকারী দ্যোগও কম প্রয়োজনীয় নহে; বরং উহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সেবা সমিতি ঠন ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে প্রধানত জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগের পরহ নির্ভর করিয়াই বলিতে হইবে।

সমবায় সংগঠনের আর একটি দিক হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায়ের যোগ সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যে সমবায়কে সমাজোন্নয়নের মন্ত্রি-দপ্তরের অধীন করা ইয়াছে।

উপসংহার: সেবা সমবায় সমিতি গঠন, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, কৃষি ণদান সমিতি পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও খনও ঐ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য

* A I C C Economic Review April and May 1959 এবং ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ইস্রায়েল ও যুগোশ্লাভিয়ায় দুইটি দল (Study Teams) প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং সকল সিদ্ধান্ত কতদূর অপরিবর্তিত থাকিবে তাহা বলা কঠিন।* তৃতীয় পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে তবে ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

1 Review the working of the Village Co-operative Credit Societies. H can they made more serviceable ? (১৬৫-১৬৮ পৃ

2. What do you understand by a Multi purpose Co operative Soci Discuss its advantages and disadvantages. Should such societies be establi in large numbers ?

[ইংগিত: বহুসংখ্যক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জ কমিটির সুপারিশ স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত ও সেবা সমবায় সমিতির সম্বন্ধ দেখ। ১৭৮-১৮৩ পৃষ্ঠা

3. Show the aim and scope of the Land Mortgage Banks in India. How have they been successful ? (C U. B. Com. 1953) (১৮৩ ১৮৬ পৃ

4. What is and should be the relation of the State to the Co-operative Mo ment in a country like India ?

[ইংগিত: যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অ এবং পরিকল্পনা মণ্ডলের বর্তমান ধারণা। .. ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা]

5. Indicate the success or otherwise of the Co operative Movement in In Give reasons for your answer. (১৯১ ১৯৬ পৃ

6. In the opinion of the All India Rural Credit Survey Committee operative Movement in India has failed Account for this failure and sug measures to remedy it.

[ইংগিত: পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের প্রথমাংশ একই। সর্ব ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ ক মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হইল: (১) জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৬ ২৭ সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত, (২) সমবায় সমিতি কৃষি ঋণের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ যোগান (৩) সমবায় সমিতির সদস্য হার অত্যধিক; (৪) অনেক সমিতি অকার্যকর; (৫) সমবায় সভ্যদের মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয় প্রসারসাধন করিতে পারে নাই। অল্প কথায় পকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন—এই তিনটি উদ্দেশ্যের একটিকেও ভারতীয় সমবায় আন্দোলন সার্থক ক পারে নাই ...(১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠা)]

7 Briefly describe the steps that are being adopted to reorganise Co-opera Movement in India.

[ইংগিত: প্রথমত, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নির্দেশিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পুর্ণাংগ পরিক সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত এবং উহাকে কার্যকর করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিকে বৃহদা পরিণত করা হইতেছিল। তৃতীয়ত, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থ দান করিয়া উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল। চতুর্থত, সমবায়িক শিক্ষাপ্রসারের বন্দোবস্ত হইতেছিল। বর্তমানে স্যর ম্যালকম ডার্লিং এর রিপোর্টের ফলে পদ্ধতিগুলি কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং এখনও ঐ বিষয় বিচার বিবেচনা চলিতেছে।... (১৯৬-১৯৯ পৃ

8. Indicate the future of the Co operative Movement in India in the lig Sir Malcolm Darling's Report. (১৯৯ ২০২

9. Write a note on Service Co-operatives. (২০২-২০৬

---

* Ooty Seminar on Planning, Sept. 19 9.

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে খাদ্য-সমস্যা

(Food Problem in India)

যাহাকে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক (quantitive aspect) বলে, ভারতে তাহার উদ্ভব হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তাহার বহু পূর্ব হইতেই অবশ্য গুণগত দিক (qualitative aspect) দিয়া খাদ্য-সমস্যা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ তখন ভারতীয় জনগণের জন্য মোট খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকিলেও, এই খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকারক ছিল না। এখনও অবশ্য নাই।

খাদ্য সমস্যার পরিমাণগত দিকের উদ্ভব

পরিমাণের দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভূত হইলেও ইহা প্রকট রূপ ধারণ করে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর সমস্যা সংকটরূপে দেখা দেয়। বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা যে কি দুঃসাধ্য ও অপচয়-মূলক ব্যাপার সে সম্বন্ধে এই সময় সাধারণ লোকেও সচেতন হইয়া উঠে। পরিমাণের অপ্রতুলতার ফলে সরকারকে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে একরূপ পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থার (controlled economy) প্রবর্তন করিতে হয়। ফলে আপামরসাধারণের জীবনের একটা দিক হইয়া উঠে যান্ত্রিক। এই নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা ও শৃংখলিত যান্ত্রিক জীবন হইতে আমরা বর্তমানে একপ্রকার মুক্তি পাইলেও ভারতে খাদ্য-সমস্যা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। এখনও গুণগত দিক দিয়া খাদ্য সমস্যার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতেও পারে না। পর্যাপ্তির দিক দিয়াও এই ভয় রহিয়াছে যে যে-কোন সময় আমাদিগকে বর্তমানের খাদ্য-ঘাটতি হইতে প্রকৃত খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। খাদ্য-ঘাটতির জন্য এখনও আমাদিগকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কৃষিকার্যের জন্য যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন খাদ্য সংকটের আশংকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। উপরন্তু, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এরূপ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, দেশের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল কৃষি উন্নয়নের একটি গতিশীল কার্যক্রমের (dynamic programme of agriculture)।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মস্যার সংকটে ...ত্ব

খাদ্য সমস্যা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই

খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা

---

* ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুসারে ভারতের খাদ্য-সমস্যার বিচার সকল সময়ই বর্ধমান জনসংখ্যার পবিপ্রেক্ষি করিতে হইবে।* ১৯৫৯ সালের মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মত খাদ্য-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যব ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। অন্যভা বলিতে গেলে, ভারতে খাদ্য সমস্যার আশংকা সর্বদাই বর্তম রহিয়াছে—সর্বদাই জনসংখ্যার গতি হইল খাদ্য সরবরাহকে ছাড়িয়া যাইবার দিবে স্থতরাং ক্রমবর্ধমান খাদ্যোৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা প্রযোজন। উপরন্তু, জনসাধারণ প্রয়োজনমত খাদ্য সবরবাহ না করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় ন অতএব, বিভিন্ন দিক হইতে প্রয়োজন রহিয়াছে খাদ্য-সমস্যার পর্যালোচনার।

খাদ্য-সমস্যা আলোচনার প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্তসার

ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Food Proble in India) : ভারতে খাদ্য-সমস্যাব প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইংগিত ইতিমধ্যেই দে হইয়াছে—যথা, খাদ্য ঘাটতি ত' রহিয়াছেই, উপবন্তু আশংকা রহিয়াছে খাদ্য-সংকটের এ যে খাদ্য ভারতীয় জনগণ সাধারণত গ্রহণ করে, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া তাহা বি ত্রুটিপূর্ণ। এখন খাদ্য-সমস্যার এই দুইটি দিক এবং ইহাদের সহিত সম্পর্কিত আরও দুই বিষয়—যথা, খাদ্য বণ্টন পরিচালনা ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্পবি বিশদ আলোচনা করা হইবে।

খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অ-পর্যা (Quantitative Aspect of the Food Problem) : বলা হইয়াছে যে, বি দ্বিতীয় দশকে ভারতে প্রথম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ইহাব পূর্বে ভারত খাদ্য বপ্তানি করিত; কিন্তু এখন আমদানি করে। ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারতে ১৩ লক্ষ টনের মত খাদ্য-খাটতি পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশবিভাগের ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পবিমা আরও ৭ লক্ষ টনের উপর বাড়িয়া যায়—কারণ অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনা অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে। একটি হিসাব অনুসারে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ২৩ ভাগ পাকিস্তানের অংশে পড়িলেও ধান্য ও গম চাষের মোট জমি ২৬ ভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

১৯৩৮ সালের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার '৪০ কোটি লোকের জন্য খাদ্য-পরিকল্পনা' নামক গ্রন্থে † হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সময় স্বাভাবিক উৎপাদনে বৎসরেও ভারতে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে মাত্র ৮৮ জনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হইত। বাকী শতকরা ১২ জনের জন্য খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। ১৯৪৮ সাল হইতে এই আমদানির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনে

দেশবিভাগের পূর্বে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাব

---

* Second Five Year Plan—২৫৯ পৃষ্ঠা। India's food crisis and steps to meet it..

† Food Planning for Four Hundred Millions.

অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। বর্তমানেও ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ এবং ৩২ লক্ষ টন।

ানিক দৃষ্টিকোণ
ৎ খাদ্য সমস্যার
ং

টাকা হিসাবে দেশবিভাগের পর হইতে এ পর্যন্ত আমাদিগকে খাদ্য আমদানিতে পরিমাণ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা। মোটামুটিভাবে ৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১,৪০০ কোটি টাকার মত। এই এক বৎসরেই (১৯৫৮-৫৯) ১৫৯ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য (cereals and cereal eparetions) আমদানি করা হয়।* যখন আমরা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ য়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির (reserve of foreign exchange) ক্ষুদ্রতম শও উন্নয়নমূলক কার্যে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি তখনই আমাদিগকে বহু পরিমাণ দ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যদি ভারতে খাদ্য-সমস্যা থাকিত তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপ দেওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির সাহায্যে মূলধন দ্রব্যাদি (capital goods) আমদানি করিয়া ইহাকে র্ধর করা সহজেই সম্ভব হইত।

খাদ্য সমস্যার গুণগত দিক (Qualitative Aspect of the Food oblem): পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক অন্তত ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের (caloric value) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। ভারতে গড়ে ইহা হইল ২,০০০ ক্যালোরি মাত্র। এই গড়পড়তা হিসাব প্রকৃত অবস্থার ইংগিত দেয় না কারণ বেশীর ভাগ লোক ১,২০০-১,৫০০ ক্যালোরি র অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতেও সমর্থ নয়।** সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু মাণ নহে গুণগত দিক দিয়াও খাদ্যগ্রহণে ভারত ন্যূনতম মাত্রায় পৌঁছিতে পারে । উপরন্তু, দুগ্ধ এবং অন্যান্য সংরক্ষণমূলক খাদ্য (protective food) গ্রহণের মাণও ভারতে অতি অল্প। ভারতের নিরামিষাশী জনগণ তাহাদের খাদ্যের স্বাভাবিক ষ্টিকারিতা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। অনেক সময় আবার অজ্ঞতা হেতু রা যেটুকু খাদ্যগুণ আছে তাহাও অনেকাংশে অপচয় করিয়া ফেলে। ফলে সুষম দ্যর (balanced diet) অভাবে তাহারা অপুষ্টিজনিত নানারূপ ব্যাধি কবলিত হয়, ও প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় দক্ষতা পায়।

দিক দিয়াও
ভারত
ম মাত্রায়
ত পারে নাই

* Report on Currency and Finance, 1958-59

** Foodgrains Enquiry Committee Report, 1957—৪০ পৃষ্ঠা।

বণ্টনগত দিক হইতে খাদ্য-সমস্যা (Administrative Aspect of Food Problem) : খাদ্য সমস্যার বণ্টনগত দিক ইহার পরিমাণগত দি স্বাভাবিক ফল—অর্থাৎ, পরিমাণগতভাবে খাদ্য-সমস্যা আছে বলিয়া বণ্টনের দিক দি সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে ভারতে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাহার সমগ্রটাই বি জন্য বাজারে আনীত হয় না এবং বিক্রয় ব্যবস্থাতে উৎপাদন কৃষকের ভূমিকাও একরূপ নগণ্য। ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতির মা কৃষিজ পণ্যের বিক্রয় প্রধানত পরিচালিত হয়। এই সকল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্য করিয়া কৃত্রিমভাবে আরও খাদ্য-ঘাটতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। ফলে দাম অসম্ভবরূপে ব যায় এবং দরিদ্র জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের সম্মুখীন হয়। এমত ও সরকারের কর্তব্য হইল খাদ্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা কর খাদ্যশস্যের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করা। খাদ্যমূল্যে এই স্থ করণের উপরই খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি (Foodgr Enquiry Committee) এবং মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল বিশেষ গুরুত্ব আ করিয়াছে।

অপকৃষ্ট বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য খাদ্য বণ্টনে ত্রুটি

মূল্যস্থায়িত্বকরণের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspect of the Fo Problem) : মূলত ভারতের খাদ্য সমস্যা হইল অন্যতম অর্থনৈতিক সম পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়া ভারতে খাদ্য সমস্যা বর্তমান রহিয়াছে। ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রধান উপাদান কৃষি হইল বিশেষভাবে অনগ্রসর এবং ভা জনগণ হইল অতিশয় দরিদ্র। যদি ভারতে শিল্পোন্নয়নের পরি পর্যাপ্ত হইত তবে কৃষির উৎপাদন স্বল্প হইলেও খাদ্য সমস্যা রূপ ধারণ করিতে পারিত না। সেই অবস্থায় গ্রে ি প্রভৃতির ন্যায় ভারতও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বাহির খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া জনসাধারণের ভরণের ব্যবস্থা করিতে পারিত। ভারতের শিল্পোন্নয়ন পর্যাপ্ত নয়; সুতরাং আভ্যন্তরীণ সূত্রই হইল সাধারণের জন্য সররবাহের প্রধান পন্থা।

মূলত ভারতের খাদ্য সমস্যা অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা

ভারতীয় জনগণ পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া উনমূল্যের খাদ্যের জন্য যে ব্যয় বিশেষজ্ঞগণের মতে, তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিলে তবেই তাহাদের পক্ষে সামঞ্জ পুষ্টিকর বা সুষম খাদ্য balanced diet) গ্রহণ করা সম্ভব। অভিমতের সুস্পষ্ট অর্থ হইল যে, ভারতীয় জনগণের খাদ্যের গুণ ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর করিতে হইলে মাথাপিছু খাদ্যের জন্য ব্যয়শক্তি দ্বিগুণ করিতে হইবে। ইহা একরূপ মাথাপিছু আয়কে দ্বি করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার মত। বলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে

সুষম খাদ্যগ্রহণের জন্য মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন

্যাভিমুখীই করা হইয়াছে। প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, ১৯৭৭ সালের কাছাকাছি অর্থাৎ ১৯৫০ সাল হইতে ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে।* এখন আশা করা হইতেছে যে ঐ সময়ের পূর্বেই মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে কালীন উন্নয়নের প্রশ্ন। ভরসার কথা এই যে, পথের দৈর্ঘ্য উদ্যমহীনতার সৃষ্টি করিয়া বরং আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে উদ্যোগীই করিয়া তুলিয়াছে।

সমস্যার সমাধান কালীন উন্নয়নের

জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা (Food Problem in lation to the Growth of Population):

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা বলিতে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকই বুঝায়। এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।** তবে এখন সামান্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর গোড়া হইতে সুরু করিলে দেখা যায় যে, ১৯০১-৫১ সাল, অর্থাৎ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অবিভক্ত ভারতের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে, সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৪০ লক্ষের মত বাড়িয়াছে। বাৎসরিক হিসাব ধরিলে ইহা হইল গড়ে শতকরা ১'২৫ হারে বৃদ্ধি। ১৯৪১-৫১ ের মধ্যে এই বাৎসরিক হার আবার বাড়িয়া ১'৩৩-এ দাঁড়ায়। অপরদিকে কিন্তু বরতই মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। মাথাপিছু কৃষি-জমির মাণ ১৯২১ সালে ছিল ১১১ সেণ্ট ; ১৯৫১ সালে ইহা কমিয়া ৮৪ সেণ্টে আসিয়া য। বর্তমানে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই মাথাপিছু মাণ বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুই প্রকার শস্য উৎপাদনের জমির মাণও (double crop area) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে নিয়মিত হারে িয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে মাথাপিছু এই প্রকার জমির পরিমাণ ছিল ১৩ সেণ্ট ; ৫১ সালে ইহা কমিয়া ১০ সেণ্টে পরিণত হয়।

ংখ্যার নিয়মিত ঘটিতেছে কিন্তু পিছু কৃষি-জমির াণ ক্রমশ কমিয়া তেছে

সংগে সংগে যদি কৃষির পদ্ধতিগত উন্নতিসাধন (organisational improvement) করা সম্ভব হইত, তবে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিলেও খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি পড়িত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে তাহা ঘটে নাই। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিলেও পদ্ধতিগত উন্নতির—যেমন, যন্ত্রিকরণ, বৃহদায়তনে উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে ইহার উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই বলিলেই চলে। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্য রবরাহের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকতরই হইতে থাকে।

র পদ্ধতিগত ত ঘটে নাই

 খাদ্য যোগান জনসংখ্যার মধ্যে ধান ক্রমশ বাড়িয়া াছে

* First Five Year Plan—২১ পৃষ্ঠা।

** ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ভবিষ্যতে এই ব্যবধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। প্র
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৪ আউ
হিসাবে ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছিল যে, খাদ্য-ঘাটতি পূ
করিতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৭৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপা
বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে। ১৩·৭১ আউন্স হিসাবে মাথাপি
প্রয়োজনীয়তা ধরিলে মোট উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কমিয়া ৬৭ লক্ষ ট
দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের পরিমাণ

সব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, পাটীগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতে
ব্যবধান বিশেষ আশংকাজনক নহে—কারণ এই উৎপাদনবৃদ্ধি একপ্রকার সম্ভব বলি
বিবেচনা করা যাইতে পারে। বস্তুত, প্রথম পঞ্চবার্ষি
পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য স্থি
করা হয়; এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে এই লক্ষ্যের ৩৪ লক্ষ টন অধি
খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা অপেক্ষাও ৩৭ লক্ষ টন অধিক খাদ্য
উৎপন্ন হইয়াছিল।*

খাদ্যশস্যের অনুমিত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব

কিন্তু আদমসুমারির কমিশনার পাটীগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই ভবিষ্যতে বি
আশংকাজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি ত
অভিমত পরিস্ফুটিত করিয়াছেন সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তিতে, মাত্র খাদ
উৎপাদনের ভিত্তিতে নহে। ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্য, বাণিজ্যিক শস্য এবং অন্যান্য ক
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি টন এবং জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির
হিসাব করা হইয়াছে যে, বর্তমান ভোগের হারে ৩৬ কোটি লো
ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনের
কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বর্তমানে ৫০ লক্ষ
ঘাটতি রহিয়াছে। আদমসুমারি কমিশনারের মতে, পর
কয়েক দশকে জনসংখ্যা এবং ফলে কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজন
নিম্নলিখিতভাবে বাড়িয়া যাইবে :

কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধিই জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃত সমাধান নহে

সাল	জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়া কোটিতে)	প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন (বাৎসরিক কোটি টন)
১৯৫১	৩৬	৭·৫০
১৯৬১	৪১	৮·৫০
১৯৭১	৪৬	৯·৬০
১৯৮১	৫২	১০·৮০

* Second Five Year Plan—২৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা

দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ভোগের বর্তমান হার শুধু বজায় রাখিতেই ১৯৫১ সালের ৭ কোটি টন উৎপন্নকে (প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন হইল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল ৭ কোটি টন) বাড়াইয়া ১৯৬১ সালে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা হইল ১৯৫১ সালের উৎপাদনের উপর শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি।* দশ বৎসরে শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধির জন্য কৃষিজ উৎপাদনের ...শ গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme of agricultural production) প্রয়োজন।

...মী ১০ বৎসরে ...রা ২১ ভাগ কৃষিজ ...দনবৃদ্ধি প্রয়োজন

১৯৫৭ সালের খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ...সংখ্যার বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় অধিক হইবে। বস্তুত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ...ম পর্যায়ে এইরূপই ঘটে।** এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও লোকের আয়বৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগের মত বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র খাদ্যশস্যেরই (মোট কৃষিজ উৎপাদনের নহে) মোট চাহিদা দাঁড়াইবে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ...। অপরদিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ...র মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের ...তির আশংকা রহিয়াছে। স্বভাবতই এ ঘাটতি আমদানির সাহায্যে পূরণের ...স্থা করিতে হইবে। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে লোকের চাহিদা ...ও মজুত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন করিয়া ...দশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

...শস্য অনুসন্ধান ...টি

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৃষি বিশেষজ্ঞের দলকে (The American Team of Agricultural Specialists) ভারতে আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাদের মতে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কৃষিজ উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই দল অভিমত প্রকাশ করে যে, জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে—অর্থাৎ ...ীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৪৮ কোটি হইয়া দাঁড়াইবে। এখন মাথাপিছু খাদ্যশস্যের ...মাণ যদি ১৮ আউন্স করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এই জনসংখ্যাকে খাওয়াইয়া ...র জন্যই ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত বীজ, ...ত প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হইবে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। সুতরাং তৃতীয় ...িকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১১ কোটি টনে স্থির করিতে হইবে। ...তি ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি টনের কিছু অধিক। খাদ্যশস্যের

...ন কৃষি ...িজ্ঞ দল

* Census of India, 1951, Vol. 1, India, Part I—A Report—৯৪ ও ১৯০ পৃষ্ঠা এবং India Rural Credit Survey—Vol. II ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

** ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

উৎপাদনবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৮০ লক্ষ মত খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিবে। বিশেষজ্ঞ দল সুপারিশ করিয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ৩·২ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৮·২ ভাগে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।*

খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures adopted to solve the Food Problem) : খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে যে গতিশীল কার্যক্রম প্রস্তুত ও কার্যকর করা হইয়াছে তাহা অধিক দিনের পুরাতন নয়। ইহার সূত্রপাত হয় ১৯৫২ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হইলে। ইহার পূর্বেও অবশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। প্রথমে এইগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্বে অবলম্বিত প্রতিবিধান

প্রতিবিধানগুলির দ্বারা পরিমাণগত ও বণ্টনগত উভয় দিক দিয়াই খাদ্য-সমস্যাকে আক্রমণ করা হয়। কিভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে কি কি প্রতিবিধান অবলম্বন করা প্রয়োজন ও সম্ভব এই সকল নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে একটি খাদ্য বিভাগ (Food Department) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইহার পর ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার খাদ্য-সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহার সমাধানকল্পে সচেষ্ট হয়।

এই সময় হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূচনার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য-সমস্যার সমাধানে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, বাহির হইতে খাদ্য আমদানি, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা এবং অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান।

(ক) বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি (Import of Foodgrains) : খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকের আলোচনা প্রসংগে বাহির হইতে আমদানির বিষয় আলোচনা ইতিমধ্যে করা হইয়াছে।† এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের বুভুক্ষা মিটাইবার জন্য ভারত সরকারকে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বাহির হইতে ৯৬৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে গড়ে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩০ লক্ষ টন করিয়া।

খাদ্য আমদানির পরিমাণ

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে আমদানির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইলেও উহার পরবর্তী সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াই চলে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ভারতকে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ও ৩৭ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও

---

* India's food crisis and steps to meet it.

† ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ার এক ঘোষণা অনুসারে ১৯৫৮ সালে ৩১'৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে যাছে।

১৯৪৭ সাল হইতে সুরু করিয়া এ-পর্যন্ত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে ভারত কারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। একে বর্তমানে রহিয়াছে প্রায় সমগ্র শ্বই একরূপ খাদ্যাভাব; আব তাহার উপর ভারতে নাই যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাব সঞ্চয (reserve of foreign currency)। যে-সামান্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয ছিল এবং ষ্টার্লিং পাওনা (sterling balance) যেটুকু আদায করা গিয়াছিল—উভযের প্রায় সমগ্রটাই য়িত হইয়া গিয়াছে এই 'বুভুক্ষা নিবারণ' খাতে।

ৃশস্য আমদানিতে াধা

সকল সময় যে ভারত সবকার নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি রতে পারিযাছে, তাহাও নহে। এই সময়েব মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভারতকে ঋণ ও দান সাবেও খাদ্যশস্য অন্যান্য দেশ হইতে গ্রহণ কবিতে হইয়াছে।

(খ) **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা (Food Control and ationing):** ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের পরই কলিকাতা ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে ং ভারতের অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলে খাদ্য নিযন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে ই ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে প্রায় ১৫ কোটি লোককে াব আওতায আনা হয়।

একপ্রকার সুরু হইতেই নিযন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিচালনায় বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় ং ফলে, নানাপ্রকার দুর্নীতি ইহার আশ্রয়ে প্রসারলাভ করিতে থাকে। উপরন্তু, কৃষকদের নিকট হইতে যে নির্ধারিত দামে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইত তাহা অনেকের অধিক উৎপাদনের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ বস্থা তুলিয়া দিবার সপক্ষে একরূপ আন্দোলন চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এই ান্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একপ্রকার কৃত্রিম াদ্য-ঘাটতির সৃষ্টি করিয়াছে; অধিকাংশে ইহা হইল মনস্তাত্ত্বিক, প্রকৃত নহে। ফলে াহাব উপদেশ অনুসারে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরীক্ষা- লকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ইহার ফল দাঁড়ায় ভয়াবহ। াবিদিকেই খাদ্য মজুতের হিড়িক পড়িয়া যায়; ব্যবসায়িগণ এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া অকল্পনীয়ভাবে দাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। স্বভাবত কয়েক মাসের ধ্যেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত এবং পরিচালন-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হয়; এবং ইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে সুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ।

ন্ত্রণ ও বরাদ্দ বস্থা লইয়া পরীক্ষা

নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল চাউলের উপর। াবণ, চাউলের ঘাটতির পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, ঐ সময় মজুত

চাউলের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল যে, দৈনিক ৯ আউন্সের অধিক কবি সরবরাহ করা যাইত না। দেশের যে-যে অঞ্চলের অধিবাসিগণ নিকট চাউলই প্রধান খাদ্য তাহাদিগকে গম, জোয়ার, বাজ প্রভৃতি খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেও ও অনুরোধ করা হইয়াছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল "জনগণের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"*

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের আর কয়েকটি দিক

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্য সীমান্তে প্রভূত উন্নত পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৎসর জুন মাসে চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন মাদ্র সরকারী খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণ লইয়া পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় মাদ্র সফল হওয়ায় ধীরে ধীরে বিনিয়ন্ত্রণ ভারতের অন্যান্য অং প্রসারলাভ করে। অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই স ভারতব্যাপী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়। এ-সম্পর্কে আলোচনা প করা হইতেছে।

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্যের ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ

(গ) **অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান** (**Grow More Food Campaign**) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান মোটামুটিভাবে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে: (ক) অধি খাদ্য ফলাও অভিযান (১৯৪৩-৪৮) এবং (খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রচেষ্টা (১৯৪৯-৫২)। ইহার পর ১৯৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, অধি খাদ্য ফলাও অভিযানকে নূতন ও ব্যাপকতর রূপদান করিয়া ইহাকে কৃষির উন্নতির জ গতিশীল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযানের দুই পর্যায়:
ক। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান

১৯৪৩-৪৮ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য ফলানর জন্য অভিযান পরিচালিত হয় তৎকালী প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে।

অভিযান পরিচালনার জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: গঠনমূলক কার্যাবলী (work schemes) এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী (supply schemes)। কূপ নলকূপ পুষ্করিণী বাঁধ খাল প্রভৃতির নির্মাণ ও সংস্কা জল উত্তোলনের ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভু ছিল এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী বলিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদির বণ্ট বুঝাইত।† প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকে বর্তমানে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

এইরূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থ ঢাকিয়া রাখা যায় নাই। এই অভিযানকে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক শস্যের জমি

* **First Five Year Plan**—১৮৩ পৃষ্ঠা।

† **India—1955** গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠা।

ন্যশস্যের অধীনে আনয়ন করার দরুন তুলা ও পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে কৃষকগণের আয় কমিয়া যাওয়ায় খাদ্য পরিস্থিতি দিন দিন সংকটেরই সম্মুখীন হইতে থাকে। উপরন্তু, এই অভিযানের কোন নির্দিষ্ট তারিখ এবং উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না যে, বৎসরের মধ্যে এত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। অভিযানের বিভিন্ন র্গের মধ্যে কোন সংহতিও ছিল না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিশৃংখলভাবে কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। পরিশেষে, এই অভিযান জনগণের মধ্যে উৎসাহের ার করিতে পারে নাই; ফলে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত তাহাদের সহযোগিতাও সংযুক্ত নাই। স্বভাবতই, ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থ রূপ লের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ক খাদ্য ফলাও ভ্যানের ৪৩-৪৮) ব্যর্থতা

তার কারণ

অধিক খাদ্য ফলানর এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে ১৯৪৯ সালে রত সরকার বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড ওরকে (Lord Boyd Orr) এ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। লর্ড বয়েড ওরের এবং ১৯৪৭ সালে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের অধীনে নিযুক্ত দ্বিতীয় খাদ্য-শস্য নীতি কমিটির (The Second Foodgrains Policy ommittee)* সুপারিশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সরকার একটি খাদ্য িকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে ন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। পরে এই নির্দিষ্ট তারিখকে পিছাইয়া ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। এই নূতন খাদ্য পরিকল্পনায় 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান না বলিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেষ্টা (Food Self-sufficiency Drive) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

া পরিকল্পনা য়ন

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেষ্টা

এই নূতন অভিযানে পূর্বের কার্যক্রমের সকল প্রকার বিশৃংখলাকে পরিহার রিবার জন্য এবং কার্যক্রমের মধ্যে সংহতি আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। প্রত্যেক রাজ্যে ক্রমিক বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধির অংকও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; এবং নূতন জমিতে চাষের পরিবর্তে পুরাতন জমিতেই উন্নততর প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা াপক পরিমাণে করা হয়।

রাতন পদ্ধতির সহিত র পার্থক্য

পুরাতন জমিতে এই অধিক প্রচেষ্টাসমন্বিত বা আত্যন্তিক কৃষিকার্য (intensive ultivation) পূর্বের ন্যায় উন্নয়নমূলক এবং সরবরাহমূলক—এই দুই প্রকার পদ্ধতিতে

* প্রথম খাদ্যশস্য নীতি কমিটি ১৯৪৩ সালে নিযুক্ত হয়। ইহারই সুপারিশ অনুসারে অধিক খাদ্য লাও অভিযান সুরু করা হয়।

বিভক্ত ছিল। জলসেচ-ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি সক ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিকল্পনায় শস্য ছাড়া কদলী, মিঠা আলু, পেঁপে প্রভৃ খাদ্যের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবার শস্যোৎপাদনবৃদ্ধি প্রতিযোগিতা সুরু করা হয়, এবং পোকামাকড়, পংগপাল, বা হনুমান, শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে শস্যরক্ষা করিবার জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবল করা হয়।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রে এক খাদ্যোৎপাদন কমিশনার (Food Production Commissioner) নিযুক্ত হ

খাদ্যোৎপাদন কমিশনার ইত্যাদি

তাঁহার কার্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়স করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের যথে বণ্টনের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক রাজ্যে এই কার্যের জন্য এক করিয়া খাদ্যোৎপাদন পরিচালক (Director of Food Production) নিযুক্ত হ অনেক ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ছোট খাদ্য কমিটি নিযুক্ত হয়।

'বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি'

এইভাবে খাদ্যোৎপাদনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের ভিত্তিতে স্থাপন ক হয়। তৎকালীন খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর ভাষায় বলা হয় যে, ই উদ্দেশ্য ছিল, "বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি" (freedo from foreign bread)।

এই প্রচেষ্টারও ব্যর্থতা

বৈদেশিক অন্নের উপর নির্ভরশীলতা হইতে এই মুক্তি নির্দিষ্ট তারিখ—১৯৫২ সা মার্চ মাসের মধ্যে আসে নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করিব জন্য একটি কমিটি (Krishnamachari Committee) নি করা হয়।

ব্যর্থতার কারণ

কমিটির মতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতার কারণ ছিল অনেকাং প্রাকৃতিক। আসামে ভূমিকম্প, পশ্চিমবংগ পাঞ্জাব বিহার ও উত্তর প্রদেশে বন্যা, রাজস্থান সৌরাষ্ট্র পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চ অনাবৃষ্টি ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে উপরি-উক্ত পরিমাণ হ্রাস ঘটায়। প্রাকৃতি বিপর্যয় ছাড়া, এই অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হইল ইহার সংকীর্ণ পরিধি ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনের পর কৃষ্ণমাচারী কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে যে কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে খাদ্য সীমান্তে সংকট দূরিকরণ ভারতের ন্যা দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই চলে।

কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টাও অবশ্য ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল—কিন্তু কর হইয়াছিল পরিকল্পনাবিহীনভাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালী ১৯৫০-৫১ সালে তুলা, পাট ও চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (The Integrated Production Programme) গ্রহণ করিয়া কার্যকর করা হয়। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খাদ্যশস্য হইতে বাণিজ্যিক শস্যের উপর পড়ে। ফলে

।দ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি সহসা বিশেষ ব্যাহত হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ।দ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের যে-কার্যক্রম তাহার অধীনে মোট কর্ষিত জমির শতকরা ভাগও আসে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ অল্প সময়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে কিরূপে সম্ভব তাহা হজেই অনুমেয়।

দে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার চেষ্টার সুফল

তবুও এই প্রচেষ্টা বা অভিযান কৃষিকে উন্নয়নের পথে কিছুদূর লইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা বিস্তৃততর হইয়াছে, নূতন চাষযোগ্য জমির সৃষ্টি হইয়াছে, বুভুক্ষু জমি বৈজ্ঞানিক সার পাইয়াছে। উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ফলে তুলা ও টের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) **কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম (Dynamic Programme f Agricultural Production):** ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত চূড়ান্ত ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দিং খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টাকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রা হয়। কৃষির উন্নয়নের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেই সব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ িটি কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে ইহাকে মির রূপান্তরের কার্যক্রম (Programme of Land Transformation) মেও বর্ণনা করা হইয়াছে। আপাতত এই কার্যক্রমের কার্যকাল হইল

মির রূপান্তরের ার্যক্রম

১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত—এই দশ বৎসর বা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের সমগ্রটা। কিন্তু পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, আদমসুমারি কমিশনারের মতে, কৃষিজ ৎপাদনবৃদ্ধি বা ভূমির রূপান্তরের প্রচেষ্টার পরিকল্পনা বর্তমানে ত্রিশ বৎসরের জন্যই াবে হইবে, মাত্র দশ বৎসরের জন্য নহে।* পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার রিয়াছে যে কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন।** ীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে আশা করা য়। যাহা হউক, বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতেই কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্যায় (First Phase): পরিকল্পনাকারিগণ এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন য়, ভারতীয় কৃষকের জীবন এক পূর্ণাংগ জীবন। ইহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া

ষিজ উৎপাদনের তিশীল কার্যক্রমের আলোচনা

দেখার দরুন এ-পর্যন্ত কৃষিগত উন্নয়ন বা খাদ্য-সমস্যার সমাধান কোনটাই সম্ভব হয় নাই। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার অধীনে, গ্রাম্য মহাজন ও ভূস্বামিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষকদের রা বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** Second Five Year Plan—২৫৯ পৃষ্ঠা।

নিরর্থক না হইয়া পাবে না। সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ কা তুলিবার ব্যবস্থা কবিতে হইবে; এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষকের জীবনের পূর্ণ রূপা ঘটাইতে হইবে। প্রধানত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Devel ment Projects) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (Natio Extension Service)* দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন কবি প্রচেষ্টা করা হইলেও জলসেচ-ব্যবস্থা, কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, পা জমির পুনরুদ্ধার, কৃষিকার্যে উন্নততব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষ ফলের প্রয়োগ, প্রভৃতি পুরাতন পন্থাও অবলম্বিত হইবে। মহিষ, হাঁস মুরগী ইত্যাদি পালন এবং গ্রাম্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে বৈ ও ব্যাপকতা আনয়ন করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও সমবায় আন্দোলনকে নূতন ভি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নূতন ভূমিনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কৃষি-শ্রমি জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

কৃষির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সমবায় আন্দোলনের প্রসার প্রভৃতি অন্যান্য মাধ্যম

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায বা প্রথম পর্যায়ে উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কিন্তু প্রাথ ভাবে খাদ্য-সংকটের সমাধানের লক্ষ্যাভিমুখীই করা হয়। অনুমান করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

ঐ পবিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় ৬৪২ ে টাকা বা মোট পবিকল্পনার শতকরা ২৭·২ ভাগ।** ইহাব কৃষির উন্নয়নেব কার্যক্রমকেই শীর্ষস্থান দান কবা হইয়াছি পরিকল্পনা কমিশনের মতে তৎকালীন ঘাটতিও মুদ্রাস্ফী পরিস্থিতিতে এরূপ কবা সম্পূর্ণই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল। †

পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের কাযক্রমকে শীর্ষস্থান দান

ফলাফল ঃ অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইবার বৎসরেই—অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত প্রাকৃতিক ি হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকায় শস্যোৎপাদন স্বাভাবিকই হয় পর বৎসব ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের উৎপাদনেব এরূপ বৃদ্ধি ঘটে যে, ইহা প্রথম পঞ্চবা পরিকল্পনার নিদিষ্ট অংককে ৭১ লক্ষ টনের মত ছাড়াইয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১৯৫ সালের মধ্যে ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; ১৯৫৩-৫৪ সালেব মধ্যেই ১·৪৭ কোটি টন অধিক বা নিদিষ্ট অ ৭১ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। মোট খাদ্যশস্যের উৎ হইয়াছিল ৮·৭৮ কোটি টনের মত। ১৯৫৩-৫৪ সাল খাদ্যশস্য উৎপাদনে আবার স

১৯৫৩-৫৪ সালে আশাতীত শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি

খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড

* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রাষ্ট্র ও কৃষির (State and Agricultural Re-construction) সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

** Second Five Year Plan—৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

† „ „ „ „ ২৫৫ পৃষ্ঠা।

...স্ত বা রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—এত অধিক খাদ্যশস্য ভারতীয় ইউনিয়নে আর কখনও ...পন্ন হয় নাই।

খাদ্যশস্যের মধ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধিতে চাউল আর সকলকে ছাড়াইয়া যায়। ১৯৫৩-৫৪ ...লে ২.২৫ কোটি টনের মত ধান্য উৎপন্ন হয়, ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অংক গিয়া দাঁড়ায় প্রায় ২.৭৮ কোটি টনে। ধান্যের এই অভাবনীয় উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ প্রধানত দুইটি: ধান্য উৎপাদনে অধিকতর কৃষি ভূমি নিয়োগ, এবং জাপানী পদ্ধতিতে ধান্যের চাষ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ...ত মুক্তির কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

...ন্যর সর্বাধিক ...পাদন

খাদ্যশস্যের উৎপাদন এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহির হইতে খাদ্য আমদানির ...য়োজনীয়তা ক্রমশ কমিয়া যায়। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টনের কিছু উপর খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, এবং ইহা করা হয় সঞ্চয় বা রিজার্ভ করিবার জন্য—ঘাটতি মিটাইবার জন্য নহে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে আমদানি করা হইয়াছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল ...সে ১৬ লক্ষ টনের মত চাউল উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার মধ্যে অন্তত ২৫ ...ক টনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে কারণ ইহা ছিল ২-৩ ...সরের পুরাতন চাউল এবং ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার পূর্বেই অবশ্য ... চাউলের রপ্তানি সুরু হইয়া গিয়াছিল।

...মদানি হ্রাস ও ...নি সুরু

১৯৫২-৫৩ সাল হইতেই খাদ্য পরিস্থিতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মাদ্রাজ ...কারের পদাংক অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের কবল হইতে মুক্ত হয়। ফলে খাদ্য-...স্যার পরিমাণ ও বণ্টনগত দিকের একপ্রকার সমাধান ঘটে।

...মিক বিনিয়ন্ত্রণের ...তি গ্রহণ

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন পুনরায় কমিয়া গিয়া ...৫০ কোটি টনে দাঁড়ায়। তাহা হইলেও ইহা ছিল পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য ...তে ৩৪ লক্ষ টন অধিক। সুতরাং পরিমাণগত দিক দিয়া ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ...দ্য সমস্যা আর মাথা উঁচু করিতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই ...স্যা আবার মাথা উঁচু করিয়াছে বণ্টনগত ও মূল্যের দিক দিয়া। এ-সম্বন্ধে আলোচনা ...কটু পরেই করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পর্যায় (Second Phase): কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের ...তীয় পর্যায় হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর্যায়। অর্থ-ব্যবস্থার এই পর্যায়ে মূল শিল্পগুলির (basic industries) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও ...দিকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই; বরং প্রথম পরিকল্পনার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত

...তীয় পর্যায় বলিতে ...তীয় পরিকল্পনা বুঝায়

হিসাবে কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের দ্বিতীয় দফাকে কার্যকর করি পর্যাপ্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে ১ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির ল নির্দিষ্ট করা হয়। ইহা করা হইয়াছিল নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের কথা চিন্তা করি

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

(১) মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (২) নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, (৪) দ্বিতীয় পরিকল্প ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, (৫) খাদ্য ব্যবহারের উপর জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বণ্টনগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া।

বর্তমান মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার—অর্থাৎ ১৭.২ আউন্সের হিসাব ধরিলে দ্বি পরিকল্পনার শেষে মোট ৭ কোটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু প কল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছে যে ইতিমধ্যে খাদ্যব্যবহার বাড়িয়া ১৭.২ আউন্স হ ১৮.৩ আউন্সে দাঁড়াইবে। সুতরাং মোট খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হইবে ৭.৫০ ক টন—১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন হইতে ১ কোটি টন অধিক।

পরে প্রধানত মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে অ-পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। এবং উহাকে বাড়াইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। ১৯৫৭ সা খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি অবশ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না। ক অনুমান করে যে ১ কোটি ৩ লক্ষ টনের মত অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়ত স হইবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে খাদ্যের গুণগত উন্নয়নের কথাও বলা হইয়াছে। উদ্দেশ্যে কৃষির উৎপাদনের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার ফ উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় এ-কার্য করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন পূর্বের বৎ তুলনায় শতকরা ৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।** কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশ উৎপাদন পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯.৮ ভাগ কমিয়া যায়। ১৯৫৬-৫৭ খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালে আবার উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া করা হইয়াছে। ঐ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনের মত হই বলিয়া অনুমান করা হয়।†

যাহা হউক, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির গতি কাম্য বি হয় নাই। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council)

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957—৬৯ পৃষ্ঠা।

** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—৩৯-৪৬ পৃষ্ঠা

† Report on Currency and Finance, 1958-59.

াটি কৃষিজ উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে পাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। এরূপ হইবার একাধিক কারণ য়াছে। সেচসমন্বিত এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় শিথিলতা, ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের রিকল্পনাসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অভাব, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন রিকল্পনাধীন অঞ্চলে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করা, উপযুক্ত সংখ্যক জ খামারের (seed farms) অভাব প্রভৃতির জন্যই কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট মাত্রায় বাড়ান ম্ভব হয় নাই। অথচ দেশের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি রিয়া চলা সমীচীন নয়। সুতরাং উপরি-উক্ত ত্রুটিসমূহ দূর করিয়া কৃষি-উৎপাদনকে দ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় ষি-উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি এবং র্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলও অনুরূপ উক্তি করিয়াছে।*

খাদ্য-সমস্যা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Food Problem and Economic Planning): অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের যোগান-দ্ধির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে যে সকল লোকদের য়োগ করা হইবে তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্য বিশেষত খাদ্য সরবরাহ রিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে পরিকল্পনার কার্যাদি ব্যাহত ইতে বাধ্য। বিশেষত আমাদের দেশে ছদ্মবেকারীর সংখ্যা অনেক। ইহাদের মি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নকার্যে নিয়োগ করিতে হইলে াদ্যযোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে বেশীর ভাগ লাক অর্ধভুক্ত, সুতরাং উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে নিয়োগের ফলে যখন সাধারণ লাকের হাতে টাকাপয়সা যাইবে তখন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এই চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ব্যাপক আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা টানিয়া আনিবে। আবার ভারতের মত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও অধিক এবং উন্নয়নমূলক কার্য প্রসারের সংগে সংগে এই বৃদ্ধির হার আরও অধিক হইবে। সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্যও খাদ্যযোগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।† ইহা ছাড়া ভারতের ন্যায় দেশে মূলধনের সংগতি খুব সামান্য। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্য আমদানি করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশে যদি খাদ্যাভাব থাকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়; মূলধন-দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় খাদ্যের গুরুত্ব

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee—১০৫-১১৮ পৃষ্ঠা এবং India's food crisis and steps to meet it.

† The Economics of Industrialisation—B. Datta.

মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার জ জরুরী অবস্থাব ভিত্তিতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বস্ত ইহাই পরিকল্পনার সফলতার প্রাথমিক সর্ত।

খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক (Recent Aspect of Foc Problem): খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচন খাদ্যশস্যের অকল্পিত মূল্যবৃদ্ধিকেই বুঝায়। পবিকল্পনা কমিশ উপদেষ্টা শ্রী ই. পি. মুনের (E. P. Moon) ভাষায় বলা যায়, 'দ্বি পরিকল্পনা প্রবর্তনের ৬ মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক মূল্য পরিকল্পনাব অনিশ্চযতার অন্যতম সূচক।' ১৯৫৫ সালেব জুন মাস হইতে যে মূল্যবৃ প্রবণতা দেখা যায় তাহা ১৯৫৬-৫৭ সালে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। ১৯৫৭ সালে খাদ্যদ্রব্যেব মূল্য কতকটা স্থির থাকিলেও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা ১৯৫৫-৫৬ সা তুলনায শতকবা ১১·২ ভাগ বৃদ্ধি পায। ১৯৫৮ সালের মে মাস হইতে মূল্যবৃ প্রবণতা বর্বিত হারে দেখা দিয়াছে বলা যায়।

সাম্প্রতিক দিক বলিতে কি বুঝায়

মূল্যবৃদ্ধির কারণ

খাদ্যশস্যের এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিবই এ দিক। তবে পৃথক্‌ভাবে ইহাব কারণসমূহকে এইভাবে বর্ণনা ব যাইতে পারে:

১। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায ১৯৫৪ ৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশ উৎপাদন কমিযা যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৫৭-৫৮ স আবাব ৫০ লক্ষ টনের মত হ্রাস পায়।*

২। পরিকল্পনাব উন্নযনমূলক কাজকর্মের জন্য লোকের আর্থিক আয়ের বেশ কিছু বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত আয়বৃদ্ধিব য লোকের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস কতবটা পবিবর্তিত হইয়াছে। যাহারা পূবে জো বাজবা মিষ্টি আলু প্রভৃতি খাইত তাহারা এখন চাউল ও গমের দিকে ঝুকিয়াছে।

৩। ১৯৫৪ সালে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ করার পর হইতে লোকের মাথাপিছু খাদ্যগ্রহ পরিমাণও বাড়িয়া ১৪ আউন্স হইতে ১৭·২ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। ব্যবসায়ী মহলের একাংশে ধারণা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায শি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং নিযুক্ত শ্রমিকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা স হইবে না এবং মূল্যবৃদ্ধি হইতেই থাকিবে। ফলে ইহারা মাল মজুত করিবার দি ঝুঁকিয়াছে; অবস্থাপন্ন কৃষকরাও খাদ্যশস্য মজুত করিতে সুরু করিয়াছে।

৫। পরিবহনের অ-ব্যবস্থার জন্য অনেক স্থলে আঞ্চলিক বণ্টনেও বিশেষ অসুবি দেখা দিয়াছে।

৬। সরকারের ঘাটতি ব্যয় ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের পরিমাণের বৃদ্ধিও মূল্যবৃ অন্যতম কারণ।

* Report on Currency and Finance, 1958-59

খাদ্যশস্যের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির সূচনাতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত, খাদ্যশস্যের যে রপ্তানিকার্য ১৯৫৪ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া ‍ওয়া হয়।

‍লম্বিত প্রতিবিধান

দ্বিতীয়ত, খাদ্য পুনরায় আমদানি করা সুরু হয়। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৮ ‍ল—এই ৪ বৎসরের মধ্যে ৮৯ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।

তৃতীয়ত, বণ্টনগত ত্রুটি দূরিকরণের ব্যবস্থাও যথাসম্ভব অবলম্বন করা হয়। এই ‍দ্দেশ্যে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ (procurement) এবং বাজার ‍ইতে খাদ্যশস্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের ‍ায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহকার্য ‍ষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ‍ায় প্রত্যেক রাজ্যেই ধান্য ও চাউলের উচ্চতম দাম বাঁধিয়া দিয়াছে।

চতুর্থত, আঞ্চলিক ঘাটতি দূরিকরণের জন্য সম্প্রতি খাদ্য জোনের (Food Zone) ‍ষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যাকে মিলাইয়া একটি ‍দ্য জোনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল উড়িষ্যা হইতে ঘাটতি অঞ্চল ‍শ্চিমবংগে খাদ্যশস্য সহজে আসিতে পারিবে। অপরদিকে কয়েক ক্ষেত্রে আবার ‍টতি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধান্য ও গমের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা ‍ইয়াছে।

পঞ্চমত, খাদ্যদ্রব্যের অপচয়মূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে। ‍যমন, ১৯৫৮ সালের পশ্চিমবংগে অতিথি নিয়ন্ত্রণ নিদেশ (West Bengal Guests ‍Control Order, 1958) অনুসারে বিবাহ বা শ্রাদ্ধে ১০০ জনের অধিক লোককে ‍াউল ও গম জাত খাদ্য পরিবেশন করা যায় না। অন্যান্য উৎসবের বেলায় নিমন্ত্রিতের ‍ংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইতে পারে না।

ষষ্ঠত, রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ‍বিচালিত করা হইতেছে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে (Banking Companies ‍Act) রিজার্ভ ব্যাংককে নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ (selective and direct ‍credit control) করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংক ‍খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

সপ্তমত, যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত এবং মালমজুত বন্ধ হয় তাহার জন্য উপযুক্ত আইন ‍প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী আইন (Essential ‍Commodities Act) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইনে নির্দিষ্ট মূল্যে সরকার মজুত ‍খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ধান্য ও চাউল, ডাইল এবং কয়েকটি ‍নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আগাম ও চুক্তির কারবার (forward and specific delivery contract) বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমদানিকৃত

খাদ্যশস্য যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য সরকার আর একটি নির্দে জারি করিয়াছে। এই নির্দেশ অনুসারে মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীরাই আমদানিকৃ খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে পারে।

অষ্টমত, দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে সরকার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে খাদ্যশ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত অনুসা একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে উহা ঘোষণা করে পরিকল্পনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি: (ক) যাহাতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের দিক দিয়া ন্যায্য বিবেচিত হয় এরূপভাবে খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণ করা ও বজায় রাখা, এবং (যাহাতে ভোক্তা-প্রদত্ত মূল্যের সর্বাধিক অংশ উৎপাদকের হস্তগত হয় তাহা দেখা—অর্থা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের মুনাফার বিলোপসাধন করা। প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রী বাণিজ্য চাউল এবং গম লইয়াই সুরু করা হইবে এবং এই বাণিজ্যে সরকার মুনাফা করি না, ক্ষতিও স্বীকার করিবে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাই ধান্য ও চাউ লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করে। বর্তমানে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যও এ-বিষয়ে উড়িষ্যা অনুবর্তী হইতে চলিয়াছে।*

পরিশেষে, খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে। উন্নয়নমূল পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছোট ও মধ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের (seed farms) প্রসার ও জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কৃষি-উৎপাদনাভিমুখী করিয়া তোলা হইতেছে।** দ্বিতী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তিত লক্ষ্য ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee):

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা হইতেই খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণানুসন্ধান ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহা অশোক মেটা কমিটি নামেও পরিচিত। কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টে কমিটি প্রথম পরিকল্পনার সূচনা হইতে খাদ্য পরিস্থিতি (food situation) এবং সরকারী খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় (১৯৫০-৫১) ভারত খাদ্য-সমস্যায় প্রপীড়িত ছিল এবং তখ

* Report on Currency and Finance, 1958-59.

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—৪১-৪৬ পৃষ্ঠা।

দ্রব্যের মূল্য ছিল অত্যধিক। পরবর্তী দুই বৎসরে সরকারী মজুত খাদ্য বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া, অধিক উৎপাদন এবং টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়া একরূপ স্থিতিশীল হয়। তারপর ১৯৫৩ ৫৪ সালে অভূতপূর্ব শস্যোৎপাদন শস্যের ক্ষেত্রে মন্দাবাজারের (depression) সূচনা করে। মন্দাবাজারের প্রতিরোধকল্পে সরকার চাউল রপ্তানি প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে সাধারণের এই ধারণাই হয় যে খাদ্যশস্যের মূল্য আর হ্রাস পাইবে না।

-পরিস্থিতির আলোচনা

তারপর কিন্তু ১৯৫৬ সালের শেষ দিক হইতে একটি সংবাদ প্রচারের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য আবার ঊর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। সংবাদটি হইল জোয়ার, বাজরা (millets) প্রভৃতির উৎপাদনহ্রাস। সরকার এই সকল শস্য মজুত করে নাই এবং মজুত গমের পরিমাণ বিশেষ অল্প—লোকের এই ধারণা থাকায় খাদ্যশস্যের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়; এই ঊর্ধ্বমুখী গতি সারা ১৯৫৬ সাল ধরিয়াই অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে শস্যের উৎপাদন আবার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই গতি রুদ্ধ হয় নাই। কমিটির মতে, ইহা চাহিদার শক্তিই (strength of the demand factors) নির্দেশ করে। ইহার পর কমিটি উক্তি করিয়াছে যে খাদ্যশস্যের মূল্যের অনিশ্চয়তা কৃষকের আয়, জীবনযাত্রার ব্যয়, উৎপাদন-ব্যয়, নিয়োগ প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহাকে অন্যতম গুরুতর অর্থ নৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

চাহিদার শক্তি বৃদ্ধিই বর্তমান সংকটের কারণ

বণ্টন-ব্যবস্থা ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সরকারী খাদ্যনীতির অনির্দিষ্টতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে খাদ্য বণ্টন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণে যাইয়া আবার আংশিক নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া আসে। উৎপাদন কার্যক্রমের সম্পর্কে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' হইতে শুরু করিয়া খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করিয়া কমিটি বলে ভারতের ন্যায় অর্ধভুক্ত জনগণের দেশে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ 'চলমান লক্ষ্য' (moving target) হইতে বাধ্য—কারণ জনসাধারণের আয় সামান্য বাড়িলেই ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সত্য; কিন্তু ঐ পরিকল্পনায় প্রথমে খাদ্য উৎপাদনের উপর দৃষ্টি দিয়া পরে সমাজোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রসমূহেও ১৯৫৪ সালের পর (বিনিয়ন্ত্রণের ফলে) কৃষিজ উৎপাদনের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল। ফলে প্রথম পরিকল্পনায় যত অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় নাই। ইহার ফলেই খাদ্য পরিস্থিতি এতটা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী নীতির ত্রুটি

চলমান লক্ষ্য

তবু কমিটির অনুসরণে, বলা যায় এই খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধিরই একটা দিক। এই সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রধানত ঘাটতি বাজেট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

বৃদ্ধির দরুন। সাধারণের আয় নিয়মিত বাড়ার ফলে খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও খ স্বভাব (food habits) উভয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। অর্ধভুক্ত জন অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, এবং যাহারা পূর্বে জো বাজরা প্রভৃতি খাইত তাহারা চাউল ও আটার দিকে ঝুঁকিয়া ইহার উপর মজুত রাখিবার ইচ্ছাও (propensity of stock) বাড়িয়া গিয়া শুধু যে ব্যবসায়ীরা মজুত করিতেছে তাহা নহে, সাধারণ কৃষকও মজুতের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে। ফলে অ-কৃষিজীবী জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ক গিয়াছে।

খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটি দিক

কমিটির পরবর্তী বক্তব্য হইল যে, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে খাদ্য-সমস্যার ভবিষ্যৎ স কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—কারণ যে যে বিষয়ের উপর ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে যথা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরিকল্পনার ভোগের ইচ্ছা, মজুত রাখিবার ইচ্ছা ইত্যাদি—তাহারা অতিমা পরিবর্তনশীল। তবে কমিটি ধরিয়া লইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যাবৃ দরুন খাদ্যের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার উপর আয়বৃ জন্য শতকরা ৪ ৫ ভাগ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মোট বর্ধিত চাহিদার পরিমাণ শত ১৪-১৫ ভাগ। এই হিসাব ধরিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টনের খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়

কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টনের মত হইবে বলিয়া হইয়াছে। সুতরাং ১৫ লক্ষ টন ঘাটতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ঘাটতি আমদা মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হইবে।

অতএব পরিমাণগত দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা আশংকাজনক নহে; কিন্তু মূল্যের দিয়া নিশ্চয়ই আশংকাজনক। খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন না করিলে সমগ্র দ্বি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। স্থায়িত্ব আনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়া অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধকরণ হইয়া নিয়মিতকরণ হইবে (Controls should be of regu tory rather than of restrictive type)।

মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

এই নিয়মিতকরণ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজারে নিয়মিত খাদ্যশস্য ক্রয়-বি পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্য খুচরা ক্রয়-বিক্রয়, উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম মজুত রাখা, প্রধ প্রধান খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য গ্রহণের জন্য প্রচারক চালাইয়া যাওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে প্রয়োজনবোধে অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও পন্থা

খাদ্যশস্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা (consumers) ও উৎপাদক কাহারও অসুবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। উপরন্তু, সাধারণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া খাদ্যমূল্য দমিত রাখা যাইবে না। এই দুই কারণে প্রয়োজন হইল এমন একটি গঠনের যাহা বিভিন্ন সময়ে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

কমিটির মতে, এইরূপ সংগঠন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—(১) একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (a Price Stabilisation Board), এবং (২) একটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (a Foodgrains Stabilisation Organisation। ইহার মধ্যে প্রথমটি সাধারণ মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ করিবে; এবং দ্বিতীয়টি এইভাবে নির্ধারিত নীতির যে অংশ খাদ্যশস্যের মূল্যের সহিত সম্পর্কিত তাহাকে কার্যকর করিবে। এই দুইটি সংগঠনের প্রত্যেকটির সহিত বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি করিয়া উপদেষ্টা পরিষদও সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ট সংগঠন স্থাপন জন

খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন হইবে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সর্বপ্রধান কার্যকরী সংস্থা। ...শের সর্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা ও গুদামঘর থাকিবে, এবং একমাত্র ইহার নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাই খাদ্যশস্যের কারবার করিতে পারিবে। সংগঠনের প্রধান কার্য হইবে আশংকা দূরীকরণমূলক কারবার করা (buffer stock operations) অর্থাৎ মূল্যহ্রাসের সময় ক্রয় করা এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় বিক্রয় করা। ইহা ছাড়াও সংগঠনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে হইবে। সংগঠন খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুত রাখার ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করিলে আবশ্যিকভাবে কৃষকগণের নিকট হইতে ...ন্য মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ (procurement) করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি বলিয়াছে যে খাদ্য বণ্টন প্রধানত ন্যায্য মূল্যের দোকানে (fair price shops), সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে করিতে হইবে। বর্তমানে মাথাপিছু ১২ আউন্স করিয়া গম সরবরাহ করা গেলেও বিশেষ পরিস্থিতির জন্য চাউল সরবরাহ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। চাউল দক্ষিণ ভারতে মাথাপিছু ৮ আউন্স করিয়া, পূর্ব ভারতে ৬ আউন্স করিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৪ আউন্স করিয়া সরবরাহ করা হইবে। ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে বিনা মুনাফায় বিক্রয় করিতে হইবে, এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম দামে (at subsidised prices) খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে হইবে। উৎপাদন বিশেষ হ্রাস পাইলে বা আমদানির পরিমাণ কমিয়া গেলে বড় বড় শহরকে গণ্ডি দিয়া এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে এইসকল শহরের চাহিদা অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি না করে।

...কালীন ব্যবস্থা

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ না হয় তাহার জন্য খাদ্য জোনে'র সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ জোন সৃষ্ট হইলে সরকারের পক্ষে শুধু ঘাটতি অঞ্চলকে সরবরাহ করিলেই চলিবে; সমগ্র দেশকে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

স্থানীয় সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সর্বদা স্থ. ঘাটতিকে (local deficits) খুঁজিয়া বাহির করিয়া সত্বর প্রতিবিধান অবলম্বন কবি কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সমবায় সমিতিসম যেখানে প্রয়োজন সেখানে শস্যগোলা স্থাপন করিবার জন্য অর্থসা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্থলেই খাদ্য পরিচালনা (food adminis tion) স্থায়ী ভিত্তিতে করিতে হইবে।

স্থানীয় ঘাটতি

কমিটির মতে, কতকগুলি অঞ্চল—যথা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি অধিক সময়ই ঘাটতি-অঞ্চল থাকিবে কারণ এই সকল অঞ্চলে নিয়ে অত্যল্পতার জন্য লোকের ক্রয়শক্তি কম। সুতরাং ইহাদের প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

ঘাটতি অঞ্চল

পরিশেষে আছে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির কথা। ছোট খাট জলসেচ-ব্যবস্থা, স বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি সংস্কারকে ত্বরান্বিত করা প্র মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু পর্যাপ্ত নয়; সংগে সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হ তাহা না হইলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সকলই বিফল হইবে।

উৎপাদনবৃদ্ধি অপরিহার্য

কমিটি আঞ্চলিক ও দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে খাদ্য সংকটের বি সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়াছে।

মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট (Report of the Ameri Team of Agricultural Specialists): ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞকে এদেশে আমন্ত্রণ আনা হয়। ঐ কৃষি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এবং ভা কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি বি রিপোর্ট প্রদান করে।

রিপোর্টে কৃষি বিশেষজ্ঞ দল প্রথমেই বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদ হার যে তাল রাখিতে পারিতেছে না তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়াছে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, পর্যাপ যোগানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অর্থনৈতিক পরিক সমাজ-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কোনটাই সফল হইবে না।

খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্ব

রিপোর্টটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয় কি কি অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাহার কথা বলা হইয়াছে; এবং অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টের অংশে করা হইয়াছে। নিম্নে রিপোর্টটির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল।

রিপোর্টটির তিন অংশ

…ীয় পরিকল্পনায় …শস্যের …জনীয়তা

কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৮ কোটিতে পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতই খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তাও বর্তমান (১৯৫৮-৫৯ সাল) ৭ কোটি টন হইতে ঐ সময়ে ১১ কোটি টনে গিয়া দাঁড়াইবে অনুমান করা যাইতে পারে। …শ্য ১১ কোটি টনের সমস্তটাই ভোগের (consumption) জন্য প্রয়োজন হইবে না। …ে পিছু ১৮ আউন্সের ভিত্তিতে ভোগের জন্য প্রয়োজন হইবে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন …° বাকী ২ কোটি ২০ লক্ষ টন প্রয়োজন হইবে বীজ, মজুত রাখা ইত্যাদির জন্য। …ংকথা, কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য

…পাদনবৃদ্ধির হার …হওয়া উচিত

উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে যে-হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টনের অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। …তএব, বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদনবৃদ্ধির হার শতকরা ৩·২কে শতকরা ৮·২-এ লইয়া …ওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, সুচিন্তিত খাদ্যোৎপাদন কার্যক্রমের অনুসরণ …ে এই লক্ষ্যে পৌঁছান মোটেই অসম্ভব নহে।

…াদনবৃদ্ধির …বন্ধক

তারপর বিশেষজ্ঞ দল যে যে বিষয় ভারতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ও জলসংরক্ষণের অ-পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, বহুসংখ্যক অকর্মণ্য গো-মহিষ, কৃষিকার্যের আদিম পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি, পোকামাকড়ের …াত, অসম্বদ্ধ জোত, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, অপ্রচুর ও দুর্মূল্য কৃষি-ঋণ, কৃষকদের মধ্যে …সাহ ও উদ্দীপনার অভাব এবং বিভিন্ন খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে সংহতির …পস্থিতি-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, এই সকল প্রতিবন্ধকের গুলিই অপসারণযোগ্য।

…করণের পর্যাপ্ত …হারের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করার সংগে সংগে খাদ্যোৎপাদনের যে-সকল উপকরণ রহিয়াছে তাহাদেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বেকার ও অর্ধ-বেকার রহিয়াছে তাহা উৎপাদন-সম্ভাবনার একটা বিরাট অংশের অপচয়ই নির্দেশ করে। …ইরূপ অপচয় বন্ধ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় যে ৮ …োটির মত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে তাহার মধ্যে ৬½ কোটি হইবে গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং

…র্মসংস্থান ও …দ্যোৎপাদন

ইহাদের কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের বাঁধ দেওয়া, জমি সমান করা, জল নিষ্কাশন, জলসেচ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইহা যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন- …দ্ধিতেই সহায়তা করিবে তাহা নহে, ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের আয়বৃদ্ধিও …টিবে। উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এইরূপ নিয়োগের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না।

বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী সুপারিশ হইল যে বীজ সার ইত্যাদি সরবরাহ, ঋণদ জলসেচ প্রভৃতি কার্যের সংহতিসাধনের জন্য একটি উচ্চ পর্য

উচ্চপর্যায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব (a high level centralised authority) প্র প্রয়োজন। এই কর্তৃত্বের উপর খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নী কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হইবে।

তারপর কৃষি বিশেষজ্ঞ দল খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের উপর গুরুত্ব আরে করিয়াছে। কৃষককে উন্নততর বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহারে উৎসাহি করিবার জন্যই সরকার হইতে খাদ্যশস্যের নিম্নতম মূল্য নির্ধা

মূল্য স্থায়িত্বকরণ

করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শুধু নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলে চলিবে না, কৃষক যাহাতে ঐ মূল্যে নিকটবর্তী বাজারে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে পা তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বিক্রয় না করিয়া সে যদি দামবৃদ্ধির আশায় শস্য মজ রাখিতে চায় তাহার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শস্যগোলাও গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতে হইবে দলটির মতে, খাদ্যশস্যের দাম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও উহাকে কার্যকর করার জ একটি স্থায়ী সংস্থা (a permanent agency) গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, ন্যায্য খাজনা-ব্যবস্থা, অসম্বদ্ধ জোতের সংহতিসা ইত্যাদি খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ দ

অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা

জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling fixation) এবং অন্যা ভূমি-সংস্কার কার্য অতি দ্রুত শেষ করিতে সুপারিশ করিয়াছে।

কৃষি-ঋণের অপ্রাচুর্যহেতু খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য বিশেষ দল প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকে রাজ্য সরকার হইতে ঋণদানের পরামর্শ দিয়াছে দলটি ইহাও বলিয়াছে যে কৃষকের ঋণগ্রহণযোগ্যতার (credit worthiness) নূত সংজ্ঞা দেওয়া উচিত—ঋণগ্রহণযোগ্যতার বিচার জমির মালিকানার ভিত্তিতে না করি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, অনুমিত উৎপাদন ইত্যাদির ভিত্তিতেই করা উচিত।

কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, বর্তমানে খাদ্যোৎপাদনের উপর সম্প্রসারণ কার্যে (extension work) কোন প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য দলটি সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলি ও অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারণকার্যের উপর অধিক গুরুত্ব স্থাপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে খদ্যোৎপাদন কমিটি গঠন কর প্রয়োজন।

পরিশেষে আছে উন্নততর বীজ ও সার উৎপাদন ও বণ্টনের কথা, জলসেচ ব্যবস্থা প্রসার ও সুপরিচালনার নির্দেশ এবং মিশ্র কৃষিকার্য (mixed

জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার

farming), কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন, অকর্মণ্য গো-মহিষাদি সংখ্যাহ্রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ। দলটির মতে, বৃহৎ বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা অপেক্ষা জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারাই বর্তমানে খাদ্যোৎপাদ

নাংশে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সার সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে বৈদেশিক সংগতির যথাসম্ভব যেন সার আমদানিতেই ব্যয়িত হয়।

রিপোর্টটির এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুসরণের সব ব্যবস্থা সমন্বিত কোন প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে আরও নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিবে। তবে বর্তমানে নির্বাচনমূলক এবং আত্যন্তিক (selective and intensive) কৃষিকার্যের পথে সর হওয়া যাইতে পারে। ধান্য ও গম প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া কতকগুলি নির্বাচিত ল কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহাদিগের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে দ্যাৎপাদনের যে-কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতেছে তাহার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ন করিবার পূর্বে উহার ফলাফল বিচার করিবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র xperimental projects) স্থাপন করিতে হইবে। ইহা না করিলে খাদ্য-সংকট ভূত না হইয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

র্টটির উপসংহার

উপসংহার : ভারতের খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি যে অস্থায়ী নয়, একবার অনুমিত কৃষিজ পাদন ঘটিলেই যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয় না ইহাই খাদ্য অনুসন্ধানকারী কমিটি র্কিন বিশেষজ্ঞ দল সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনের চলমান য (moving target) নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই চলমান লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে ভোগ মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা উভয়ের ভিত্তিতে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত না খতে পারিলে ভারতকে সর্বদাই খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন থাকিতে হইবে কারণ কৃষিজ পাদন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহার হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া ক। খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূল্য স্থিতিকরণ যে অপরিহার্য তাহা উভয় দলই ঘোষণা য়াছে। মূল্যে স্থায়িত্ব না আসিলে শুধু যে জনসাধারণ প্রপীড়িত হইবে তাহা নহে, ও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে না। এই মূল্য স্থায়িত্বকরণের উদ্দেশ্যেই খাদ্যে য় বাণিজ্য (State Trading) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরও সুস্পষ্টভাবে তে গেলে, এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যাহাতে ভোক্তা বা উৎপাদক কাহারও অসুবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। মূল্য ত্বকরণ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করিবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থাও যে য়াজনীয় তাহাও সরকার স্বীকার করিয়াছে, এবং ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৬০ সালের ম ভাগেই ইহা গঠন করা হইবে। উভয় রিপোর্টের অন্যান্য সুপারিশের কোন্‌টি কি মাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা যাইবে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ শিত হইলে। তবে এ-কথা ঠিক যে ঐ পরিকল্পনায় চলমান লক্ষ্যের ভিত্তিতে দ্যাৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে—নচেৎ খাদ্য সংকটের জন্যই কল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature of Food Problem in India. (২০৬-২০৯ পৃ

2. Indicate the nature of our Food Problem in relation to the growth population. (৭৪ এবং ২০৯২

3. Review the measures that have been adopted to tackle the F Problem.

[ইংগিত : সামগ্রিকভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধান বলিতে খাদ্য সমস্যার সাম্প্রতিক দিককেও বুঝ সুতরাং উহার প্রতিবিধানকল্পে যে-সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে।... ২১২-২২৪ পৃষ্ঠা]

4. What is dynamic programme of Agricultural Production ? Indicate aims and achievements. (২১৭-২২১ ৮

5. Discuss the recent aspect of our Food Problem. Review the measu that have been adopted to deal with it. (২২২-২২৪ পৃ

6. Discuss in brief the recommendations of the Foodgrains Enqu Committee, 1957. (২২৪-২২৮ পৃ

7. Briefly discuss the Report on India's food crisis by the American Te of Agricultural Specialists. (২২৮-২৩১ পৃ

8. Examine the importance of increasing the production of Foodgrains i developing country like India. (C U. B. Com. 1

[ইংগিত : ভারতের মত অনুন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কর্ম-ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুর কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অপরিহার্য ভোগ্যপণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্য প্রধানতম। পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যে বিনিয়োগ করিয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়া স পরিকল্পনাই বানচাল করিয়া দিতে পারে। উপরন্তু, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতিকে যথাসম্ভব উন্নয়নমূ কার্যে নিয়োগ করিবার জন্যও খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি ও মা কৃষি বিশেষজ্ঞ দল এই কথাই বলিয়াছে। ২২১ ২২২, ২২৪ ২৩১ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভূমি-সংস্কার

(Land Reforms)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, কৃষি জমি ও কৃষির মালিকানাই বোধ হয় জাতীয় উন্নয়নের সবপ্রধান সমস্যা। যেভাবে কৃষি-জমি সম্পর্কিত এই সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার উপরই ভবিষ্যতের আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, ভূমি সংস্কারের সহিত সম্পর্কিত সংস্থাসমূহের গুরুত্বগুলি অত্যধিক—কারণ প্রথমত, ইহারা কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত পটভূমিকার সৃষ্টি করে, এবং দ্বিতীয়ত, ইহারা বহু পরিমাণে সংখ্যাধিক জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।†

কৃষি জমির মালিকানা সম্পর্কিত এই সমস্যার উদ্ভব হয় ব্রিটিশ আমলে বিশেষ ধরনের ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার জন্য। বস্তুত, যেদিন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিল একরূপ সেইদিন হইতেই কৃষি জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পূর্বে—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান যুগে ভূমিকে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (village committee) সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। ঐ সময় নৃপতি যে ভূমি হইতে আয়ের একাংশ পাইতেন তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রথাগত। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার জন্যই ইহা তাঁহাকে প্রদান করা হইত।

এই ব্যবস্থার পরিবর্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাশ্চাত্য নীতি যে রাষ্ট্রই সকল প্রকার জমির মালিক, এই নীতি প্রবর্তন করে এবং দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে জটিল ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থাধীনে যে ভূমি-সংস্কার কার্য চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য এই ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি ও উদ্ভবের ইতিহাসের সামান্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা ও তাহাদের উদ্ভব (Different Systems of Land Tenure and their Origin) : মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে বাংলাদেশে যাহারা কর-প্রজা (tax farmers) এবং রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারী ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে তাহারা ভূমির উপর মালিকানা দাবি করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র শাসনকার্যের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া

---

* First Five Year Plan—১৮৪ পৃষ্ঠা

† Second Five Year Plan—১৭৭ পৃষ্ঠা

কোম্পানী এই সকল ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং উহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে দেয় রাজস্বের বন্দোবস্ত করিল। এই সময় ভূমির উপর জনসংখ্যার কোন বিশেষ চাপ পড়ে নাই এবং নির্ভরযোগ্য রাজস্ব প্রদানকারী কৃষি-প্রজার সংখ্যা ছিল অত্যল্প। ফলে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং সহজে রাজস্ব-সংগ্রহের উপায় হিসাবে কোম্পানী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

ক। জমিদারী ব্যবস্থার উদ্ভব

বংগদেশে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে ইহাকে বিহার, উড়িষ্যা, বেনারস এবং মাদ্রাজের কিয়দংশে প্রসারিত করা হয়। আগ্রা ও অযোধ্যায় জমিতে যে যৌথ বা সাম্প্রদায়িক মালিকানার ব্যবস্থা ছিল তাহাই অপরিবর্তিত রাখা হয়। সম্প্রদায় বা 'মহাল' জমির মালিক বলিয়া পরিগণিত থাকায় এইরূপ পদ্ধতিতে 'মহালওয়ারি-ব্যবস্থা' বলা হয়। পরে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা পাঞ্জাবে প্রসারিত হয়। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি নামে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। মালগুজাররা ছিল মারাঠাদের আমলে রাজস্ব-সংগ্রহকারী প্রজা (revenue farmers)। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় দেখা গেল যে, এই মালগুজারদের অধিকার স্বীকার না করার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। সুতরাং সমগ্র সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মালগুজারদের সহিতই বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ফলে কার্যক্ষেত্রে মালগুজারি-ব্যবস্থা জমিদারী ব্যবস্থারই সামিল হইয়া উঠে।

খ। রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব

গ। মহালওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব

ঘ। মালগুজারি-উদ্ভব

এইভাবে উত্তর ও মধ্যভারতের অধিকাংশে জমিদারী ব্যবস্থার এবং দেশের অপর সকল অংশে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

জমিদারী ব্যবস্থা (The Zamindary System) : জমিদারী ব্যবস্থা বা বন্দোবস্তকে সাধারণত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু এইরূপ করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। জমিদারী বন্দোবস্ত অস্থায়ীও হইতে পারে। বস্তুত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে যখন ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের কার্য সুরু হয় তখন মোট জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার অধীনে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী

জমিদারী ব্যবস্থা সকল সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে জমিদারী ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানত জমিদারী ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয়—কারণ কৃষিজীবীর অধিকাংশ দুঃখদুর্দশা, আর্থিক ও সামাজিক অধোগতি প্রভৃতি ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (The Permanent Settlement) : ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বংগদেশের তৎকালীন কর-প্রজা এবং রাজস্বসংগ্রহকারীদের জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। স্যর রিচার্ড টেম্পলের (Sir Richard Temple) মতে, ইহার ফলে বংগদেশে ব্রিটিশ ভূমি-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জমিদারগণকে কৃষকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের দশ-একাদশাংশ সরকারকে প্রদান করিতে হইত। বাকী এক-একাদশাংক তাঁহারা তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ক্রমশই বাড়াইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই। ফলে ক্রমে বংগদেশে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন 'জমিদার' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

যে সকল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোনটিই সাধিত হয় নাই বলা চলে।

বংগদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

প্রথমত, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের কোনও বৃদ্ধি ঘটে নাই। অপরদিকে কিন্তু সাধারণ কৃষক খাজনার ভারে ক্রমশ প্রপীড়িত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে, জমিদারগণ সমাজের স্বাভাবিক নেতৃস্থান অধিকার করিয়া সকল প্রকার সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহার এই আশা পরিপূর্ণ না করিয়া জমিদারগণ শুধু খাজনা আদায় করিয়াছেন এবং শহরে থাকিয়া বিলাসী জীবনযাপন করিয়াছেন। জমির উন্নতির কোনও বিশেষ চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই, জমি হইতে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহই ছিল তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে কৃষি ও কৃষিজীবীর অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। উপরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ছাড়াও অন্যান্য প্রকার মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পূর্বে প্রকৃত চাষী ও জমিদারের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। সমাজ তাহাদের নিকট হইতে কিছুই পাইত না, কিন্তু তাহারা পরভোজীর ন্যায় কৃষকশ্রেণীর স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকিত। ফলে একদিকে সামন্তপ্রথা (feudal system) এবং অপরদিকে ভূমিদাসের (serfs) অস্তিত্ব বংগদেশের ভূমি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।" বংগদেশের সমগ্র সমাজজীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল তাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইয়াছে: "জমিদারগণের হস্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত অবশিষ্ট অধিকারের সমগ্রটা ন্যস্ত করিয়া সরকার তাহাদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেয় এবং তাহাদের আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। অপরদিকে কৃষিজীবিগণের অধিকার দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। প্রথাগত যে-নিরাপত্তা তাহাদের ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যায় এবং ইহার স্থলে বিচারালয় কর্তৃক একরূপ অলীক রক্ষণাবেক্ষণের এবং ভবিষ্যতে সাহায্যের অস্পষ্ট প্রথা গড়িয়া উঠে। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিজীবিগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া এবং জমিদারগণের স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বংগদেশের গ্রাম্য সমাজের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরি-উক্ত কুফলসমূহ যে শুধু বংগদেশের উপরই ফলিয়াছিল তাহা নহে; বিহার, বেনারসের ন্যায় এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলও উহাদের

প্রভাব হইতে বাদ যায় নাই। বিহারে কৃষকদের উপর খাজনার বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধি কবা হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে বিহারের চিরস্থা বন্দোবস্তের খাজনার কৃষকই ছিল ভূমি রাজস্বভাবে সর্বাধিক প্রপীড়িত

অন্যান্য অঞ্চলে

অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা (The Temporary Zamindary System) উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতির কিয়দংশে অস্থায়ী জমিদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের মালগুজারি-ব্যবস্থাও ছিল একরূপ অস্থায়ী জমিদা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অধীনে মারাঠাদের আমলের কর-প্রজা বা মালগুজারদের জমি অস্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ বন্দোবস্ত করা হইত।

মহালওয়ারি-ব্যবস্থা (The Mahalwari System)ঃ মহালওয়া ব্যবস্থা জমিদারী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করি মহালওয়ারি ব্যবস্থার ভিত্তি হইল জমির যৌথ মালিকানা। এক বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি 'মহাল'-এর সহিত বন্দো করা হইত বলিয়া এই ব্যবস্থাকে 'মহালওয়ারি' আখ্যায় অভি করা হইত।

মহালওয়ারি বন্দোবস্তের প্রকৃতি

আদিতে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা যৌথ ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা থাকিলেও ক্রমশ ইহাতে ব্যক্তি ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। প্রত্যেকবার ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ (assessment) সময় যৌথ অপেক্ষা ব্যক্তিগত মালিকানার উ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মহা পরিবর্তে প্রত্যেক রায়তের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ভূমি-রা আদায় করা হইতে থাকে। ফলে কার্যক্ষেত্রে মহালওয়ারি ব্যবস্থা রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা সামিল হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় পরিণতি

যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কিভাবে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যাই পারে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে অন্যতম সমবায়িক নী স্বাভাবিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানার নীতি স্বীকৃত হওয়ায়, মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের অধ কৃষি-জোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। ফলে স্বাভাবিক সমবায়িক ন অন্তর্হিত হয় এবং প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সরাসরি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে ন করিয়া সংগঠিত করিবার।

এই ব্যবস্থার গুণাগুণ

রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা (The Ryotwari System)ঃ রায়ত সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই ছিল রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ই অধীনে রাষ্ট্রকে জমির একমাত্র মালিক এবং রায়ত বা দখলিকার হিসাবে গণ্য করা হইত। যতদিন পর্যন্ত রায়ত নিয়মিতভ ভূমি-রাজস্ব প্রদান করে ততদিন পর্যন্তই সে দখলি-স্বত্ব ভোগ করিত। ভূমি-র

এই ব্যবস্থার প্রকৃতি

উৎপন্ন শস্যের উপর দেয় হিসাবে ধার্য করা হইত। সময়ান্তরে জরিপ করিয়া ধার্য খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি করা হইত।

সরকার ও রায়তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান গুণ। ইহাতে কোন কোন মধ্যবর্তী ভূমিদারের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রায়তগণের জমি-হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল বলিয়া কার্যক্ষেত্রে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার এই সুফল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। রায়তের দখলিকৃত জমির উত্তরোত্তর দরপত্তনি (sub letting) শুধু কৃষি-জোতের খণ্ডিকরণের পথই প্রশস্ত করে নাই, সরকার ও কৃষিজীবিগণের মধ্যে ব্যবধানেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষক ও কৃষি জোতের অবস্থা কখনও জমিদারী ব্যবস্থার মত অত মন্দ হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ভূমি-রাজস্ব হ্রাসবৃদ্ধি করা হয় বলিয়া ইহাতে কৃষকের আর্থিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া সরকারের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থার গুণ:

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, ইহাই কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান অপগুণ। তিনি তাঁহার "ভিক্টোরিয়ার যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস"* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধারণত একবার ভূমি রাজস্বের হ্রাস করা হইলে পরবর্তী সময়ে ইহার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, রায়ত তাহার ভার বহন করিতে পারে না। রাজস্ব-নির্ধারণকারী সরকারী কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুসারে রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় কৃষিগত সম্পদের সঞ্চয় একরূপ অসম্ভবই হইয়া উঠে, এবং ফলে কৃষি-জমির স্থায়ী উন্নয়নও কোন মতে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত দখলি স্বত্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার ঘটাইয়া গ্রামের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক জীবনের উপর বিশেষ আঘাত হানে। ফলে ভারতের প্রাচীন গ্রাম ব্যবস্থা আর একদিকে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে।"

অপগুণ:

ভারতের ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি (Nature of Land Revenue in India):

বিভিন্ন প্রকারের ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার আলোচনার পর ভারতে ভূমি-রাজস্ব কিভাবে নির্ধারিত হইত তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে, অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িকভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত। ভূমি রাজস্বের নির্ধারণের সাধারণ নীতি ছিল নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা। সাধারণত জমি হইতে নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় প্রত্যেক জমিতে এইরূপ নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নীট আয় নির্ধারণ অনুমানের পরিবর্তে পরীক্ষা দ্বারা করা হইত।

ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের সাধারণ নীতি

* Economic History of India in the Victorian Age.

নীট আয়ের কত অংশ ভূমি রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইত? প্রাচীনকালে একমা প্রথাই (custom) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিত। হিন্দু যুগে 'মোট' উৎপন্ন (gross produce) মধ্যে রাজার অংশ ছিল এক-ষষ্ঠমাংশ মুসলমান যুগে উহা বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ ধা করা হয়।

ক। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার ভূমিকা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণে অনুকরণে প্রথানুযায়ীই ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করিত; কিন্তু ক্রম সুযোগ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি 'প্রতিযোগিতা'রও (competition) প্রবর্তন করে।

খ। প্রতিযোগিতার প্রবর্তন

এখানে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার এই নীতি বা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি অনুসারে ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা * নির্ধারিত হয় জমি ইজার বা ভাড়া লইতে ইচ্ছুক এমন প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। যে-জমির উবর যত অধিক লোকে সেই জমি চাষ করিতে বেশী আগ্রহান্বিত হয়—কারণ এরূপ জমিতে উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইয়া অধিক উদ্বৃত্ত (surplus) থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি বিশেস তীব্র হয় তবে উদ্বৃত্তের সমগ্রটাই ভূম্যধিকারী আদায় করিয়া লইতে পারে।

প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশী শাসনের ফলে কুটির শিল্পের ধ্বংস, এদেশ হইতে কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষি-জমির জন্য প্রতিযোগিতাকে ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলে ইহার সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিবার বন্দোবস্তের সময় পূর্বাপেক্ষা উচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব দাবি করিতে থাকে। বন্দোবস্ত অস্থায়ী থাকার ফলে কোম্পানীর পক্ষে এই প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল। কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারিগণও প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে খাজনা আদায় করিয়া লইতে থাকে।

খাজনা ও ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে প্রতিযোগিতা এরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা কখনও ভূমি-রাজস্বের একমাত্র নির্ধারক হইয়া উঠে নাই—কারণ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথার প্রভাব কাটাইয়া উঠা কোম্পানীর পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং প্রথার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতার দ্বারা খাজনা নির্ধারণ ভারতের ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নাই। উভয় নীতি পাশাপাশি বা একসংগে কার্য করিতে থাকে।

প্রথা ও প্রতিযোগিতার সহ-অস্তিত্ব

প্রথা হইতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তন (from custom to competition সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইলেও, প্রতিযোগিতাই ক্রমে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের মুখ্য নীতি

* সাধারণত সরকারের প্রাপ্যকে 'ভূমি-রাজস্ব' (Land Revenue) ও ভূম্যধিকারীর প্রাপ্যকে 'খাজনা' (Rent) বলা হয়।

ইয়া দাঁড়ায়। ফলে কৃষিজীবী ক্রমশ হইয়া উঠে বাজস্ব-ভাবে প্রপীড়িত। কুটিব শিল্পাদিব ধ্বংস এবং ভাবতীয় অর্থ-ব্যবস্থাব ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থাব রূপান্তবেব ফলে কৃষিজীবীব পক্ষে কৃষিকার্য পবিত্যাগ কবিয়া অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন কবিবাব উপায়ও থাকে না। ক্রম-বর্ধমান বাজস্ব জোগাইয়া সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় বাখিতে চেষ্টা কবিতে থাকে।

।ত্যোগিতার মুখ্য
।নাধিকার ও ইহার

বিভিন্ন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা বিশেষ কবিয়া জমিদাবী ব্যবস্থা প্রবর্তনেব অর্ধ শতাব্দীবও বে সবকাব প্রতিযোগিতাব দ্বাবা ভূমি-বাজস্ব নির্ধাবণেব এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়াব যুগ শেষ হইয়াছে এবং সবকাব শোষণ হইতে শাসনে কিঞ্চিৎ মন দিয়াছে। সবকাব প্রতিযোগিতাব কুফল সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ইহার প্রতিবিধানেব চেষ্টা করে আইন প্রণয়নেব দ্বাবা। খাজনা বৃদ্ধিব সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যক্ষেত্রে পবিমিত কবিতে চেষ্টা বাই ছিল আইন প্রণয়নেব উদ্দেশ্য। এইসকল আইনেব মধ্যে ১৮৫৯ সালেব বংগীয় খাজনা আইন (The Bengal Rent Act, 1859), ১৮৮৫ সালেব প্রজাস্বত্ব আইন (The Tenancy Act, 1885), ১৯০৮ সালেব মাদ্রাজ ভূসম্পত্তি আইন (The Madras Estate Land .ct, 1908) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তবকালে এই উদ্দেশ্যে আবও আইন পাস ব। হইয়াছিল—যথা, ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালেব আইন।

যোগিতাব কুফলের
তিবিধানেব প্রচেষ্টা

এই উদ্দেশ্যে
ণীত বিভিন্ন আইন

এই সকল আইন পাসেব পব ভূমি-বাজস্ব বা খাজনা উপবি উক্ত তিনটি নীতি—যথা, প্রথা (custom, প্রতিযোগিতা (competition) এবং আইন (legislation)—দ্বাবাই নির্ধাবিত হইতে থাকে। বর্তমানে এইভাবে নির্ধাবিত ভূমি-বাজস্বেব হাব অত্যধিক কিনা তাহাব বিচাব কবিয়া দেখা যাইতেছে। অত্যধিক হইলে আইন প্রণয়নেব বা খাজনা হ্রাসেব ব্যবস্থাও কবা যাইতেছে।

মি বাজস্ব প্রথা,
তিযোগিতা ও
াইন দ্বারা নির্ধাবিত
ইত

ভূমি-রাজস্ব—খাজনা না কর? (Is Land Revenue Rent or a Tax?) ই প্রসংগে আব একটি বিষয় আলোচনা কবা প্রযোজন। ইহা হইল ভূমি-বাজস্ব াজনা না কব এই লইয়া মতদ্বৈধতা। যাঁহাবা ভূমি-বাজস্বকে খাজনা বলিয়া অভিহিত কবিতে চাহেন তাঁহাবা ইহাব সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন কবেন: (ক) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বাষ্ট্রকেই সমগ্র জমিব মালিক হিসাবে গ্রহণ কবিতে হইবে। কতকগুলি বিশেষ সর্তাধীনে বাষ্ট্র ক্তিবিশেষকে জমি ব্যবহাব কবিতে দেয় মাত্র। (খ) জলসেচ-ব্যবস্থা, বনভূমি পত্তন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতিব দ্বাবা বাষ্ট্র অনেক সময জমিব উন্নযনেব চেষ্টা কবে। জমিব মালিকানা যদি বাষ্ট্রের না হইত তবে ইহাব উন্নযনে বাষ্ট্রীয় উদ্যোগেব সাক্ষাৎ মিলিত না। ব্যক্তিবিশেষের পত্তিব উন্নতিসাধনে সরকাব কখনও সচেষ্ট হইতে পারে না। (গ) জমির মালিকানা

ম রাজস্ব—খাজনা
কব

জনা বলিয়া
ভিহিত করার
পক্ষে যুক্তি

যখন রাষ্ট্রের তখন জমি হইতে প্রাপ্য রাজস্বকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত হিসাবেই গ করিতে হইবে। (ঘ) উপরন্তু, ভূমি-রাজস্ব দীর্ঘকাল বা অল্পকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে করের ন্যায় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতি বৎসর উহার হ্রাসবৃ করা হয় না।

অপরদিকে যাহারা ভূমি-রাজস্ব 'কর' এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহাদেব যু হইল: (ক) জমির মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের—যদিও বা এই মালিকানা স্বল্পমেয়া হইতে পারে; (খ) জমির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রেব মালিকানা প্রমাণি করে না। সরকার ত' জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থাও করে। বস্তুত, জমির উন্নয়নে রা প্রচেষ্টা অন্যতম জনকল্যাণকর কার্য মাত্র। ইহা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (গ) সকল প্রক করের বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি সকল সময় সম্ভব বা কাম্য নহে ভূমির উপর 'কর' এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব, ইহারও বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব কাম্য নহে।

কর বলিয়া অভিহিত করার সপক্ষে যুক্তি

অন্যান্য যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু একটি বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে। ই হইল রাষ্ট্রই জমির চূড়ান্ত মালিক কিনা? যদি রাষ্ট্রকে জমির মালি হিসাবে গণ্য করা হয় তবে ভূমি-রাজস্বকে খাজনা হিসাবে এ বিপরীত ঘটিলে ইহাকে কর হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

উপসংহার

ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে রাষ্ট্রকে জমির মালিক হিসাবে গণ্য করা যায় ন হিন্দু ও মুসলমান যুগে জমি সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হইত। কিন্তু ইংরাজ আসিয়া এই প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনসাধন করে। পাশ্চাত্য বিধিশাস্ত্র ও ভূমি ব্যবস্থ নীতি অনুসারে রাষ্ট্রই সকল জমির চূড়ান্ত মালিক—তাহারা এই ধারণা প্রচার করে তদবধি ভারতে ইহাই প্রবর্তিত আছে। সাম্প্রতিককালে কেহ কেহ ইহার বিরোধি করিলেও সমগ্র সভ্য জগৎ রাষ্ট্রকেই সকল জমির চূড়ান্ত মালি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের দেশেও ইহা গ্র বিরোধিতার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এ উল্লেখযোগ্য যে ভূমি-রাজস্ব খাজনা—ইহা মানিয়া লইয়াই এ-পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমি ব্যবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে।

ভূমি-রাজস্ব খাজনা, কর নহে

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সূচনা (Beginning of Land Reforms

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসমূহের অবনতি এবং বি উত্তরাধিকার আইনের ফলে কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হই বহুদিন পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শাসক বোধ করেন নাই। ফলে "সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় কৃষির উপর নির্ভরশীল দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা জমির উ উত্তরোত্তর চাপ দিতে থাকে, এবং জমি ক্রমশ মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের হি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন পাসের দ্বারা খা

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ই, উৎখাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কৃষিজীবীর অবস্থার সামান্য উন্নতি সাধিত হইলেও, ভূমি-সংগঠনের মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশন (Bengal Land Revenue Commission) রিপোর্ট দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত সরকার ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা একরূপ উপলব্ধিই করে নাই।* স্বভাবতই, কোন ভূমিনীতিও নির্ধারিত হয় নাই।

মিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের প্রথম চেষ্টা

বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে ভূমিনীতি নির্ধারণ ও ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে শুধু বংগদেশের নহে, সকল প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিই আকর্ষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর একটি ভয়ানক সত্য প্রকটভাবে প্রতিভাত করে। ইহা হইল ভারত খাদ্যশস্যে কোনমতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নহে।

খাদ্য সমস্যা ও ভূমি-সংস্কারের গুরুত্ব

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এই পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রম ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টাকে মন্থরগতি করিয়া তুলে। মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রমের অন্যতম নীতি ছিল যে, জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন প্রভৃতির ন্যায় আপাত অনুৎপাদনশীল কার্যে কোন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পাইবে না। পশ্চিমবংগের ন্যায় অনেক প্রাদেশিক সরকার এই কার্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবার সময় দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং পেপসু মধ্যবর্তী ভূমিজীবিগণের বিলোপসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

স্বাধীনতার পর সংস্কারের প্রচেষ্টা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী সংস্কারসমূহ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূত্রপাতে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এইরূপ বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বপ্রথম এক সর্ব-ভারতব্যাপী ভূমি-সংস্কারের জন্য কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় এবং সর্বাংগীণ ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হয়। এখন এই নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

* India—1958.

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি (Land Policy under Planned Economy) : প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতি অধ্যায়ের সূচনাতেই বলা হইয়াছিল, "জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্যের মালিকানার সমস্যাই মৌলিকতম সমস্যা। ভবিষ্যতে আর্থিক ও সামাজিক সংক্রান্ত সংগঠনের প্রকৃতি ভূমি-সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিবে। একদিকে যেমন পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি যে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হইয়াছে তাহাতে পৌছান প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে ভূমিনীতির মাধ্যমে যাহাতে সম্পদ ও উপার্জনে বৈষম্য ক্রমশ তিরোহিত হয়, শোষণ অপসারিত হয়, প্রজা ও শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহাও দেখা প্রয়োজন। "এই সকল লক্ষ্যেই পৌছান হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অন্যতম অপরিহার্য অংগ।" **

ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, "প্রকৃতপক্ষে ভূমি-সংস্কারের ফলাফল গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করে।" † জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও শিল্পকেন্দ্রসমূহের প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে খাদ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বৈচিত্র্যময় হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চাকাংক্ষাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমও সাফল্যের জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, (ক) কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিগত সংগঠনে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিতে হইবে, এবং (খ) যথাশীঘ্র সম্ভব কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত দক্ষতা ও উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত লক্ষ্যসমূহের সব কয়টিই একরূপ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষণের সমাপ্তি, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সংকোচন, সকলের সমান মর্যাদা ও একই প্রকারের সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির সংগঠন হইল এই সকল নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (Socialist Pattern of Society) ধারণাও এই দিকে পথ নির্দেশ করে। বস্তুত, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আর্থিক উন্নয়ন সংবিধানভুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে বাধ্য। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি নির্ধারণ ঠিকমতই করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত

** First Five Year Plan – ৪৯ পৃষ্ঠা

† Second Five Year Plan—১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

এই সকল মৌলিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হইলেও পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ভূমিনীতি প্রধানত পারিপার্শ্বিক অবস্থারই আপেক্ষিক হইবে—অর্থাৎ স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহা নির্ধারণ করিতে হইবে। তবুও পরিকল্পনা কমিশন -সংস্কারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য এক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ য়াছে। এই সাধারণ কার্যক্রমের মূল নীতিগুলি হইল:

কল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার -সংস্কারের কার্যক্রম

(ক) ১। রাষ্ট্র এবং কৃষিজীবিগণের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ;
২। কৃষিজীবিগণকে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং খাজনাহ্রাসের জন্য স্বত্ব সংস্কার;
৩। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (fixation of ceiling on holdings) ইহার মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন;

(খ) ১। জোতের সংহতিসাধনের দ্বারা কৃষির পুনর্বাসন;
২। ভবিষ্যতে অধিকতর অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন;
৩। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিবিধান তিনটির উদ্দেশ্য হইল জমির মালিকানায় বৈষম্য দূর য়া কৃষিগত সংগঠনকে সুদৃঢ় করা; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তিনটি বিষয়ের লক্ষ্য ধারণভাবে গ্রাম্য অর্থ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।

নীতিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Policy Implemented So ar): ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত রাজ্য সরকারের কার্য। কিন্তু রাজ্য সরকার সংস্কারকার্যে যাহাতে উপরি-উক্ত নীতি পালন করিয়া চলে তাহা দেখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একটি ভূমি-সংস্কার শাখা (a Land Reforms Wing) গঠন করা হয়। উপরন্তু, তীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ভূমিনীতি নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য রিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৯৫৪ সালে একটি প্যানেল (Panel) নিযুক্ত হয়। এই ্যানেল মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপসাধন কমিটি, প্রজাস্বত্ব কমিটি প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া ভূমি-স্কারের বিভিন্ন দিকের বিচার-বিবেচনা করে। ইহার মধ্যে প্রজাস্বত্ব কমিটি enancy Committee) কর্তৃক জমি যে শ্রমজীবী কৃষকের (land to the tiller) নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালে ভূমি-সংস্কার প্যানেলকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে।

সংস্কার কার্যের জন্য সংস্থা

প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেই কয়েকটি রাজ্য মধ্যস্বত্ব বিলোপসাধনের কার্য সুরু করিয়াছিল। এই কার্য মোটামুটি সমাপ্ত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগে আসিয়া দেখা যায় যে মোট ষিত জমিতে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বাকী ৫ ভাগের মধ্যস্বত্ব বিলোপ কার্য ১৯৫৯ সালের মধ্যে মাপ্ত করিবার কথা ছিল।*

মধ্যস্বত্ববিলোপ

---

* India—1959 এবং AICC Economic Review, June 1959

একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক স্থলেই মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেও ব্যবস্থা হইয়াছে। মোট দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৬২৫ কোটি টাকার মত হই বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবংগে ব্যয়িত হইবে ৭০ কোটি টা

পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার ভূমিনীতিতে প্রজাস্বত্ব সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধি করে। ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্য মোটামুটি দ্বিবিধ (১) খাজনাহ্রাস, এবং (২) প্রজাকে জমির মালিকানা অধি প্রদান।

২। প্রজাস্বত্ব সংস্কার

খাজনাহ্রাস সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয় যে খ কোন ক্ষেত্রেই মোট উৎপন্ন শস্যের ১/৪ এর অধিক এবং ১/৫-এর কম হইবে না। রাজ্যেই খাজনা এই দুই সীমার মধ্যে থাকায় ইহাদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে কিছুই করি প্রয়োজন হয় নাই। বাকিগুলিতে খাজনাহ্রাস এবং উহার উর্ধ্ব মাত্রা নির্ধারণ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্র রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগ উদ্দেশ্যে আইন ইতিমধ্যেই পাস করা হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশ নির্দেশ মানা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ রাজস্থান ও বোম্বাই এ মোট উৎপন্নের ১/৬ পাঞ্জাবে ১/৩ অংশ এবং মহীশূরে ১/২০ অংশ খাজনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ফলে রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে সমগ্র ভারতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নাই। রাজ্যগুলিকে এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে পরিকল্পনা কমিশন হইতে নির্দেশ দেওয়া হই

(ক) খাজনাহ্রাসের ব্যবস্থা

কৃষিজীবীকে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান করার কার্য অধি রাজ্যই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উদ্দেশ্যে প্রথমত প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া উৎখাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাবিলি জমির সম্পূর্ণটা বা একাংশ ক্রয় করিয়া লইবার অধি প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) কৃষিজীবীকে জমির চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান

স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের আলোচনা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্য বিলোপের ফলে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা মাত্র দুই শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—(ক) য রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি সরাসরি বন্দোবস্ত লয়, এবং (খ) যাহারা মালিকদের হইতে প্রজা হিসাবে বন্দোবস্ত লয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই দুই শ্রেণীর স্বত্বের প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে। আইনে মূলত শ্রমজীবী কৃষকের' (land to the tiller) এই নীতিকে মূল লক্ষ্য করা হইয়াছে। আইন পাস হইলেও ইহা সকল স্থানে ঠিকমত কার্যকর হইতেছে না। দেখা য অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কৃষি জোতের মালিক প্রজাদের নিকট হইতে 'স্বে স্বত্বত্যাগের' (voluntary surrender) দলিল লিখাইয়া লইতেছে।

ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দাবিদ্র্যহেতু কৃষকের পক্ষে প্রজাবিলি জমি ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও ঠিকমত
াগ করা সম্ভব হইতেছে না। উদাহরণস্বরূপ, বোম্বাই-এ মালিক প্রজাবিলি জমির
র্ধক পুনঃগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বাকী অর্ধেক প্রজা ইচ্ছা করিলেই কিনিয়া লইতে
রে। দিল্লীতে প্রজা মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়া বিলিকৃত সমস্ত জমিটারই মালিক হইয়া
তে পারে। পাঞ্জাবে মালিক ৩০ একর পর্যন্ত জমি পুনঃগ্রহণ করিতে পারে।
শু সে কোন ক্ষেত্রেই ঐ পরিমাণের অধিক জমি নিজ দখলে রাখিতে পারে না। ইহা
হার জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা। কিন্তু উপরি উক্ত কোন রাজ্যেই কৃষকগণ এ-পর্যন্ত
টা পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে পারে তাহার এক-চতুর্থাংশও ক্রয় করিতে সমর্থ
নাই। সুতরাং এ বিষয়েও কিছু করা দরকার।

জোতের ঊর্ধ্বতন
নিধারণ

জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্র ভূম্যধিকারী ও কৃষক উভয়ের বেলাতেই নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের দুইটি দিক আছে—(ক) ভবিষ্যৎ ভূমিসংগ্রহের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on future acquisition), (খ) বর্তমান জোতের র্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on existing holdings)।

ষ্যৎ মাত্রা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হইবার পূর্বে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য রাও ভূমিসংগ্রহের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারিত হয় নাই। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, এবং দিল্লী জোতের ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন স করে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগে যে আইন প্রণীত হয় তাহা ১৯৫৬ সালের শ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন (Land Reforms Act, 1956) নামে অভিহিত।

মান মাত্রা

১৯৫৮ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করিবার জন্য াইন প্রণয়ন করা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, মহীশূর, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল-প্রদেশ ও পশ্চিমবংগে। অন্যান্য রাজ্যকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই আইন প্রণয়ন সমাধা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ তদূর পালিত হইতেছে তাহার বিবরণ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে সকল প্রকার আইন প্রণয়নকার্য অন্তত ১৯৬০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হইবে।

ঊর্ধ্বতন মাত্রা নিধারণে
বিলম্বের কারণ

অর্থনৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণে অসুবিধাই ছিল জোতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কুমারাপ্পা কমিটি (Kumarappa Committee) নামে একটি কমিটি নিযোগ করা হয়। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, র্থনৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে

হইবে : (ক) উহা কৃষকের যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবে, এবং (উহা হইতে অন্তত একজোড়া বলদ সমেত একটি স্বাভাবিক আয়তনের কৃষক-পরিবারে পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। কুমারাপ্পা কমিটির এই অভিমতের ভিত্তিতে জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা যাইতেছে। এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে উর্ধ্বতন মাত্রা যেন উপবি-উক্ত অর্থে অর্থনৈতিক জোত অপেক্ষা কম এবং 'কা জোত' (optimum holding) অপেক্ষা অধিক না হয়। কাম্য জোত আ অর্থনৈতিক জোতের মোটামুটি তিনগুণ হয়।

জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে বা যাই প্রধানত ভূমিহীন কৃষিজীবিগণের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে।

জমির পুনর্বণ্টন

পশ্চিমবংগে ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ৬৭ হাজার একর পুনর্বণ্টন হইয়াছে। ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির স এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।*

ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিকে আছে জোতের সংহতিসাধন, ভবিষ্যৎ অসম্ব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার এ

ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিক

ইহাদের মধ্যে জোতের সংহতিসাধন ও ভবিষ্যৎ অসম্বদ্ধতার ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়া এখন তৃতীয় বিষয়টি—অর্থাৎ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (Co-operative Farming) : সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা প্রসারলাভ করে ১৯৪৯ সালে লক্ষ্মৌ এ খাদ্য

এ-সম্বন্ধে ধারণার প্রসার

সংস্থার কলাকৌশল সংক্রান্ত অধিবেশনের (Technical Me of the F.A.O.) পর হইতে। ঐ অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে কৃষির পুন জন্য সমবায় পদ্ধতিই অবলম্বনীয় পন্থা ; এই সমস্ত পদ্ধতির প্রসারকল্পে বিভিন্ন সরকারকে সকল সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও কৌশলগত প্রদান করিবার সুপারিশ করা হয়।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য নূতন নয়। ১৯৪৯ সালের ব বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আকারে ও পরিমাণে ইহা লইয়া পরীক্ষা শেষ করিয়াছি সোবিয়েত ইউনিয়ন ও উহার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, মার্কিন যু ইতালী, সুইডেন এবং নয়া চীনে এই পদ্ধতির সাফল্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি

* ১২০ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১১৪-১৬ পৃষ্ঠা।

উপরি-উক্ত সুপারিশের ফলে এবং বিভিন্ন দেশের আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার অধিকাংশই কিন্তু ব্যয়িত হয় নাই।* যাহা হউক, ঐ পরিকল্পনার শেষে ভারতে সমবায়ী কৃষি সমিতি সংখ্যা ১,৩৯৭ তে পৌঁছায়। ইহার মধ্যে ২৬২টি সমিতি পরিকল্পনার শেষ বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালেই গঠিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের জন্য ১ কোটি ৩৮½ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ৩,০০০ এর উপর সমবায়ী কৃষি সমিতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৬ সালে একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নয়া চীনের সমবায় কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রেরণ করা হয়। পাতিল কমিটি (Patil Committee) এই দলের রিপোর্টের পর্যালোচনা করিয়া ভারতে ব্যাপকভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের সুপারিশ করে এবং সুপারিশমত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। ফল কিন্তু ৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সকল প্রকার সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ৩,৬৩৭-এ পৌঁছাইলেও কার্যক্ষেত্রে সমবায়ী মনোভাবের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। উক্ত সংখ্যার মধ্যে আবার সমবায়ী যৌথ কৃষি সমিতি Co-operative Joint Farming Societies) বা প্রকৃত সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ১,২০০-এর মত।** স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি কৃষকগণকে মোটেই উৎসাহিত করিতে পারে নাই। এই ধরনের সমিতি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্যই হইয়াছে, সমবায়ী আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।" সুতরাং স্যর ম্যালকম এই বিষয়ে অতি সতর্কভাবে চলিবার পরামর্শ দেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

১৯৫৯ সালে কৃষির পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে (Nagpur Resolution) কিন্তু স্যর ম্যালকমের উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operative) দ্বারা ছাইয়া ফেলিবার এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যৌথ সমবায়ী কৃষি সমিতি (joint co-operative farms) স্থাপন করিবার কথা বলা হয়। ইহার উপর পুনর্বণ্টিত যে-সকল জমিতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে সেখানেও সমবায়-কৃষি সমিতি গঠনের নীতি ঘোষণা করা হয়। মোটকথা, কৃষির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়।

কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব ও পরবর্তী অধ্যায়

* Review of the First Five Year Plan—৩২০ পৃষ্ঠা।

** Eastern Economist, June 12, '59

এই প্রস্তাবের পর হইতেই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বিশেষ বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের যথাসম্ভব শীঘ্র সম্প্রসারণের সপক্ষে মোটামুটি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা আজ আর সত্য নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে বিতর্ক ছিল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কিরূপ গ্রহণ করিবে তাহা লইয়া। বর্তমানে বিতর্ক হইল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কাম্য কিনা তাহা লইয়া।

এই বিতর্কের বিশ্লেষণ করিয়া অভিমত প্রদান করিবার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিভিন্ন রূপের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য মোটামুটি চারি প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, (ক) সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য (co-operative joint farming), (খ) সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য (co operative tenant farming, (গ) সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য (co operative better farming) এবং (ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য (co operative collective farming)। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কতিপয় কৃষকের জোতের খণ্ডীকৃত (এবং অসম্বদ্ধও) অংশ সমবায় সমিতির অধীনে একত্রিত করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক কৃষক তাহার ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসাবে উৎপন্নের কিছু অংশ পায়, কৃষি-শ্রমিক হিসাবে সে তাহার মজুরি পায় এবং মুনাফারও অংশ পায়। এই প্রকার সমবায় কৃষি-সমিতিকে প্রকৃত সমবায় কৃষি-সমিতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহা সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার (co-operative village management) অনুরূপ।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিভিন্ন রূপ:

(ক) যৌথ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

দ্বিতীয় বা 'কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য' পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি কৃষিকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ইহা ইহার মালিকানায় যে-জমি থাকে তাহা কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া কৃষকগণকে ভাড়া দেয়। সংগে সংগে আবার কৃষকগণকে বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করে। কৃষকগণ সমবায় সমিতির প্রজা হিসাবে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সুচারুভাবে কৃষিকার্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তরাই বা দণ্ডকারণ্যের ন্যায় যেখানে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত বা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে বা হইতেছে সেখানেই এই প্রকার সমবায় পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যেখানে কৃষকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিক সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে না।

(খ) কৃষি প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য

তৃতীয় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের আদর্শ হইল উন্নততর কৃষিকার্য, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য নয়। ইহাতে সমবায় সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। অধ্যাপক রংগের (Prof. N. G. Ranga) ভাষায় বলা যায়, "পারস্পরিক সমবায়ে কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য সম্পাদন

(গ) উন্নত ধরনের কৃষিকার্য

রিবার জন্য সমগ্র কৃষিকার্যকে সমবায়ের অধীনে আনয়নের প্রয়োজন হয় না, পারিবারিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য সম্পাদন বর্জন করিয়া নূতন পদ্ধতি গ্রহণও অপরিহার্য হইয়া উঠে না।" অতএব সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য বলিতে কলাকৌশলের উন্নয়ন বুঝায় মাত্র। কলাকৌশলের উন্নয়ন দরিদ্র কৃষকের একলার পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়াই সমবায়ের পক্ষ অগ্রসর হইতে হয়।

সমবায় প্রথায় সামগ্রিক কৃষিকার্য সম্পর্কে ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়ন হইতে আসিয়াছে। সামগ্রিক খামার প্রথা সমবায় পদ্ধতিরই একটি রূপ। তবে কৃষি জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করা হয় না। সামগ্রিক খামার প্রথায় কৃষি জমির মালিকানা থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের; কিন্তু সামগ্রিক খামারকে ইহা চিরকালের জন্য অর্পণ করা হয়। সামগ্রিক খামারের অন্য সকল উপকরণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ফসল সামগ্রিক খামার সংগঠনকারী কৃষকগণের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রকে দেয় কর ইত্যাদি মিটাইয়া যে নীট লভ্যাংশ থাকে তাহা শ্রমের ভিত্তিতে সামগ্রিক খামারের অংশীদারগণের মধ্যে শ্রমের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে বণ্টিত হয়।*

সমবায় পদ্ধতাতে সামগ্রিক কৃষিকায

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা (The Need for Co-operative Farming): কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির, বিশেষ করিয়া খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষিকে লাভজনক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার অপরিহার্যতা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দিকে পথ নির্দেশ করে। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা ২৫-৩১ ভাগ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এবং শতকরা ১৫ ভাগ খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ৩২ ভাগ হইতে শতকরা ৮.২ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। কৃষি জমির দুষ্প্রাপ্যতাহেতু ব্যাপক কৃষিকার্যের সুযোগ নাই বলিয়া আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন (intensive and large scale) কৃষিকার্যই হইল উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র পন্থা, এবং বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমবায় পদ্ধতিতেই আত্যন্তিক বৃহদায়তন কৃষিকর্ম সম্পাদনের আশা করা যায়।

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ও আত্যন্তিক কৃষিকার্য শুধু যে উৎপাদনবৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করে তাহা নহে, ইহা উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস করে। বলা হইয়াছে যে অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিকার্যকে (subsistence farming) লাভজনক পেশায় পরিণত করিতে হইলে সমবায় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা গত্যন্তর নাই। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কৌশলগত উন্নয়নসাধন করিয়া উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা

* Karpinsky The Social and State Structure of the U.S.S.R.—২৪-২৬ পৃষ্ঠা

উপরন্তু, পরিমাণে কিছু কম হইলেও শিল্পের মত কৃষির ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালন উৎপাদনের আয়তনের (scale of production) সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত পরিচালনাগত ব্যয়সংকোচের (managerial economies) সুযোগ-সুবিধা লাভ করি হইলে বর্তমানে আমাদের দেশে সমবায় কৃষিকার্যের পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্বও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এই সকল কৃষি-শ্রমিকের মধ্যে অতিরিক্ত কৃষি-জমি (surplus land) বণ্টনের নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া এ সকল কৃষি-শ্রমিকের জোত অতি ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য। উপরন্তু, তাহারা বিশে দরিদ্র বলিয়া কাম্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতর এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিই হইল প্রকৃষ্ট পন্থা।

৩। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসন

চতুর্থত আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগ হিসাবেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন উন্নততর কলাকৌশল, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, জলসেচে ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি করে। এগুলির জন্য জোতের আয়তন সম্প্রসার অপরিহার্য। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন, জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধার প্রভৃতির ফলে জোতের আয়তন অনেক ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতরই হইয়া পড়িয়াছে এব অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণকার্য রহিত হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকা সম্পাদনই অনুসরণীয় পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নির্দেশ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগীভূত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠনের নীতিও এই নির্দেশ দেয়। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠন দুইভাবে করা যাইতে পারে: (ক) উৎপাদনের সমগ্র উপকরণ সামাজিক মালিকানার আয়ত্তে আনিয়া, অথবা, (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ে ব্যবস্থা করিয়া। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় কৃষির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির মালিকানা কৃষকের অন্যতম প্রধান আকাংক্ষিত বস্তু, অথচ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে না। ফলে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যই একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা হইয়া দাঁড়ায়। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শোষণের বিলুপ্তিসাধন উভয়েরই অনুপন্থী; এবং এই দুইটিই হইল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা

৫। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিরোধিতা (Opposition to Co-operative Farming) উপরি-বর্ণিত প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সত্ত্বেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই বিরোধিতাকে প্রধানত তিন দিক হইতে

[দে]খা যাইতে পারে (ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) অর্থনৈতিক এবং (গ) সামাজিক। রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে বিরোধিতা আসিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল হইতে। ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রসারের [সু]যোগ লইয়া কংগ্রেস দল কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করিবে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় যে-সকল সমবায় কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির আশাতেই হইবে, সমবায়ী আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।

[...]ন দিক হইতে [বি]রোধিতা :

। রাষ্ট্রনৈতিক [বি]রোধিতা

এই সমবায়ী মনোভাবের অভাব সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির প্রসারের বিরুদ্ধে অন্যতম অর্থনৈতিক যুক্তিও বটে। বলা হয় যে, সেখানে সমবায়ী আদর্শের অভাবে সমবায় কৃষি-ঋণ ব্যবস্থাই সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই সেখানে সমবায় কৃষি-পদ্ধতি যে সফলতা লাভ [ক]রিবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক।

। অর্থনৈতিক [বি]রোধিতা

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কৃষকগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগিও সমবায় পদ্ধতির [প]রিপন্থী। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত, যৌথ পরিবার প্রভৃতি যে-সকল ঐক্য এবং সমষ্টিসাধক [প্র]তিষ্ঠান ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির প্রসারের ফলে [ভা]রতীয়গণ আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এরূপ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে [যৌ]থ কৃষিকার্যের প্রসার ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত, সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠন ও [প]রিচালনযোগ্য লোকেরও ভারতে বিশেষ অভাব। চতুর্থত, সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে [কৃ]ষিকার্য করা হয় বলিয়া ইহা অল্পবিস্তর যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিবেই। বস্তুত, কৃষির [য]ন্ত্রিকরণের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতির পথে অগ্রসরের নির্দেশ দেওয়া হয়। [কি]ন্তু সাধারণভাবেও কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণ সমবায় সমিতির [সা]ধ্যাতীত। পরিশেষে, কৃষির যন্ত্রিকরণের ফলে যে বহুসংখ্যক কৃষক বেকার হইয়া [প]ড়িবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের সমস্যা হইল এই পদ্ধতির আর একটি প্রধান অসুবিধা।

সামাজিক দিক হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে সমবায় পদ্ধতির ফলে দেশের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন হইয়া সামগ্রিক আকার (collective form) ধারণ করিবে; কৃষিজীবিগণের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ নীতি হিসাবে [গ্র]হণ করা হইলেও আমাদের দেশ এখনও যৌথ সম্পত্তির ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। [সু]তরাং কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপান উচিত নহে; চাপাইতে [গে]লে বিপ্লব ঘটিতে পারে।

। সামাজিক দিক [হই]তে বিরোধিতা

ভারতের সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্ভাবনা (Prospects of Co-operative Farming in India): উপরি-বর্ণিত সমর্থন ও বিরোধিতার ভিত্তিতেই [ভা]রতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রসারের সম্ভাবনা বিচার করিতে হইবে। এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য সোবিয়েত-

ইউনিয়ন, নয়া চীন, ইস্‌রায়েল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ অনুসরণ করা চলিতে পারে না। আমাদের কৃষকগণের অজ্ঞতা এবং বিশেষ সামাজিক অবস্থার জন্য সমবায় কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণের কার্যক্রমকে এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যে তাহা যেন দেশের সর্বত্র প্রবর্তনযোগ্য হয়। অর্থাৎ, উহা যেন বিশেষ নমনীয় (flexible) হয়। যে সকল অঞ্চলে সমবায়িক কৃষি সুরু করা যাইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই সকল 'পথপ্রদর্শক পরিকল্পনাগুলির' (pilot projects) উপরই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সফলতা নির্ভর করিবে। সুতরাং স্থান-নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

পরিবর্তনশীল কার্যক্রমে সমবায়িক কৃষির পূর্ববর্ণিত চারিটি রূপের মধ্যে কোনটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলিবে না। ভারত একটি বিশাল দেশ, উহার বিভিন্ন অঞ্চলের পরস্পরের মধ্যে অবস্থাগত সাদৃশ্য বড় একটা নাই। সুতরাং একই প্রকার সমবায় কৃষি-পদ্ধতি চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যে সকল অঞ্চলে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের পুনর্বাসন করা হইতেছে যে সামগ্রিক পদ্ধতিতে সমবায়িক কৃষির (co operative collective farming) প্রবর্তন করা যাইতে পারে এবং অন্যান্য স্থানে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য, বা উন্নততর কৃষিকার্য বা কৃষি-প্রজ দ্বারা কৃষিকার্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যাইতে পারে। যাহা হউক, অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বর্তমান অবস্থাকে যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতএব, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে দুইটি নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে—(ক) কার্যক্রমের নমনীয়তা, এবং (খ) উহার প্রসার ব্যাপারে সতর্কতা। অবশ্য সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য হইবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিতে হইবে। শ্রীনেহরু এইরূপ চারিটি পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, সমবায়িক ঋণ, সমবায়িক সেবা, সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য এবং সমবায়িক সামগ্রিক কৃষিকার্য।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে অনুসরণীয় দুইটি নীতি

এই পথে বিভিন্ন পর্যায়

বর্তমানে এইমতই কার্য করা হইতেছে। সমবায়িক ঋণ (co operative credit), সমবায়িক সেবা (co-operative service) এবং সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য (co-operative joint farming) সুগঠিত করিয়া তবেই সমবায়িক সামগ্রিক খামার গঠনে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

এ সম্পর্কে কার্যক্রম নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৫৯ সালেই সরকার এক কার্যকরী দল (Working Group on Co-operative Farming) গঠন করে। কার্যকরী দল প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। রিপোর্টে দলটি ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সাফল্য সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করিয়াছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৩

কার্যকরী দলের সুপারিশ

পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা' (pilot projects) স্থাপন করিবার সুপারিশ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ৪০টি পরিকল্পনা বা সমিতি বর্তমান বৎসরেই (১৯৫৯-৬০) স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। দলটির মতে, এই সকল পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা প্রধানত জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্লকসমূহের যেখানে সমবায় আন্দোলন কাঠামোটি সুসংগঠিত সেইখানে স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি ব্লকে গড়ে ১০টি কৃষি সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলেও সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে পথপ্রদর্শক সমিতিগুলি ছাড়া মোট ২০ হাজারের মত সমিতি অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

সমবায় কৃষি সমিতি সাফল্যের জন্য দলটি কয়েকটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছে—যথা, ( ) সমিতির সদস্যগণকেই গঠন-দায়িত্ব করিতে হইবে, সরকারী নেতৃত্ব এ ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হইবে না, (২) সমস্বার্থের ভিত্তিতে যথাসম্ভব গ্রামের অধিকাংশ লোককেই সভ্যপদভুক্ত করার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। (৩) প্রত্যেকটি সমিতিকেই আত্মনির্ভর হইতে হইবে। এবং এই দিক হইতে বিচার করিয়া সমিতি আয়তন নির্ধারণ করিতে হইবে, এবং (৪) জমির মালিকানার পরিমাণে প্রশ্ন না তুলিয়া সকলকেই পরিচালনায় সমান অধিকার দিতে হইবে।

সমবায় কৃষি সমিতির সাফল্যের সর্ত

দলটি ৫ বৎসরের জন্য জমি সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণের নির্দেশ দিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রীতিজনিত যে প্রতিবন্ধক তাহা দূর করিবার জন্য দলটি জমি সমর্পণকারী সভ্যগণকে সমর্পিত জমির পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার প্রদানের কথা বলিয়াছে। সভ্যদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অবশ্য পরিচালনায় নিষ্ক্রিয় বা কার্যক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদের সভ্যপদ বাতিল করিবার পরামর্শও দলটি দিয়াছে।

মালিকানা জনিত প্রতিবন্ধক

রিপোর্ট অনুসারে গ্রাম্য ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন হইবে সমবায় কৃষি সমিতির কার্যক্রমের অংগীভূত। ইহাদের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রাম্য ও কুটির শিল্প

যন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে, দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে—( ) যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, এবং (২) যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে। এই দ্বিতীয় প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের উপরই দৃষ্টি দিতে হইবে।

যন্ত্রিকরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ কৃষি-সমিতি গঠন করা সম্ভব নহে বলিয়া দলটি সমিতি পিছু সর্বাধিক ৪ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের সুপারিশ করিয়াছে। সরকার যদি শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করে তবে ইহার পরিমাণ ২ হাজার টাকার অধিক হইবে না। ইহার উপর গুদামঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্যও দেওয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ ও সাহায্য

এই কার্যক্রমের ভিত্তিতে মোট ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমা: করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সমিতিগুলির সাহায্য বাবদ যাইবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাব শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রেণী দক্ষ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হইবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

অনুমিত ব্যয়

সাহায্য বণ্টন, ঋণ মঞ্জুরি প্রভৃতি বিষয় তদারক করিবার কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাে একটি করিয়া পরামর্শ দান বোর্ড (Advisory Boards গঠনের সুপারিশও দলটি করিয়াছে।

তত্ত্বাবধান

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা (Co-operative Village Management)

জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার অ একটি পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যাহার উপর আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা: বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা যে আমাদের ভূমি-সংস্ক ও কৃষির পুনর্গঠনের অন্যতম অংগ সে-সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

শ্রীত্রিলোক সিং আই. সি. এস. সবপ্রথম তাহার 'দারিদ্র্য এবং সামাজিক পরিবর্তন' নামক গ্রন্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতে কৃষি-জমি সংক্র নানাবিধ সমস্যা বহুদিন হইতেই সরকার ও অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণকে বিব্রত করি আসিতেছিল। খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের প্রতিবিধানক সকলেই বৃহদায়তনে কৃষিকার্যের নির্দেশ করিলেও কোন্ পদ্ধতি ইহা কার্যকর করা সম্ভব হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ ছি কেহ বা সোবিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে সামগ্রিক খামার প্রথা প্রবর্তনের প্রস্ত করিয়াছিলেন; কেহ বা চিরাচরিত প্রথায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সুপারি করিয়াছিলেন। মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়া ত্রিলোক সিং বলিলেন যে, ভারতের প. প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা। ইহাতে সোবিয়েত দেশের মত কৃষকের জীবনের সমগ্র স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিবার প্রয়োজন হয় না; আবার ইহা সাধারণ সমবায় পদ্ধতির মত অসংহত ব্যবস্থাও নয়।

পদ্ধতিটির প্রথম প্রচার করেন শ্রীত্রিলোক সিং

বহু বিচার-বিবেচনার পর পরিকল্পনা কমিশন ত্রিলোক সিং-এর অভিমতকেই সমর্থন করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কমিশনের মতে, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দ্বারা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হইলেও গ্রামীণ পুনর্গঠনের (rural reconstruction) প্রশ্ন ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিচার করিতে হইবে। গ্রামপর্যায়ে এরূপ একটি সংগঠন অবশ্যই থাকিবে যাহা সমগ্র সম্প্রদায় হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বকে বহন ও কার্যকর করিবে। গ্রাম পঞ্চায়েতই হইল এই সংগঠন। ইহার অধীনে গ্রামের কৃষি-জমি ন্যস্ত করা হইবে এবং ইহা সকল প্রকার কৃষিগত ও

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার স্বরূপ

Poverty and Social Change.

-কৃষিগত কার্য সম্পাদন করিয়া গ্রামের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে।* ন্ত এই সংস্থা বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হইবে বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ব্যবস্থা রিয়া গ্রামের কৃষি-জমি ও অন্যান্য সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার করা।

বৃহদায়তনে কৃষির দিক হইতে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ই পদ্ধতি পরিচালনাকারী সংস্থা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশেই সুরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ষি সম্পর্কিত সকল কার্য সম্পাদিত হয়। সংস্থা নির্দেশ দেয় কিভাবে এবং কি কি ফসল ংপন্ন করা হইবে, বিশেষ বিশেষ খামারের আয়তন কি হইবে, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ন্নত বীজের যোগান, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, প্রয়োজনমত যন্ত্রাদির সরবরাহ, ষির পরিপূরক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতিও হইল এইরূপ গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর ন্তর্ভুক্ত। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার সময় এইরূপ সংস্থা ধীরে ধীরে কৃষির যন্ত্রিকরণের দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয়। বলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক কৃষিকার্যই (mechanized agriculture) সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা গ্রামের সমগ্র কৃষি-জমি একত্রিত করিয়া একটি মাত্র জোতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে, আবার কাম্য বিবেচনা করিলে এই একত্রিত জমিকে কয়েক খণ্ডে (blocks) বিভক্ত করিয়া তাহাতেও কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে। উপরন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন খণ্ডে চাষের ব্যবস্থা করা হইলেও ভবিষ্যতে যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনে ইহাদিগকে একটি মাত্র জোতে পরিণত করিতে পারে। এইভাবে জোতের ংহতিসাধন ছাড়াও ইহা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি রিতে চেষ্টা করে।

ষির যন্ত্রিকরণ এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য

পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল এইখানে যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সমবায়ী কৃষক ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পাবে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃষকের জমি চিরকালের জন্য গ্রাম্য সংস্থার পরিচালনাধীনে ন্যস্ত হয়। জমি গ্রাম্য সংস্থার পরিচালনাধীনে থাকিলেও যৌথ খামারের মত কৃষকের মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকৃত থাকে যদিও বা কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের উপর তাহার মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত ইহার পার্থক্য

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) সহিত তুলনা করা চলে। যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদারেরই মালিকানা তাহার অংশ (share) অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু কাহারও প্রতিষ্ঠানের কোন

---

* **First Five Year Plan** – ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা।

নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর দাবি থাকে না। সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাতে তেমনি কৃষকের অং নির্দিষ্ট থাকিলেও জমির কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর তাহার দা থাকে না। কৃষকের মালিকানা নির্দিষ্ট বলিয়া সে নির্দিষ্ট লভ্যা (ownership dividend) পাইয়া থাকে এবং সে শ্রমিক হিসা কাজ করিলে তাহার জন্য অপর সকলের মত মজুরিও পাইয়া থাকে

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনীয়

গুণাগুণ ঃ আদর্শের দিক দিয়া সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে সর্বাপেক্ষা কাম্য ব লি গণ্য করা হয়। ইহাতে কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের সর্বাধিক সম্ভাবনাই রহিয়াছে কি ইহাতে যৌথ খামার ব্যবস্থার মত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নাই বলপ্রয়োগের দ্বারা কৃষির সংস্কারসাধনের প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায় ইহাতে বৃহদায়তনে কৃষিকর্ম সম্পাদি হইয়া কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি সাধিত হইবে, আধুনিক পদ্ধতিতে যান্ত্রি কৃষির মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস করা সম্ভব হইবে। এই দুইটি উৎপাদনের দক্ষতার পরিচায়ক ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের লক্ষ্য ইহা ছাড়াও এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ সামাজিক ন্যায়ের প্রতি করা সম্ভব। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার অধীনে সকলে একই সংস্থার সমমর্যাদাসম্প সভ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নয়ন জন্য সকলে একই সুযোগ পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় ব হইয়াছিল যে, ইহার ফলে সম্পত্তি বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদাজনি সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইবে।* উপরন্তু, গ্রা সকলেই একই সংস্থার সভ্য বলিয়া গ্রামের মধ্যে বিবাদ বিসংবা দূর হইবে। ইহাতে অর্থ ও শ্রমের বহু অপচয় রহিত হইবে এ গ্রামবাসিগণ গঠনমূলক কার্যে নিজেদের নিয়োগ করিতে পারিবে।

গুণ ১। ইহা আদর্শ ব্যবস্থা

২। ইহাতে বৃহদায়তনে উৎপাদনের লক্ষ্য সাধিত হয়

৩। ইহা সামাজিক ন্যায়ের অনুপন্থী

৪। ইহা অপচয় রহিত করে

এইভাবে সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইলেও ইহাকে প্রকৃষ্ট দান করিবার জন্য পদে পদে বিচার বিবেচনা ও পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে।* ভার গ্রামাঞ্চল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবাস। যাহা কিছু তাহাকেই গ্রহণ করিবার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত নহে। সুত গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার এই ধরনের পুনর্গঠনের কার্যে বিশেষ সং ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল সময়ই যাহাতে ত সহিত বাস্তব জীবনের সংগতি বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতী জোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে একত্রিত করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিলে শ্র দিক দিয়া ব্যয়সংক্ষেপের (economy of labour) জন্য বহুসং কৃষক পূর্ণ বা অর্ধ বেকার হইয়া পড়িবে। তাহাদের নিয়ো সমস্যা হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি। এইজন্য অনে

প্রতিবন্ধক ঃ ১। গ্রামবাসীর অক্ষমতা ও কুসংস্কার

২। বেকার-সমস্যা

---

* First Five Year Plan — ১৯৭ পৃষ্ঠা

মন যে এই উদ্বৃত্ত কৃষি-শ্রমিকদের জন্য বিকল্প নিয়োগের যথোচিত ব্যবস্থা না করিয়া সমবায় গ্রাম-পদ্ধতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। বামপন্থিগণ আবার এই ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পান না। ইহাদের মতে, কেবলমাত্র শ্রমের জন্যই এবং শ্রমের অনুপাতে কৃষি হইতে লভ্যাংশ বণ্টিত হওয়া উচিত—মালিকানার জন্য এবং মালিকানার অনুপাতে নহে। পরিশেষে, সাধারণ সমবায় পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুক্তিগুলিও সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবতারণা করা হয়—যথা, পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত লোকের অভাব, যৌথ উদ্যোগের ত্রুটি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎকর্ষ, ইত্যাদি।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মালিকানার জন্য

। উপযুক্ত লোকের অভাব, ইত্যাদি

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই -সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিয়াছে। ফলে কমিশন সহসা কিছু না করিয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় (transition period) গ্রামস্থ সমুদয় কৃষি-জমির পরিচালনা তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে করিতে হইবে: প্রথমত, কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছু জমিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবে, দ্বিতীয়ত, কিছু কৃষক তাহাদের জমি স্বেচ্ছায় একত্রিত করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিবে, এবং তৃতীয়ত, গ্রাম্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কিছু জমি থাকিবে। ক্রমশ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে জমির পরিমাণ কমাইয়া সম্প্রদায়গত তত্ত্বাবধানে জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, এবং পরিশেষে গ্রামস্থ সকল কৃষি জমিই সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার দায়িত্বে অর্পণ করা হইবে।*

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে-কার্যক্রম অবলম্বন করিতে হবে তাহার মধ্যে আছে অধিকতর কৃষিজ উৎপাদন, গ্রাম্য শিল্প, কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়ন, এবং সম্প্রদায়গত জীবনের (Community life) প্রসার। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার ফলে কৃষি-শ্রমিক বেকার বা অর্ধ-বেকার হইয়া পড়িলে গ্রাম্য শিল্পে তাহার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রদায়গত জীবনের প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীকে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করা হইবে এবং উন্নততর পরিকার্যের সাহায্যে সমবায়ী মনোভাবের বৃদ্ধিসাধন করা হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপান্তরিত হইবে।

পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার (Land Reforms in West Bengal):

ভারতে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ব্যাপারে বংগদেশকে পথিকৃৎ হিসাবে নিশ্চয়ই গণ্য করিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলাদেশই প্রথমে ভূমি-রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিয়া এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে স্বাধীন ভারত যখন বিভিন্ন

* First Five Year Plan—২০৬ পৃষ্ঠা

প্রদেশ বা রাজ্য ভূমি-সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইল, পশ্চিমবংগ তখন এ বিষয়ে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পরও পশ্চিমবংগ বেশ কিছুদিন এক নিশ্চেষ্ট রহিল। অবশেষে যখন অবশিষ্ট রাজ্যসমূহও ভূমি-সংস্কারের পথে পদসঞ্চার করে এবং কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কার কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন পশ্চিমবংগকে

পশ্চিমবংগে ১৯৫৩ সালের ভূ সম্পত্তি গ্রহণ আইন ও ইহার প্রবর্তন

সংস্কারক রাজ্যগুলির অনুবর্তী হইতে দেখা গেল। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবংগের বিধানসভায় বিল উত্থাপন করা হয় জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের জন্য। উক্ত বিল ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পশ্চিমবংগের আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক পাস হয় ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৯৫৩ সালের ভূ সম্পত্তি গ্রহণ আইন (The West Bengal Estates Aquisition Act, 1953) নামে পরিচিত। আইনটি কার্যকর হয় ১৯৫৫ সালের এপ্রিল বা বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে।

উপরি উক্ত আইনের মূল বিষয় হইল এইরূপ: উক্ত তারিখ হইতে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবংগে

মধ্যস্বত্বভোগীগণের বিলোপসাধন এই আইনের মূল কথা

এবং রায়ত অথবা ভূমির অন্যান্য প্রকার ব্যবহারকারীর সকলপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করা হইবে। জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী জমি হইতে তাঁহাদের নীট আয় অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ব্যাপারে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) অনুসরণ করা হইবে—অর্থাৎ, নীট আয় যত অধিক

ক্ষতিপূরণের হার

হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও তত কমিয়া যাইবে। ক্ষতিপূরণ এইরূপ দেওয়া হইবে:

নীট	আয়ের	প্রথম	৫০০	টাকা	অবধি	২০ গুণ
”	”	দ্বিতীয়	৫০০	”	”	১৮ ”
”	”	পরবর্তী	১০০০	”	”	১৭ ”
”	”	”	২০০	”	”	১২ ”
”	”	”	১০,০০০	”	”	১০ ”
”	”	”	১৫,০০০	”	”	৬ ”
”	”	”	৮০,০০০	”	”	৩ ”
”	”	”	অবশিষ্টাংশের জন্য			২ ”

ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ নগদ টাকায় এবং বাকি ঋণপত্রে দেওয়া হইবে। মধ্যস্বত্বভোগিগণের বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি, অনধিক ১৫ একর অকৃষি খাস জমি, বাগানের জমি, ফলের বাগানের জমি, পুষ্করিণী প্রভৃতি এবং ২৫ একর * অবধি কৃষি-

* মূল আইনে ৩৩ একর নিধারণ করা হইয়াছিল। পরে ইহাকে সংশোধন করিয়া ২৫ একর করা হ

াষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না। তবে বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও অকৃষি-জমি মিলিয়া াট ২০ একরের অধিক হইতে পারিবে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের পর

ির উর্ধ্বতন মাত্রা

সরকার এই সকল ভূ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে, অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া তাহার পরও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিতে পারে।

পশ্চিমবংগে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে,

ালোচনা : ইহা ির পুনর্বণ্টন ও জনাহ্রাস কোনটিরই স্থা করে নাই

বিলোপসাধনের জন্য আইন ভূমি সংস্কারের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য—ভূমির পুনর্বণ্টন এবং কৃষিজীবীদের খাজনার ভার হ্রাস—কোনটিরই ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং জমিদারী বিলোপের মোট ফল দাঁড়ায় যে, জমিদারশ্রেণীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী হইবে সরকার। উপরন্তু, অধিকাংশ সমালোচকের মতে, কলিকাতাকে উক্ত াইনের বহির্ভূত করিয়া রাখার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

লা হইয়াছে যে, ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবংগ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ াইনকে কার্যকর করা হয়। ফলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত

ই সকল সংস্কারকার্য-াধন বর্তমান রকারী প্রচেষ্টা

ভূমির বণ্টনকার্য সমাধা হয় নাই। রায়তদের পক্ষে প্রদেয় রাজস্বের লাঘব ঘটে নাই। ভূমি স্বত্বভোগের উর্ধ্বতন মাত্রাও নির্ধারিত হয় নাই এবং কলিকাতায় মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা পুরাপুরিই প্রবর্তিত রহিয়া ে। সুতরাং স্বভাবতই সরকারকে এই সকল কার্য সমাধায় যত্নবান হইতে হয়।

ইহাদের মধ্যে কলিকাতায় মধ্যস্বত্বলোপের জন্য আইন পাসের ব্যবস্থা হইতেছে এবং ূমির বণ্টনকার্য প্রভৃতির জন্য ভূমি-সংস্কার আইন (Land Reforms Act) পাস রা হইয়াছে।

পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন (West Bengal Land Reforms Act, 1956) :

পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। এই আইনের উদ্দেশ্য ভূমি-সংস্কারের তিনটি প্রধান নীতিকে কার্যকর

মি সংস্কার আইনের নটি প্রধান উদ্দেশ্য

করা—যথা, (১) ভূমির পুনর্বণ্টন ; (২) ভূমির স্বত্ব ভোগ বা জমি দখলের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ , এবং (৩) রায়তদের রাজস্বভারের াঘব। ভূমি-স্বত্বভোগের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে পূর্বতন জমিদারদের মতই —অর্থাৎ প্রত্যেক রায়ত এবং অন্যান্য ভূমির প্রত্যক্ষ ভোগকারিগণ অনধিক ২৫ একর করিয়া কৃষি-জমি, ১৫ একর করিয়া অকৃষি-জমি এবং বসতবাটী ও উহার সংলগ্ন জমি রাখিতে পারিবে। ভূতপূর্ব জমিদারগণের মতই অকৃষি-জমি এবং

উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন

বসতবাটী সংলগ্ন জমি মিলিয়া মোট ২০ একরের অধিক হইতে পারিবে না। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা অন্যান্য কৃষিজীবীর মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হইবে।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে গতিশীলতার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা—এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন এক নূতন অধ্যায়ের সূচনার চেষ্টা করিতেছে। ইহা হইল গতিশীলতা (progression) ভারতে কোন রাজ্য এখনও পর্যন্ত গতিশীল হারে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের পথে অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিমবংগে ভূমি-রাজস্ব নিম্নলিখিতভাবে গতিশীল করার ব্যবস্থা আইনে পরিব... করা হইয়াছে:

	রাজস্বের পরিমাণ
প্রথম ২ একর	রাজস্বের হারের শতকরা ১০ ভাগ
পরবর্তী ৩ "	" " " ১৫
" ৫ "	" " " ২০
" ৫ "	" " " ২৫
অবশিষ্টাংশের	" " " ৩০

'রাজস্বের হার' ও ইহা নির্ধারণের সূত্র

এখন 'রাজস্বের হার' (revenue rate) বলিতে কি বুঝায় বলা প্রয়োজন। রাজস্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে। প্রধানত ইহা জমির উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন, উৎপন্ন শস্যের বাজার দাম, জমির বাজার দাম প্রভৃতি অনুসারে নির্ধারিত হইবে। সাধারণত উৎপন্নের $\frac{১}{১০}-\frac{১}{৫}$ ভাগ এবং জমির বাজার দামের শতকরা ২ ভাগ রাজস্বের হার বলিয়া ধরা হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, জমিদারী বিলোপের পর খাজনা (Rent) শব্দটির পরিবর্তে রাজস্ব (Revenue) শব্দটি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইতেছে।

আইনে ভাগচাষী বা বর্গাদার এবং জোতের মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের বণ্টনের সূত্রও নির্ধারিত হইয়াছে। মালিক যদি কৃষিকার্যের ব্যয় (শ্রম ছাড়া) বহন করে তবে ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্যয় বহন না করিলে অর্ধেক পাইবে। সুতরাং মালিক অর্ধেকের বেশী কোন ক্ষেত্রেই পাইবে না।

পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি বণ্টন, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব... এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত মাত্র ৬৭ হাজার এ... জমি পুনর্বন্টিত হইয়াছে;* এবং জমির মালিক অনেকক্ষেত্রে বর্গাদারদের নিকট হই... মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী আদায় করিতেছে। যাহা হউক ভারতের অ... অংশের ন্যায় পশ্চিমবংগের বেলাতেও আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার কার্য বাকী দ্বি... পরিকল্পনাধীন সময়ে আরও ত্বরান্বিত হইবে।

* ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the different systems of Land Tenure that prevailed in India until recently. (C. U. B. Com. 1954) How would you classify the Land Tenures that obtain at present ?

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের ফলে বর্তমানে মাত্র দুই প্রকারের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা আছে—(১) যাহারা সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে গ্রহণ করে, (২) যাহারা প্রজা হিসাবে মালিকদের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করে…২৩৩-২৩৭ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠা]

2. "Rent of agricultural land in India depends on the inter-action of three forces—Custom, Competition and Legislation." Discuss the statement.

(C. U. B. Com. 1953)

[ইংগিত : ভারতে ভূমি-রাজস্ব প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইনের সম্মিলিত ফল হইলেও বর্তমানে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের ফলে আইনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে…২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the Land Policy under our Planned Economy. How far has the policy been implemented so far ? [২৪২-২৪৬ পৃষ্ঠা]

4. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India (C. U. B. Com. 1959) [২৪৩ এবং ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা]

5. Is the land revenue a tax or rent ? Give reasons for your answer.

[২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা]

6. Briefly describe the process of Land Reforms in West Bengal.

[ইংগিত : আলোচনা ১৯৩৮ সালের ভূমি-রাজস্ব কমিশন হইতে সুরু করিয়া ভূমি-সংস্কার আইনে আসিয়া শেষ করিতে হইবে…২৫৭-২৬০ পৃষ্ঠা]

7. Examine the case for Co-operative farming in India. What methods would you suggest for the development of Co-operative farming in this country ?

(C. U. B. A. 1959) [২৪৯-২৫৫ পৃষ্ঠা]

8. Describe the main features of the system of Co-operative village management and explain the possible advantages and disadvantages of the system.

(C. U. B.A 1952) [২৫৪ ২৫৭ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন

(The State and Agrarian Re-construction)

কৃষিব সম্পর্কে ভাবতে বাষ্ট যে-ভূমিকা গ্রহণ কবিয়া আসিয়াছে কৃষি সংক্রান্ত বিভি সমস্যাব আলোচনা হইতে সে সম্বন্ধে একরূপ সুস্পষ্ট ধাবণা কবা যাইবে। তবুও বাষ্ট্রে এই ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসাব দেওযা প্রযোজন মনে হয। নিম্নে তাহ করা হইতেছে।

অর্ধোন্নত দেশেব কৃষিব পুনর্গঠন (Agricultural Re-constructio in Underdeveloped Countries): শিল্পেব অনগ্রসবতা ও কৃষিব প্রাধ ভাবতেব ন্যায় অর্ধোন্নত দেশেব অর্থনৈতিক জীবনেব অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষিই এ সকল দেশেব প্রধান জাতীয় শিল্প। ভাবতেব জনসংখ্যাব শতকবা ৭০ ভাগ কৃষিজী এবং মাত্র শতকবা ১০ ভাগ শিল্প হইতে জীবিকার্জন কবে। শে অংশ চাকবি প্রভৃতিব উপব নির্ভবশীল। মোটামুটি মোট জাতী আয়েব অর্ধেকেব মত অর্জিত হয় কৃষি ও অনুরূপ কর্মসমূহ হ'তে। সংগঠিত কাবখা শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে সংগৃহীত হয যথাক্রমে জাতীয় আয়েব শতকবা ৮ ও ১০ ভাগ বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায।

কৃষির গুরুত্ব

অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষিব ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও কৃ সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জমিদ প্রথা ও বহুসংখ্যক কৃষকেব ভূমিহীনতা, কৃষিকার্যেব আদিম পদ্ধা কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়েব অব্যবস্থা, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতিব অভাব, ঋণ সববরাহ ব্যাপা মহাজন ও ব্যবসাদাবেব প্রাদুর্ভাব—এইগুলিই এই সকল দেশের কৃষি-ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য।

কৃষির অনগ্রসরতা

এই সমস্ত সমস্যাব সমাধান ভিন্ন কৃষির এবং স্বভাবতই ইহাব উপব নির্ভবশীল জাত অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থাব উন্নতিসাধন কবার কথা চিন্তা কবা যায় না। এই কার্য বাষ্ট্রকেই সম্পাদন কবিতে হইবে ইহাও বর্তমানেব অন্যতম স্বীকৃ নীতি। বস্তুত, বাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষিব সুসংগঠন অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নেব প্রাথমিক উপাদান (primary factor of development) বলিযা পবিগণিত হয। সোবিয়েত ইউনিয়নই এই দিকেই পথিকৃতের কার্য করে। জাবেব সময়ে বাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ছিল ভারতেরই মত। সোবিযেত আমলে কৃষকগণকে বাষ্ট্রাধীন যৌথ খামাবেব অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষিব অভাবনীয় উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে। নয়া চীন এই দিকে আব একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নয়া চীনে সমবায় পদ্ধতিতে অত্যল্প সময়েব মধ্যে কৃষির আশাতীত

কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

য়ন সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন নীতি সফলতা অর্জন করিতে পারে না। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হইলে তবেই কৃষির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া চীনে ইহাই করা হইয়াছে, এবং মানে সকল অর্ধোন্নত দেশই এই পথে অল্পবিস্তর পদসঞ্চার করিয়াছে বলা যায়।

তর কৃষির সর্বাংগীণ য়নের প্রচেষ্টা

অর্ধোন্নত দেশে কৃষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বে তাহার ইংগিত কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ কৃষি জোতকে একত্রিত করিয়া জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে মিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস করিতে হইবে। মহীন কৃষি-শ্রমিককে ভূমিদান এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণের য় কৃষককে গ্রাম্য মহাজনের উপর নির্ভরশীল রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে ং অল্প সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় মিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। রপর কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি বিষয়েও শ্রেষ্ঠ পন্থা। পর্যাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া, পারী, আড়তদার, মহাজন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের পক্ষে আর মোট য়মূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া হাটবাজারে ওজন ভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্য মজুত রাখার জন্য গুদামঘর স্থাপন করা প্রয়োজন।

র সুসংগঠনের জন্য লম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ

উপরি উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্যকর হইবে না যদি না কৃষকের মধ্যে নূতন দ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা যায়। এইজন্য একটি সম্প্রসারণ সেবা (extension service) গঠন করা প্রয়োজন * এই সেবায় একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে। সংগে সংগে অবশ্য অন্যান্যভাবেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পরিশেষে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া নূতন জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই দুই উদ্দেশ্যেই ভারতে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা গঠন করা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়। বর্তমানে অবশ্য জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য অপসারণ করিয়া উভয়কে একই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

ষকদের মধ্যে ৎসাহ ও উদ্দীপনার ষ্টি করিতে হইবে

* ভারতে এই ধরনের কর্মী গ্রামসেবক এবং তাহাদের কার্য 'জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা' বলিয়া অভিহিত।

ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র (The State in relation to Agriculture in India) : সেদিন পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কে সরকারের নীতি ছিল নিছক স্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*)। কারণ, সরকার ছিল বিদেশী সরকার। ইংরাজরা এদেশে আসিবার পর ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে যে-শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় তাহা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষ আঘাত হানে। প্রথা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের নীতির উপর ভিত্তিশীল কৃষি-ব্যবস্থাকে হঠাৎ আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য বিদেশী সরকার কৃষি-উন্নয়নের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করে নাই। তবে নিজস্ব স্বার্থে অবস্থার চাপে বিদেশী শাসক বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কার্য করিয়াছে একথা অনস্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলির স্বার্থে ভারতে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা, দুর্ভিক্ষরোধের জন্য কৃষি-দপ্তর সৃষ্টি ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই কৃষির উন্নয়নকে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তর (Imperial Department of Agriculture) এবং প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক কৃষি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : সরকারের নিষ্ক্রিয়তার নীতি

উন্নয়নমূলক কার্যে কিছু মনোনিবেশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকার উন্নয়নমূলক কার্যে আরও অগ্রসর হয়। ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করে এবং ১৯০৬ সালে সর্ব-ভারতীয় কৃষি কৃত্যকের (All-India Agricultural Service) সংগঠন করে। পুসাতে (Pusa) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়। ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় একটি কৃষি-খামার এবং একটি কৃষি কলেজ। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক কৃষি-খামার প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের দ্বারা প্রদেশে কৃষিকে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কৃষির উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় প্রাদেশিক কৃষি-দপ্তরগুলির উপর। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য হয় কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গাছপালা ও পশুরোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তবে প্রদেশগুলিতে অর্থের অভাবে কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

১৯২৬ সালে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) নিযুক্ত করা হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে কৃষির উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের কৃষিনীতি সম্পর্কে বহু সুপারিশ করে। সুপারিশের অধিকাংশই গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের দরুণ উহাদিগকে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর সরকার কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অধিক যত্নবান হয়। কিন্তু ভূমি-স্বত্ব আইন বা ঋণ বিষয়ে সংস্কার ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করা হয় না। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে ভারতীয় কৃষির দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। অবস্থার চাপে সরকার ১৯৪৩ সালে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান সুরু করে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সুফল ফলে না।

পরবর্তী যুগ সুরু হয় দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা হইতে। স্বাধীনতালাভের পর সরকারী কৃষিনীতিও পরিবর্তিত হয়। সরকার সক্রিয়ভাবে কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়। উপরন্তু দেশবিভাগের ফলে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে সরকারকে এ-বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইতে হয়। সরকার খাদ্য ব্যাপারে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য নূতনভাবে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করে।* কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য ও ঋণদান করিতে থাকে। রাজ্য সরকারগুলি আবার কৃষকশ্রেণীর সাহায্যার্থে অর্থ ও ঋণ প্রদান করিতে থাকে।

খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে অভিযান

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় কৃষি (Agriculture under Planned Economy) :

মোটামুটিভাবে দেশবিভাগের তিন বৎসর পরে, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে সুরু হয় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আসিয়া আমরা দেখিতে পাই অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের সহিত কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বপ্রধান স্থান নির্দেশ করা হয়। পরিমার্জিত হিসাবে (revised estimates) মোট ব্যয় ১,৩৫৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয় ২৫৭ কোটি টাকা। ইহা মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগের উপর। ইহার উপর সেচ ও বন্যা নিরোধ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের শতকরা ১৭ ভাগ। অর্থাৎ কৃষি ও জলসেচ খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কৃষিকে অগ্রাধিকার দিবার সপক্ষে যুক্তি ছিল যে, অধিক খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে অন্যান্য দিকে প্রসারসাধন করা সম্ভব নয়। কৃষির ক্ষেত্রে পরিমার্জিত পরিকল্পনার (Revised Plan) লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ৪৫ ভাগ, পাটের উৎপাদন শতকরা ৬৪ ভাগ, ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ এবং তৈলবীজের উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি করা। সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল মোট ৫ কোটি একর সেচসমন্বিত জমির পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া ৭ কোটি একরের কাছাকাছি লইয়া যাওয়া।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি

---

* ২১৫-১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিকল্পনার ফলাফল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘ শতকরা ২৯·৬ ভাগ এবং কৃষিজ পণ্যের সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনবৃদ্ধি অনুমানমত ঘটিলেও মোট কৃষিজ উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (index of agricultural production) পরিকল্পনাপূর্ব সময়ের তুলনায় শতক ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পা কোটি ৬৩ লক্ষ একরের মত, এবং ইহার ফলে মোট কর্ষিত জমির মধ্যে সেচসমন্বি জমির শতকরা ভাগ ১৬ হইতে ১৮-র উপর আসিয়া দাঁড়ায়। পতিত জমির পুনরুদ্ধা ইত্যাদির দ্বারা নীট কর্ষিত জমির পরিমাণকে (net area sown) বাড়াইয়া ২৯ কে ৩৪ লক্ষ একর হইতে প্রায় ৩০ কোটি একরে লইয়া যাওয়া হয়।* পরিশেষে প্রায় ৮ কে জনসংখ্যা সমন্বিত ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসার সেবার অধীনে আসে।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ঠিক করা হয় যে, ১৯৫৫-৫৬ সা উৎপাদনের উপর ১ কোটি টন বা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক খাদ্যশস্য, শতকরা ২৭ ভ অধিক তৈলবীজ, শতকরা ২২ ভাগ অধিক ইক্ষু গুড়, শতকরা ৩১ ভাগ অধিক তুলা এ শতকরা ২৫ ভাগ অধিক পাট উৎপাদন করা হইবে। কিছু পরেই খাদ্যসংকট হেতু কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যসমূহের কি কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টন বা শতকরা ২৫ ভাগে এবং মোট কৃষিজ উৎপাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ২৮ ভাগে লইয়া যাওয়া হয়। সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য হই আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিকে সেচসমন্বিত করা। ইহা ছাড়া অধিকতর স ব্যবহার, সংরক্ষণকারী খাদ্য (protective food) উৎপাদনের গুরুত্ব প্রদান এ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে সমগ্র গ্রামবাসীকে আন কবিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানে অবশ্য সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতী সম্প্রসারণ সেবার গঠন পদ্ধতিও লক্ষ্যের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। বৈদেশি মুদ্রাসংকটজনিত ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার যে ছাঁটকাট ও বদল করা হইয়াছে তাহাতে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ৫৬৮ কো টাকা হইতে ৫১০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।** খাদ্যোৎপাদন ও সামগ্রি কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের অবশ্য কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। তবে মনে যে ব্যয়হ্রাস হেতু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির পুনর্গঠনের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ মোটা একই। ইহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) সেচ-ব্যবস্থ

* Review of the First Five Year Plan

** ঊর্ধ্বতন ব্যয় (ceiling) অবশ্য ৫৬৮ কোটি টাকাতেই নির্দিষ্ট আছে, তবে আশংকা করা হইতেছে যে ৫১০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করা সম্ভব হইবে না।

...সার ও অধিক সার প্রয়োগ, (২) গো পশ্বাদির জাতের উন্নয়ন; (৩) পতিত ...মির পুনরুদ্ধার, (৪) বনভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, (৫) জোতের সংহতিসাধন, ভূমি-সংস্কার, সমবায় পন্থায় কৃষিকার্য, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা প্রভৃতি, (৬) কৃষি ঋণের সুব্যবস্থা, (৭) উন্নততর বীজ ব্যবহার, জাপানী ...দ্ধতিতে ধান্য চাষ এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত উন্নয়ন, (৮) সমবায় আন্দোলনের ...নর্গঠন, এবং (৯) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে ...মোন্নয়নের ব্যবস্থা।

...দ্বির উন্নয়নের জন্য ...বলম্বিত পন্থা

ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই ...কর হইয়াছে। এখন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ...প্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইবে।

...জোন্নয়ন পরিকল্পনা

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (Community ...Development Projects and National Extension Service):

...জোন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককাল হইতে। পূর্বে ইহার ...বর্তে 'গ্রামোন্নয়ন' 'সংগঠনমূলক কার্য' ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করা হইত। ...রাজী শব্দ 'কমিউনিটি' বলিতে আবার পূর্বে ধর্মীয় বর্ণগত বা অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ...াইত। বর্তমানে কমিউনিটি শব্দটি দ্বারা সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে বুঝান হয়। গ্রামীণ ...জের উন্নয়নে জাতিধর্ম ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকলেরই স্বার্থ যে এক —সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়।*

...জোন্নয়ন ...কল্পনার উদ্দেশ্য

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি: (১) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা; ...) গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ ত্রুটি দূর করা। উদ্দেশ্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইভাবে করা ...য়াছে: সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা "সমগ্র সমাজের সহায়তায়, এবং সম্ভব হইলে সমাজেরই ...দ্যোগে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন করিতে চায়, সমাজের পক্ষে উদ্যোগ ...র না হইলেও উহাকে অন্তত সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।"† ...খানে 'সমাজ' (Community) বলিতে গ্রামীণ সমাজকে বুঝাইতেছে ...টকথা, গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া ...লাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

...ভারতে গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা মোটেই নূতন নহে। গুরগাঁও-এ সমাজসেবী ...য়নে, বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবংগের সিংগুরে সর ভারতীয় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের

* Report of the Team for Study of Community Projects.

† Community Development Programmes in India, Pakistan and Philippines.

(All India Institute of Health and Hygiene) প্রতিষ্ঠাত্
গ্রামোন্নয়নের পূর্বতন প্রচেষ্টা
গ্রামোন্নয়নের এবং সরকার বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচে করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও 'গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার' আদর্শ তাঁহার গঠনমূলক কার্যক্রমের অংগীভূত করিয়াছিলেন। ইহাদের ঃ কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। ঐ সং সংযুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) সেবাগ্রাম, গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে, বোম্বাই-
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত
সর্বোদয় কেন্দ্রসমূহে এবং মাদ্রাজের ফরাক্কা উন্নয়ন পরিকল্প গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের ম গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে কর্ম পরীক্ষামূলকভাবে সুরু হ হইয়াছিল। এই সকল প্রচেষ্টার সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিক কমিশন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে উহার পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের এই সকল প্রচেষ্টার সফলতা এবং পূর্বতন গ্রাম ও ঃ উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিফলতার ফলে পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছিল
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ
কৃষকের জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগিভ জড়িত; সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে এই দিক বা ঐ দিকের উন্নয়নে প্রচেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য। গ্রামীণ জীবনের যদি কাম্য সংস্কারসাধ করিতে হয়, কৃষিকে যদি সার্থকভাবে পুনর্গঠিত করিতে হয় তবে সকল দিক দিয়া সমস্যাসমূহকে আক্রমণ করিতে হইবে, গ্রাম্য জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযু হইতে হইবে। উপরন্তু, জনসাধারণের সমবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে এইরূপ উন্ন পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কৃষকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে না পারিলে ইহা সার্থক হইতে পারে না। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এইরূপ প্রচেষ্টা তাহাদেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। সমবায়িক ভিত্তিতে গ্রামবাসিগণে
গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীর ভূমিকা
সহযোগিতা এবং উৎসাহই অবশ্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উ চাই সংগঠন এবং প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য। এই দুইটি হই সরকারের কার্য। সরকার অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং কার্যত্র গড়িয়া তুলিয়া প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিবে। পরিশেষে আ গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীর (village-level worker) ভূমিকা। কৃষককে গ্রামোন্নয়নে কার্যে উৎসাহিত করিবে, কৃষির উন্নয়নের জন্য তাহার গৃহের দ্বারদেশে আধুনি বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছাইয়া দিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে—গ্রাম-পর্যায়ে কর্মী। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীই হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সংগঠনে প্রথম ও প্রধান সোপান।

বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল সর্বতোভাবে গ্রাম্য জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল : (১) সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি, (২) গ্রাম্য পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতিসাধন ; (৩) গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা ; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ; (৫) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ; (৬) আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা (৭) উন্নততর গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা ; (৮) হস্তচালিত ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুনর্বাসন ; এবং (৯) সমবায়ের প্রসার।

উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

সংক্ষেপে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : মোটামুটি বিস্তৃত ৪৫০-৫০০ বর্গমাইল আয়তনের এবং ২ লক্ষ জনসংখ্যা ও ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর কৃষি-জমিসমন্বিত ২০০ ৩০০ গ্রাম লইয়া একটি পরিকল্পনা অঞ্চল (project area) গঠিত। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (development block) বিভক্ত। উন্নয়ন ব্লকের গ্রামগুলি আবার পাঁচটি করিয়া এককে (units) বিভক্ত। প্রত্যেক এককভুক্ত গ্রামগুলির জন্য একজন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামসেবক বা গ্রাম পর্যায়ের কর্মী নিযুক্ত আছে। সে-ই দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়া বেড়ায়, গ্রামবাসিগণকে সমবায়িক সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, মহিলা মণ্ডল প্রভৃতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করে ইত্যাদি। প্রথম প্রথম উপর হইতে নির্দেশ প্রদান করা হইলেও বর্তমানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ভার পঞ্চায়েত বা জনসাধারণের সংগঠনের (people's organisation) উপর ন্যস্ত। পঞ্চায়েতের সহিত সহযোগিতা করে মহিলা মণ্ডল, সমবায় সমিতি ইত্যাদি। গ্রামসেবক পঞ্চায়েতের সহযোগেই কাজ করে।

সংগঠন

সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান অর্থসাহায্য বণ্টন এবং পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer) এবং প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চলে একজন করিয়া পরিকল্পনা পরিচালনা কর্মচারী (Project Executive Officer) আছেন। ইঁহাদের পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া 'জিলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি' (District Planning and Development Committee) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে জিলা কমিটির উপরে আছে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee)। এই কমিটি নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রের কার্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন করে। দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের ভার অবশ্য রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনারের (Development Commissioner) হস্তে ন্যস্ত। উন্নয়ন কমিশনারকে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য কৃষিবিদ্যা, পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা, সমবায় ও পঞ্চায়েত, সামাজিক শিক্ষা, পথনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও (Technical Advisory Committee) আছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারিত হয় সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে। কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Centr Committee) আছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, কয়েক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া এই কমিটি গঠিত। পরিকল্পনা কার্য করিবার দায়িত্ব অবশ্য ১৯৫৬ সালে গঠিত সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্ত (Ministry of Community Development) উপর ন্যস্ত। ১৯৫৯ স সমবায় দপ্তরের সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবায় ও সমাজোন্নয়ন একই কার্যক্রমভুক্ত করা হইয়াছে।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: মূল পরিকল্পনা এবং মি পরিকল্পনা। মূল পরিকল্পনাগুলিতে (basic projects) সর্বাঙ্গ গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। মিশ্র পরিকল্পনাগুলি (mix projects) ইহার উপর মধ্য ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন, ন পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যও সম্পাদন করে।

শ্রেণীবিভাগ: মূল ও মিশ্র পরিকল্পনা

বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারি প্রবর্তিত হয়। ২রা অক্টোবর হইল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজীর অন্যত প্রধান আদর্শ ছিল ভারতের অগণিত গ্রামের উন্নয়ন। সুতর শুভদিনেই কার্যারম্ভ হয়। মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১ কোটি ৬ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত ৫৫টি উন্নয়ন ব্লক লইয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য সুরু কর হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ইহা বাড়িয়া ৫৬,৮৮৭টি গ্রাম ও ৩ কোটি ৩ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত ৩৭২টি ব্লকে দাঁড়ায়।* ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর তারি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাত বৎসর পূর্ণ হইলে দেখা যায় যে ঐ পরিকল্পনা ৩ ল ৫৯ হাজার গ্রাম সমন্বিত ২৫৫২টি ব্লকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং দেশের মোট জনসংখ্যা শতকরা ৪১ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ৬০ ভাগের কাছাকাছি ইহা অধীনে আসিয়াছে।**

প্রবর্তন ও প্রসার

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service): প্রথ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণকে গ্রামসমূহের সামাজিক আর্থিক সংগঠনের রূপান্তরের যথাক্রমে পদ্ধতি (method) এ এজেন্সী (agency) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।† এই এজেন্সী মাধ্যমের সূত্রপাত হয় অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান সম্পর্কিত কৃষ্ণমাচারী কমিটির (১৯৫ সুপারিশের ফলে। কৃষ্ণমাচারী কমিটি গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে পল্লীবাসিগণকে পরাম দিবার জন্য একটি সেবামূলক সংগঠন সৃষ্টি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এ

উদ্দেশ্য

* Review of the First Five Year Plan.

** Report of the Ministry of Community Development.

† First Five Year Plan—২২৩ পৃষ্ঠা।

গঠনের কার্য বা সেবার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসিগণকে গ্রামোন্নয়ন পরামর্শ দেওয়া ও দ্বুদ্ধ করা। এই সুপারিশ অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকার্য সুরু করা হয় মাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের ঠিক এক বৎসর পরে—১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধনে (intensive development) নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যপ্রকৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত অগভীর (less intensive)। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দেওয়া হইত, বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দ্বারা অথবা সরাসরি আর্থিক সাহায্য করা হইত; কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও পরামর্শই ছিল প্রধান। উৎসাহ ও পরামর্শের ফলে সেবাকেন্দ্রের দেশ কিছুটা উন্নতিসাধন হইলে পর ইহাকে পুরোপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে পরিণত করা হইত। এইভাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল একই উন্নয়ন কার্যক্রমের দুইটি পর্যায়।* সুতরাং সমাজোন্নয়নের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা পথ প্রস্তুত করা হইত।

(পার্শ্বটীকা: সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে পুরাতন পার্থক্য)

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা সমাজোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করা হয় না, কোন স্থানে সমাজোন্নয়ন ক্ষেত্র খুলিবার পূর্বে দেখা হয় যে ঐ স্থানের অধিবাসীরা আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত কি না। এক বৎসর এইভাবে পরীক্ষা করিয়া ৫ বৎসরের জন্য সমাজোন্নয়নের কার্য চালান হয়। তারপর আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান ও উহাকে সাহায্য করিয়া যাওয়া হয়।

(পার্শ্বটীকা: বর্তমানে পার্থক্য অপসারিত হইয়াছে)

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়াও রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১০ কোটি টাকা ধরা হয়। উক্ত ৯০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ৪৬ কোটি টাকা।† দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। সমাজোন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ করা হইবে। নির্দিষ্ট লক্ষ অনুসারে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস বা সুরু হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন কার্য সমাপ্ত হইবে—অর্থাৎ ঐ তারিখের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামবাসী এই পরিকল্পনার অধীনে আসিবে।

(পার্শ্বটীকা: ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয়)

---

* **Second Five Year Plan**—২৩৭ পৃষ্ঠা।

† **Review of the First Five Year Plan.**

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন (Evaluation of Community Projects and Nationa Extention Service) : সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, গ্রামবাসীরা ইহার দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছে—ইত্যাদি বি নিয়মিত বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। ইহার জন্য সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তরে সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluatio Organisation) আছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সংগঠন তিনবার মূল্যায়নকা সম্পাদন করে।

তৃতীয় মূল্যায়ন

ইহার মধ্যে তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয় যে সমাজোন্নয়ন কার্যক্রম গ্রা বাসীদিগের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ততটা সার্থক হয় নাই যতটা সার্থ হইয়াছিল জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদিগের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন "সমাজোন্নয়ন ব্লকের জনসাধারণ সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতির কা কারিতায় আজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রথম পরিকল্পনার ত্রুটি

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগি প্রসারসাধনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা পথঘাট, বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, জলসরবর প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। রিপোর্ট অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ ভু ভবিষ্যতের সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্ত সাধনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এইরূপ সুপারি করা হয়। কারণ, এই কার্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৃষ্টি-আকর্ষক হইলেও ইহার ফলাফল দীর্ঘস্থা

উক্ত তৃতীয় মূল্যায়ন অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে সফলতা অ সামান্যই হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল সকল উন্নয়ন ব্লকের সকল গ্রামে সমান হয় না উক্ত রিপোর্টে এই উক্তি করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনা পরিচালকগণ (Proje Officers) দৃষ্টি-আকর্ষক বাহ্যিক উন্নয়ন দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া যে সকল গ্রাম হইতে সহ সমাজোন্নয়নের ডাকে সাড়া পাইয়াছিলেন, সেই সকল গ্রামেই অধিকতর অর্থ ও কর্মশ নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ব্লকভুক্ত অন্যান্য গ্রামের মধ্যে একটা হতাশার সঞ্চ হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এইরূপ কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রিপোর্টে সতর্ক করিয়া দে হইয়াছিল।

ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ :

ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যকারি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়— যথা, (১) টেকনিক্যাল বিভাগসমূহকে (technical departments) শক্তিশালী করা, (২) জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের (popular institutions) সংগঠন, এবং (৩) সম্প্রসারণ এজেন্সী, টেকনিক্যাল বিভাগসমূহ ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ (Recommendations of the Study Team): প্রধানত এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরকরণের অসুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার সংগঠনগত সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীবলবন্ত্রী মেটার নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনাকারী দল (a Study Team) নিযুক্ত হয়। এই দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ঐ সালেরই (১৯৫৭) নভেম্বর মাসে। রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) প্রতি সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে;

(২) কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন করিতে হইবে;

(৩) জিলা-সংগঠনে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে এ-পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে কারণ এগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়, সহজসাধন-যোগ্য এবং চমকপ্রদ। কিন্তু এগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধিসাধন। আর্থিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী সহজেই এবং একরূপ আপনা হইতেই সম্পাদিত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে যেখানেই জলসেচের সুবিধা আছে সেখানেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; চাউল ও গম উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে; এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায় প্রথায় উন্নত কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জিলার সংগঠনের গণতান্ত্রিককরণের (democratisation) কথা বলা হয়। প্রতি ৮০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া 'পঞ্চায়েৎ সমিতি' থাকিবে। এই পঞ্চায়েৎ সমিতির হস্তে কৃষির উন্নয়ন, ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতির ভার থাকিবে। রাজ্য সরকার মাত্র বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্যে সংহতিসাধনের কার্য করিয়া যাইবে—সমিতির দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ইহা ছাড়াও পর্যালোচনাকারী দল আর একটি উক্তি করে। ইহা হইল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্র পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ঐ সময়কে আরও ৩ বৎসর বর্ধিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে 'মূল্যায়ন সংগঠন' (Evaluation Organisation) দ্বারা দুইবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দল (Evaluation Mission) দ্বারা একবার সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়। ইহার মধ্যে 'মূল্যায়ন সংগঠনের' শেষ বা পঞ্চম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে।

পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্ট

প্রথমোক্ত রিপোর্টটিতে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলির গঠন ও কার্যাবলীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়। নিম্নে রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল :

বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি ও সুপারিশ

কেন্দ্রগুলির আয়তন সম্বন্ধে রিপোর্টের বক্তব্য হইল যে গড়ে ইহারা ৭৫ হাজার করিয়া জনসংখ্যা লইয়া গঠিত। কিন্তু গঠন সম্পর্কে সুপারিশ ছিল যে, জনসংখ্যা ৬৬ হাজারের অধিক হওয়া উচিত নয়, হইলে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কেন্দ্রগুলিকে ক্ষুদ্রতর আকারে পরিণত করা প্রয়োজন।

উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর স্বল্পতা উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলির সফলতার পথে আর একটি বিশেষ অন্তরায়। ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) শতকরা ৪০ ভাগ কেন্দ্রেই নাই ; আবার যেখানে আছে সেখানে তাঁহাদের শিক্ষা পর্যাপ্ত নহে ; বিশেষজ্ঞদের অনুপাত আরও কম। সুতরাং ব্লক উন্নয়ন অফিসার ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও তাঁহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। সমাজোন্নয়ন সেবাকেন্দ্রগুলিতে মাথাপিছু ৩·৬০ নয়া পয়সা করিয়া ব্যয় করিবার কথা ছিল। কিন্তু হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, কার্যক্ষেত্রে মাথাপিছু ২ টাকা করিয়া ব্যয় করা হইয়াছে। দুইটি কারণে ইহা ঘটিয়াছে : (ক) বাজেটে মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের শতকরা ৬৩ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং (খ) অধিকাংশ সময় বরাদ্দ মঞ্জুরীতে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই দুইটি বিষয়েরই প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যে-সকল কেন্দ্রের কার্যকাল ৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেগুলিতে জনগণের শ্রম ও অন্যান্য দানের মূল্য কমিয়া শতকরা ১২০ ভাগ হইতে ৬৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিয়াছে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লক উন্নয়ন অফিসারগণ পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতি গঠন অপেক্ষা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও নির্মাণকার্যের (constructional items) উপরই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা ধানচাষের ক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতি অনুসরণই প্রধান। নির্মাণকার্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে পথ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ ; কূপ খনন, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির দিকেও কিছু কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ কার্য ঠিকমত করা হয় নাই। প্রয়োজনমত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রও (seed farm) স্থাপিত করা সম্ভব হয় নাই। উন্নততর বীজ যোগানের ত্রুটি প্রধানত বীজের অপ্রতুলতার জন্য; অপরদিকে সারের যোগান ঠিক সময়মত আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া উহা বণ্টন করিতে পারা যায় নাই।

মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর বা সেচ-ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র সেই সকল কেন্দ্রগুলিতেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল হইয়াছে। এই কারণে সুপারিশ করা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়টুকুতে এই সকল কেন্দ্রেই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

গ্রামসেবক, বিশেষজ্ঞ এবং ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের মধ্যে যাহাতে নিয়ত আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে এই সকল কর্মচারী সকলেই যাহাতে অংশগ্রহণ করেন তাহা দেখিতে হইবে।

বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে যে সকল পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। পঞ্চায়েতের সম্পাদক অনেক স্থানেই সরকারী কর্মচারী। যে সকল স্থানে বেসরকারী ব্যক্তিগণ ঐ পদ অধিকার করেন সেখানে তাঁহাদের গুণাবলী অতি নিম্নস্তরের। এই ত্রুটির প্রতিবিধান এবং পঞ্চায়েৎগুলির আয়বৃদ্ধিব ব্যবস্থা না করিলে সমাজোন্নয়নের সফলতা বিশেষ ব্যাহত হইবে।

আন্তর্জাতিক দলের মূল্যায়ন

উপরি উক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টে বলা হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালের পর হইতে ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে ও প্রসারে বিশেষ মন্দা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই পরিকল্পনার সম্ভাবনা একরূপ অপরিমেয়। সুতরাং ইহার পুনর্গঠন করা আশু প্রয়োজন।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন (Reorganisation of Community Development)ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলবন্তরাও মেটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীভূত হয় নাই, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কাম্য সার্থকতাও লাভ করে নাই। তাই বর্তমানে পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্ট (Fifth Evaluation Report) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট অনুসারে আবার পুনর্গঠনকার্য চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই সমবায়কে সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পুনর্গঠনকার্যে নির্দেশিত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কৃষির পুনর্গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। এই নূতন সর্বাংগীণ কার্যক্রমের মধ্যেই সমাজোন্নয়নের সফলতার

কৃষির পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের সংযোগ

সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। এ-সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানা যাইবে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে।

মূল্যায়নের উপসংহার : গ্রাম্য ভারতকে এক বিরাট মরুভূমির সহিত তুলনা করা চলে। ইহার উপর সামান্য জলসিঞ্চন করা হইলে কিছু দিন পরে তাহার আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। অতীতে গ্রাম্য ও কৃষির উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি এইরূপই হইয়াছে। অনেকের মতে, বর্তমানে সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছে বলা চলে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা গ্রাম্য জীবনে গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই—গ্রামবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রয়োজনমত পুনর্গঠন না করিতে পারিলে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না।

আন্দোলন ব্যাপক হইলেও গভীর হয় নাই

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।* একবার এই পদ্ধতি কার্য সুরু করিলে ভবিষ্যতের কার্যক্রম ইহার গতিবেগ ও অভিজ্ঞতা হইতে একরূপ আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়। "ইহা যতই সম্প্রসারণের পথে চলে ততই পুরাতন অভাব পূরণ ও নূতন অভাব সৃষ্টি হইতে থাকে।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে আন্দোলন যে-যে স্থানে সুরু হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেই ইহা নিশ্চল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংগঠনগত ত্রুটির দিক হইতে দেখা যায় যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য, চমকপ্রদ কার্যে সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ, গ্রামসেবকের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভারার্পণ, সমাজোন্নয়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট। ইহার উপর বর্ণগত ও অস্পৃশ্যতাজনিত বাধা, সম্পদ ও দারিদ্র্যের সহ-অস্তিত্ব সমাজোন্নয়নের সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ।

প্রশ্নোত্তর

1. **What are the problems of India's Agriculture? What, in your opinion, should be the main lines of reorganisation of agriculture in a country like India?**
(C. U. B. A. 1946, '48, '54) [২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা]

2. **Briefly indicate the role played by the State in India in relation to agriculture.**
[ইংগিত: প্রথমে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা কর। তারপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা কর।...২৬৪-২৭১ পৃষ্ঠা]

3. **Indicate the main features of Community Development Projects and National Extension Service launched in this country. Explain their usefulness as instruments of rural reconstruction.** (C. U. B. A. 1957) [২৬৮-২৬৯, ২৭০-২৭১পৃষ্ঠা]

4. **Give your own views on the achievements and prospects of Community Projects and National Extension Service in India.** (C. U. B. Com. 1959)
[২৭২-২৭৬ পৃষ্ঠা]

---

* ২৭০ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প

(Small-scale and Cottage Industries)

ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীতে কুটির শিল্প এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিত। দেশবিদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার সমাদৃত হইত। বিদেশী পর্যটকগণ ভারতীয় শিল্পীদের কলাকৌশল ও কারুকার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াই ১৯১৮ সালে শিল্প কমিশন (The Industrial Commission) মন্তব্য করে: আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইয়োরোপ যখন অসভ্য উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত, ভারত তখন তাহার শাসকগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য এবং শিল্পীদের কলাকৌশলের জন্য খ্যাতি অর্জন করে; এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাগ্যান্বেষী বণিকগণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখনও পশ্চিমের অধিক উন্নত জাতিগুলির তুলনায় ভারতের শিল্পপ্রসার কোনক্রমেই নিকৃষ্ট ছিল না।" প্রাচীনকালে রোম পারস্য সিরিয়া আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্পজাত বহু দ্রব্য চালান যাইত। নিপুণ কুটির শিল্পিগণ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিত। প্রাচীন ভারতের তুলা পশম ও রেশমের বস্ত্র, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, ইস্পাত, কাগজ, সুগন্ধি দ্রব্য, কাচের সামগ্রী, অলংকার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। দিল্লীর অশোক স্তম্ভ লৌহশিল্পের এক গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। বয়ন শিল্প সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "জনসাধারণের জাতীয় শিল্প ছিল বয়ন শিল্প এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক সুতাকাটায় নিযুক্ত থাকিত।"

অতীত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ (Causes of Decline of Cottage Industries): অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুটির শিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধ্বংসকার্য পুরাদমে চলিতে থাকে। যে সমস্ত কারণে ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইল প্রধান:

ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পসমূহের অবনতি ও ইহার কারণ:

(১) **রাজদরবারের বিলুপ্তি:** বিত্তশালী রাজসভাসদগণ ও অভিজাত সম্প্রদায় কুটির শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইঁহাদের বহু সৌখিন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ

করিত বিভিন্ন কুটির শিল্প। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কুটির শিল্পজাত তুলা ও রেশম দ্রব্য মুঘল রাজত্বের সময় আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি ও প্রসারলাভ করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার হইবার পর দেশীয় রাজা ও নবাবগণ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে থাকেন এবং কুটির শিল্পেরও অবনতি ঘটিতে থাকে।

(২) প্রতিকূল বৈদেশিক প্রভাব: ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের পর ভারতের নূতন ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শাসকের সব কিছুকে অনুকরণ করিতে এবং বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতই কুটির শিল্পের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

● (৩) বিদেশী শাসকের নীতি: ইংরাজরা বণিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতে আসে বাণিজ্য প্রসারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে কিন্তু শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডের কায়েমী স্বার্থ পার্লামেণ্টের সহায়তায় কোম্পানীকে তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য ভারত হইতে স্বল্প মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করিতে বাধ্য করে অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষ করিয়া ঐ শতাব্দীর শেষভাগ, ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের দমন ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রসারসাধনের নীতি দ্বিধাহীনভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। যাহাতে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ইংল্যাণ্ডের বাজারে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য উচ্চ হারে শুল্ক বসানো হয়। এই অত্যধিক শুল্কের সাহায্যেই ভারতীয় তুলা ও রেশম জাত দ্রব্য ইংল্যাণ্ডের বাজার হইতে বিতাড়িত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইংল্যাণ্ড আইন করিয়া ভারত হইতে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। অপরদিকে, ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত পণ্য বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করিতে পারিত। এই প্রসংগে অধ্যাপক হোরেস উইল্‌সন (Prof. Horace Wilson) যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "এই প্রকারের উচ্চ হারে শুল্ক ও নিষিদ্ধকারী আইনকানুন না থাকিলে পেইজলী (Paisley) এবং ম্যানচেষ্টারের (Manchester) মিলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাষ্পশক্তির সাহায্য সত্ত্বেও ইহাদের চালনা করা সম্ভব হইত না।" এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের সাহায্যে যে যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার দ্বারা উৎপাদিত তুলাজাত দ্রব্যে অচিরেই ভারতের বাজার ছাইয়া গেল। ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানির মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় বাজারেই বিক্রীত হইতে লাগিল।

কোম্পানী কর্তৃক ব্রিটিশ শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য ভারতীয় শিল্পের দমন

(৪) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা: ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের (১৭৭৬-১৮২০) ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বৃহদাকারের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ, অধিক মূলধন নিয়োগ, উন্নততর সংগঠন, বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রভৃতি অভূতপূর্বভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস করে। যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে অবাধে আমদানি হইতে থাকে। প্রতিযোগিতায়

টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পথঘাটের উন্নতি ও রেলপথ নির্মাণের ফলে স্বল্প মূল্যের বিদেশী দ্রব্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া পৌঁছায়। ভারতীয় শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ভারত কাঁচামাল ক্রয় এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়।

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও শিল্পবিপ্লবের ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হাজার হাজার তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিগর চিরাচরিত বৃত্তি হারাইয়া পরিবর্তনের মুখে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতের সহিত ঐ সমস্ত দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তনের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দেয়।

ভারতে কুটির শিল্পের ধ্বংস ও কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি

দুর্দশাগ্রস্ত কারিগরগণ অচিরেই নূতন কলকারখানায় স্থান পায় এবং শহরাঞ্চলে আসিয়া ভিড় জমায়। ভারতের দুর্ভাগ্য হইল যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অথচ বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল না। সুতরাং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হারাইয়া কৃষি ভিন্ন জীবনধারণের অন্য কোন অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামাঞ্চলের দিকে তাহারা ধাবিত হইল।

ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ (Causes of the Survival of the Cottage Industries in India):

উপরি-উক্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে পতিত হইয়াও কতকগুলি কুটির শিল্প দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কতকগুলি কারণ বর্তমান থাকার দরুনই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

১। কুটির শিল্পের অপেক্ষাকৃত সুস্থ পরিবেশ

প্রথমত, কারখানার শ্রমিকের তুলনায় কুটির শিল্পী অধিকতর সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। পরিবারবর্গের সাহচর্যে স্বাধীনভাবে নিজ বৃত্তি অনুসরণের আকর্ষণ সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব গৃহের আকর্ষণ এবং নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাবও কুটির শিল্পকে তাহার চিরাচরিত পেশাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

২। বিকল্প পেশা ও নিয়োগের অভাব

তৃতীয়ত, প্রথার প্রভাবের ফলেও অনেকে বর্ণগত পেশায় ব্যাপৃত থাকে। চতুর্থত, জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষিকার্য সারা বৎসর ধরিয়া চলে না; বৎসরের ৩-৪ মাস কর্মহীনভাবে কাটাইতে হয়।

৩। বর্ণগত প্রথা ও প্রভাবের ফল

এই অবসর সময়ে অনেক চাষীই তাহাদের সামান্য আয়কে বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পকে অনুপূরক বা পার্শ্বজীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে। পঞ্চমত, গমনাগমনের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক অঞ্চল আবার এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে।

৪। পার্শ্বজীবিকা হিসাবে কুটির শিল্প কৃষির অনুপূরক

এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা তীব্র না হওয়ায় অনেক কুটির শিল্প এখনও টিকিয়া আছে। ষষ্ঠত, অনেকের

মধ্যেই প্রচলিত ধারণা আছে যে, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক টেকসই। এই কারণেও অনেক ক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। সপ্তমত, কুটির শিল্পীরা অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, তন্তুবায়গণ মিলজাত সুতা ও উন্নত ধরনের মাকু, রঞ্জকগণ উন্নত ধরনের রং করিবার দ্রব্যাদি, এবং দরজীরা সেলাই-এর কল প্রবর্তন করিয়া উৎপাদনের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছে। অষ্টমত, এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা কলকারখানায় প্রস্তুত করা অসম্ভব বা অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ, যে-সমস্ত দ্রব্য কারুকার্যখচিত অথবা যাহা কেবল স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। উপরন্তু, এখনও বহু শিল্পরসিক আছেন যাঁহারা পূর্বেকার শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রচার-কার্যের ফলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কতকটা বাড়িয়াছে। পরিশেষে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিতেছে। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

৫। অনেক স্থানে যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পের প্রতিযোগিতাও তীব্র হইয়া উঠে নাই

৬। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত টেকসই

৭। কুটির শিল্পে উন্নততর কৌশল অবলম্বন

৮। ক্ষুদ্রায়তনেই কয়েক প্রকার দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব

৯। শিল্পরসিক ও প্রচারকার্য

১০। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য

ক্ষুদ্রয়াতন ওকুটির শিল্পের সংজ্ঞা (Definitions of Small-scale and Cottage Industries)ঃ সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industries), (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industries) এবং (৩) কুটির শিল্প (Cottage Industries)। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'ইকাফে'র (ECAFE) তৃতীয় অধিবেশনে কুটির শিল্পেব যে-সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয় তাহা হইল : আংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্প কারিগর সম্পূর্ণভাবে ব প্রধানত পরিবারের অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত করে তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়ঃ ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অনুমোদন করে।

সকল প্রকার শিল্পের শ্রেণীবিভাগ

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশন বলে যে সম্পূর্ণ এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয় শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (entrepreneurs) মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যায় :

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য

কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় উৎপাদনকার্য সম্পাদন করে ; কারিগর নিজস্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল ; সে অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। এই শিল্প কারিগরের আসল পেশা নাও হইতে পারে। কৃষিকার্য বা অন্য কোন প্রধান বৃত্তির সহিত পার্শ্বজীবিকা হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্য কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয় না ; স্বল্পায়তন কারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনকার্য চলে। সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ১০ জন হইতে ৫০ জনের মত শ্রমিক থাকে এবং শিল্পপতির আর্থিক সম্বলও সামান্য হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা শহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধারণ করিলে তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হইবে সে সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cottage and Small-scale Industries) : কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে (১) গ্রাম্য ও (২) পৌর—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে কতকগুলি আছে যাহা কৃষকগণ কৃষিকার্যের সংগে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে পরিচালনা করে। বৎসরের ৮ মাসের মত চাষী কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে। এমনকি কৃষিকার্যের সময়েও সে সবক্ষণ কৃষিতে লিপ্ত থাকে না। এই অবসর সময়ে সে তাহার আয়বৃদ্ধি ও গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য নিজ গৃহের কোন-না-কোন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি প্রস্তুত, বেতের কার্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন শিল্প অধিক প্রসিদ্ধ। পরে হস্তবয়ন বা তাঁত শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

শ্রেণীবিভাগ—গ্রাম্য ও পৌর

গ্রাম্য শিল্পসমূহের প্রকৃতি পরিচয়

গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে আবার কতকগুলি শিল্প আছে যাহা গ্রামের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে এবং কারিগরগণ ইহাদিগকে জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার-মিস্ত্রী, তাঁতী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমৃদ্ধশালী গ্রামগুলিতে স্বর্ণকারও থাকে। এই শিল্পিগণ গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। এক সময় ছিল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের ইহারা ছিল

গ্রামীণ জীবনের অংগীভূত কুটির শিল্প

অপরিহার্য অংগ। অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এই গ্রাম্য শিল্পিগণ। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা গ্রাম্য শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। অনেক গ্রাম্য শিল্পী জীবিকার্জনের জন্য সহরাঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা হইলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক শিল্প দেখা যায়। শিল্পিগণ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। গ্রাম্য শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

উপরি-উক্ত ধরনের শিল্প ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বহু সুকুমার কলাশিল্প আছে। বাংলা, কাশ্মীর ও মহীশূর রাজ্যে রেশমশিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। মির্জাপুর ও বেনারসের কার্পেট-বুনন, বাংলা ও বিহারের ধাতুশিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। উত্তরপ্রদেশের কাচের চুড়ি ও বাংলার সূক্ষ্ম সূচিকর্ম-বিশিষ্ট বস্ত্রাদি অন্যান্য দেশে পর্যন্ত চালান যায়। কাশ্মীরের শাল সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মাটির খেলনা ও মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণকার্যেও বহু মৃৎশিল্পী নিযুক্ত রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের সুকুমার কলাশিল্প

গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আছে তাহার কাজকারবার প্রায় ক্ষেত্রেই বৎসরের নির্দিষ্ট সময় চলে এবং প্রধান কৃষিজ পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতির (processing) সহিত এই শিল্পগুলি সংশ্লিষ্ট। পূর্বোল্লিখিত চাউলের কল, ময়দার কল ছাড়াও ইক্ষু হইতে গুড় ও খান্দসারী প্রস্তুতের কারখানার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগের সংস্থা হিসাবে স্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায় সম্প্রতি অবশ্য এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের নগরগুলি শিল্পকলার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ও কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য নগরাঞ্চলের শিল্পকলাকে সম্প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই এর কাজ, সূচীশিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুটির শিল্প ছাপাখানা ব্যতীত নগরাঞ্চলে স্বল্পায়তন গেঞ্জীর কারখানা, যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু রকমের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও আছে। এখন তুলাতাঁত শিল্প বা হস্তবয়ন শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তুলাতাঁত শিল্প (The Cotton Handloom Industry): কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্প হইল সর্বপ্রধান। দেখা গিয়াছে যে, তাঁত শিল্পে ৫০ লক্ষ* লোক নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ, অন্যান্য সংগঠিত শিল্পে যতসংখ্যক লোক নিযুক্ত হয় প্রায় ততসংখ্যক লোক

তাঁতশিল্পের গুরুত্ব

* India—1959.

একমাত্র তাঁতশিল্পেই নিযুক্ত আছে। কারিগরগণের পোষ্য ব্যক্তিগণকে ধরিলে তাঁত-শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ কোটির মত হইবে। সুতরাং নিয়োগের দিক দিয়া কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৩০ কোটি গজের মত তাঁতের কাপড় উৎপাদিত হয়। বলা হয় যে, ভারতের বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পূরণ হয় এই তাঁতের কাপড়ের দ্বারা।†

উল্লিখিত গুরুত্ব সত্ত্বেও তাঁতশিল্প বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। ইহা হইল কাপড়ের কলগুলির প্রতিযোগিতা। যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তাঁতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু পরে মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতশিল্প সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। এই সংকট প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ঐ সকল ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে কিনা এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় তাঁতশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার সপক্ষে কোন সংগত যুক্তি আছে কিনা।

যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় তাঁতশিল্পের সুবিধা

কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় কয়েকটি সুবিধা ভোগ করে। প্রথমত, তাঁতে বিভিন্ন নক্সার কাপড় যেভাবে উৎপন্ন করা যায় যন্ত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনে তাঁত অধিক মাত্রায় সমর্থ। দ্বিতীয়ত, অতি সূক্ষ্ম সুতার কাপড় বয়নে যন্ত্রশিল্প তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁতের সূক্ষ্ম কাপড়ের চাহিদা এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। এমনকি মোটা সুতার কাপড়ের বেলায়ও মিলের পক্ষে তাঁতকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করা খুব সম্ভব নয় - কারণ এরূপ তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় প্রায় কাঁচা-মালের দামের সমান হয়। মাঝারি ধরনের কাপড় উৎপাদনে অবশ্য মিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তৃতীয়ত, ইহা ব্যতীত এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় অধিক টেকসই। ফলে অনেকেই মিলের কাপড়ের পরিবর্তে তাঁতের কাপড় পছন্দ করিয়া থাকে।

তাঁতশিল্পের উপরি-উক্ত সুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ বিবেচনা প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁতশিল্পে অধিক মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সহজেই উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁতশিল্প হইতে অসংখ্য লোক জীবিকা অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকও সামান্য উপার্জনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। যে-হারে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা যে-আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে নিয়োগের

† **Report of the All-India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society for the year 1958–59.**

সংস্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের মত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তৃতীয়ত, ক্রেতা হিসাবে তাঁতশিল্প প্রস্তুত সূতার চাহিদার সৃষ্টি করে।

তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ

অতএব, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং ভারতীয় আর্থিক কাঠামোতে ইহার এক বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই আছে।

তবে তাঁতশিল্পের কতকগুলি সমস্যা আছে যাহার সমাধান এই শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে মূলধনের অভাব, সংগঠনের অব্যবস্থা, বিক্রয়করণের অসুবিধা, চিরাচরিত অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতাই হইল প্রধান।

তবে ইহার কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে :

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তন্তুবায়কে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয়। মহাজন বা ব্যবসায়ী তাহার দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের সর্তে ব্যবসায়ী তাহাকে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। সুতা ব্যবসায়ে নানা প্রকারের দুর্নীতি চলিতে থাকে। এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর লাভ শতকরা ৪৭ টাকা পর্যন্ত উঠে।

১। মূলধনের অভাব

বিক্রয়করণের অসুবিধা হইল তাঁতশিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা। বিক্রয়করণের অসুবিধাব জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের পরিমাণ এখনও অধিক, ফলে তাঁত শিল্পীও উৎপাদনবৃদ্ধিতে বিশেষ উৎসাহিত হয় না।

২। বিক্রয়করণের ব্যবস্থা

৩। অপকৃষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতি

তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও অনুন্নত এবং শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা অ-পর্যাপ্ত। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য উৎকৃষ্ট ধরনেব হয় না।

পরিশেষে আছে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা। কানুনগো কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৬০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য মোট ৪০০ কোটি গজ এবং রপ্তানির জন্য ১০০ কোটি গজ—এই মোট ৫০০ কোটি গজ মিলের কাপড়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মিলগুলি ১৯৫৭ সালেই ৫৩৭ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। অপরদিকে আবার রপ্তানিব পরিমাণ কমিয়া মোট ৬০ কোটি গজে দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বিত ফলে তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্যা সংকটে পরিণত হয়। সংকটের সমাধানকল্পে তাঁতশিল্প মিলের উৎপাদন নূতনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার দাবি জানানো হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় তাঁতশিল্প বর্তমান অপেক্ষাও সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। সেই সময় হইতে ইহার পুনরুদ্ধার ও প্রসারসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : (ক) তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং (খ) সরকারী প্রচেষ্টা।

নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিক্ষা-সংগতি অনুসারে উন্নততর কলাকৌশলের প্রবর্তনই হইল তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে তন্তুবায়গণ ক্রেতাদের রুচি ও ফ্যাসানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বস্ত্র উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, উন্নত ধরনের মাকু ও তাঁত প্রবর্তন করিতেছে এবং বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য রাসায়নিক রঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। উপরন্তু, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মূলধন সংগ্রহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইতেছে।

ক। উন্নয়নকল্পে তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধার উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা হইল বিভিন্নমুখী। প্রথমত, তাঁতশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৫২ সালে একটি সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board) গঠন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে এই বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বোর্ড শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শপ্রদান, বিক্রয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্যকর করে। তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় নক্সা কেন্দ্রও আছে। দ্বিতীয়ত, তন্তুবায়গণের মধ্যে যাহাতে সমবায়িক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় সমিতির অধীনে তাঁতের সংখ্যা ৬ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়।* তৃতীয়ত, দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি প্রসারের জন্য একটি তাঁতজাত দ্রব্য বিক্রয়করণ সমিতি (All-India Handloom Fabrics Marketing Society) গঠিত হইয়াছে। ইহার উপর সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য ১৯৫৩ সালে সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ সংগঠন (Central Marketing Organisation) স্থাপন করা হইয়াছে। এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে। বিভিন্ন শহরে ইহার শাখাও আছে। চতুর্থত, খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থসাহায্য করিবার জন্য উৎপন্ন মিলের কাপড়ের উপর টাকা প্রতি ২ নয়া পয়সা হারে সেস্ বা শুল্ক বসান হইয়াছে। এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ সেস্ তহবিলে (Cess Fund) জমা হয় এবং তহবিল হইতে প্রয়োজনমত খাদি ও তাঁতশিল্পকে অর্থসাহায্য করা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম গৃহীত নীতি অনুসারে মিল কর্তৃক ধুতি কাপড় উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে

খ। উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা :

১। বিভিন্ন বোর্ড গঠন

২। সমবায়িক প্রচেষ্টার প্রসার

৩। বিক্রয় ব্যবস্থার সংগঠন

৪। সেস্

৫। মিলের উৎপাদন সীমাবদ্ধকরণ

* Second Five Year Plan—৪৩৬ এবং ৪৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁতজাত ধুতির বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠত, তাঁতজাত ও খাদি দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যয়ে রেয়াৎও (rebates) দেওয়া হইতেছে। সাধারণ সময়ে এই রেয়াতের হার হইল টাকায় ৬ নয়া পয়সা বা শতকরা ৬ ভাগ। পরিশেষে, তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও নানাভাবে অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্ব-ভারতীয় সুতাকাটা সমিতিকে (All-India Spinners' Association) অর্থসাহায্যের উল্লেখ করা হইতে পারে। রাজ্য সরকারগুলিও আপনাপন অঞ্চলে তাঁতশিল্পকে অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করিতেছে।

৬। রেয়াৎ ও অর্থ-সাহায্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের জন্য মোট ব্যয় করা হয় ১২ কোটি ২ লক্ষ টাকা এবং খাদির জন্য ব্যয়িত হয় ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।* উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং এই ব্যয়ের ফলে ভারতীয় তাঁতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে বেশ কিছুটা মুক্ত হইয়াছে। তাঁতশিল্পের উৎপাদনও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ২৩০ কোটি গজ। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদন ছিল ১৪৫ কোটি গজ। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরে উৎপাদনবৃদ্ধি হইয়াছিল ৮৫ কোটি গজ।

প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

উৎপাদনবৃদ্ধি

খাদির উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মূল্য ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ১০ কোটি টাকার উপর দাঁড়ায়।

তবুও তাঁতশিল্প সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত হয় নাই। এই শিল্পের কর্তৃপক্ষের মতে, মিলের কাপড়ের উৎপাদন-ক্ষমতা নূতনভাবে সীমাবদ্ধ না করিলে তাঁতশিল্প কখনই সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারিবে না। সুতরাং দাবি করা হইতেছে মিলে শাড়ী ও মোটা কাপড় উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া ঐ ভার তাঁতশিল্পকে দেওয়া হউক।**

এই প্রসংগে পশ্চিমবংগে তাঁতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। এই রাজ্যের প্রধান কুটির শিল্প এই তুলা তাঁতশিল্প। বর্তমানে পশ্চিমবংগে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতে ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। মোট তাঁতসংখ্যার মধ্যে ৭৪ হাজার সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এবং ৫৬ হাজার ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৬ কোটি গজের মত কাপড় উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবংগের তাঁতশিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হইল : (১) মূলধনের অভাব, (২) বিক্রয়করণের অব্যবস্থা এবং (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি। এখনও অধিকাংশ তন্তুবায় অর্থ সাহায্য, কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়

পশ্চিমবংগের তাঁতশিল্প

পশ্চিমবংগের তাঁত-শিল্পের সমস্যা

* India 1959.

** The Hondloom Industry and its Problems by M. Somappa, President Handloom Fabrics Co-operative Society.

আর একটি বিশেষ অসুবিধা হইল যে তন্তুবায়গণকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের মিলগুলি হইতে সুতা সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে সুতার মূল্য অধিক হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়।

উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি পশ্চিমবংগের রাজ্য সরকার তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র (Government Sales Emporium) খোলা হইয়াছে এবং সমবায়িক শিল্প ইউনিয়নের (Co-operative Industrial Union) সহিত সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির মারফত তাতজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবংগে খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড এবং একটি তাঁতশিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রের মত পশ্চিমবংগ রাজ্যেও একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and Village Industries Board) এবং একটি তাঁতশিল্প বোর্ড (The State Handloom Board) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাতশিল্পের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করা হয়। স্থির হয় যে এই পরিকল্পনার শেষে তাতশিল্পের উৎপাদনকে ১৪৫ কোটি গজ হইতে ২৫০ কোটি গজে লইয়া যাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় তাতশিল্পের বিভিন্নদিকের উন্নতির জন্য ৫৯.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালেই তাঁতশিল্প ২০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিয়া ঐ লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার ফলে তাঁতশিল্পের সমস্যা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কারণ, সংগে সংগে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পেরও উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আশা করা যায়, মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার বাৎসরিক ১৫ গজ হইতে অনুমিত ১৮ গজ দাঁড়াইলে এই সংকট কতকটা দূরীভূত হইবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁতশিল্পের সংরক্ষণের জন্য মিলের উপর নূতন বাধানিষেধ বসানো প্রয়োজন হইতে পারে।

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান (Place of Cottage and Small scale Industries in Indian Economy):

ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিতে হইবে

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন তোলা হইয়াছে যে, বৃহদাকার যান্ত্রিক শিল্পের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন সার্থকতা আছে কিনা? অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও বলিতে হয় যে, ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে এক বিশেষ স্থান

নির্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এমনকি অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ লক্ষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে যাহার প্রত্যেকটির শ্রমিক-সংখ্যা হইল ১ জন হইতে ৪ জন এবং ঐ দেশের সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯২.৫ ভাগ হইল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা। দেশের মোট শ্রমজীবীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ নিযুক্ত রহিয়াছে এই সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়ে এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়গুলির শতকরা ৩৪ ভাগ হইল ইহাদের হস্তে। মাত্র ৫ জন হইতে ৩০ জন লোক নিয়োগ করে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ উৎপন্ন করে। এবং দেশের মোট নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ২৯ জন এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩০ জনের কম লোক নিয়োগ করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান জাপানে হইল শতকরা ৮০ ভাগ।*

শিল্পোন্নত দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের নির্দিষ্ট

এখন দেখা যাউক, ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি কি কি? প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি (small enterprises) ১,৯১০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিয়োগ করে। অপরপক্ষে ফ্যাক্টরীগুলি (factory establishments) ঐ সালে ৫১০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ২৯ লক্ষ লোক নিয়োগ করে। জাতীয় আয় কমিটির এই হিসাব সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের (small enterprises) মধ্যে কুটির শিল্পগুলিকে ধরা হইলেও ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে 'ফ্যাক্টরী' পর্যায়ে পড়ে এই রকমের ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই শেষোক্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। সরকারী হিসাব অনুসারে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইবে অন্তত ২ কোটি।† যদি যথাযথভাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় তবে নিয়োগবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ লক্ষ লোকের উপর বেকার থাকিয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার সহিত ১ কোটি ৫ লক্ষ বেকার সংযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার যে কত থাকিবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। এইরূপে বিরাট বেকার সমস্যার একটা মোটা অংশের সমাধান ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রসারের দ্বারাই করা সম্ভব—কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শি

ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি:

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব

* The Fiscal Commission Report (1949-50)—১০১ পৃষ্ঠা

† India, 1959

ধনের তুলনায় শ্রমশক্তি অধিক নিয়োগ করে; অপর পক্ষে বৃহৎ কারখানার শিল্পে অল্প লোক অধিক মূলধনের সহযোগে উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিক নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা দিতে সমর্থ। বিশেষত, শিক্ষিত বেকারদের পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশেষ উপযোগী।

। মূলধনের স্বল্পতার যুক্তি

দ্বিতীয়ত, ভারতের মূলধন সীমাবদ্ধ। অথচ বৃহৎ মূল শিল্পগুলির প্রসার ব্যতীত দেশের স্থায়ী আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং মূল শিল্পগুলিতে যাহাতে মূলধন নিয়োগ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ভার অধিক মূলধন-প্রয়োগকারী কারখানা শিল্পের উপর না দিয়া স্বল্প মূলধন-প্রয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর দেওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, মূল শিল্পের প্রসার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে অধিক ক্রয়শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য দুর্মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি না হয় সেজন্যও কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে অধিক মাত্রায় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানের যুক্তি

। সংগঠনের সরলতার যুক্তি

তৃতীয়ত, বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের জন্য শিল্প-পদ্ধতি ও শিল্প-সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে। এই দিক হইতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা হইল যে, ইহাতে বিশেষ সংগঠন-দক্ষতা ও প্রয়োগ-কৌশল প্রয়োজন হয় না।

। বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থত, মাত্র কয়েকটি সহরে বা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পগুলির কতকগুলি দুর্বলতা থাকিবেই। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলা হয় যে, যুদ্ধের সময় শিল্পাঞ্চলের উপর আক্রমণ হইলে দেশের আর্থিক জীবনে সহজে বিশৃংখলা আসে। সমগ্র দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়াইয়া দিতে পারিলে এই বিপদের সম্ভাবনা ততটা থাকে না।

। আর্থিক বৈষম্য অপসারণের নির্দেশ

পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে অসাম্য ও নিরবলম্ব অবস্থা প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকের ধারণা যে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পের প্রসারের সাহায্যে এই আর্থিক বৈষম্যকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। সুতরাং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার (decentralised industrial system) সংগঠন করা হইল আশু কর্তব্য। আরও বলা হয় যে, বৃহৎ শিল্পোদ্ভবের ফলে যন্ত্র মানুষকে আজ চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার স্বাধীনতা, তাহার সৌন্দর্যবোধ, তাহার সৃষ্টির প্রেরণা ও তৃপ্তিবোধ সমস্তই অতি নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রদানব কর্তৃক নিষ্পেষিত হইতেছে। মুক্তির একমাত্র উপায় হইল শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ। বলা হয় যে, সমবায়িক সংগঠনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থার সাহায্যে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-ব্যবস্থাই অধিক কাম্য।

৭। যান্ত্রিক জীবন হইতে মুক্তির দাবি

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও কুটির ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। এই দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষি উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে আ অতি সামান্যই হয়। তা'ছাড়া বৎসরের কয়েক মাস মাত্র চাষে কার্য চলে বলিয়া চাষীর হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে। সুতরা কুটির শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষ তাহার সামান্য আয়ের বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করি পারে। উপরন্তু, কোন বৎসর শস্যফলন না হইলে কৃষক জীবনধারণের জন্য কুটির হস্ত শিল্পকে শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের প্রাথমি উদ্দেশ্য হইল কর্মের সুযোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং গ্রাম্য অং ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ করিয়া তোলা।*

৮। পার্শ্বজীবিকা হিসাবে কুটির শিল্পের গুরুত্ব

বৃহদাকারে উৎপাদন সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব বা সুবিধাজনক বা কাম্য বলিয়া মনে কর ভুল। সূক্ষ্ম সূচিকার্য, হস্তীদন্তের কাজ, কারুকার্যখচিত শাল ও বস্ত্র প্রভৃতির মত দ্রব্যা বৃহদায়তন কারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার বিড়ি প্রস্তুত, বোতাম তৈয়ারি মক্ষিকা পালন প্রভৃতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন কারখানা শিল্পে মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কা করিতে পারে। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূ দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা কোন বিশেষ স্তরের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়ত শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেলের অং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে এবং পরে কারখানায় বিভিন্ন অংশের সাহায্যে সাইকেল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে সেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রসার সত্ত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকারের শিল্পে নিযু রহিয়াছে। এমনকি যে-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন বা হস্ত শিল্পের এবং বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, সে-ক্ষেত্রেও মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচন করিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকিলে বেকার-সমস্যার আ সমাধানের জন্য স্বল্প মূলধন অথচ অধিক শ্রম নিয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, হস্তবয়ন শিল্পের কথা উল্লেখ কর যাইতে পারে।†

৯। ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক

* **Second Five Year Plan**- ৪২৯ পৃষ্ঠা।

† ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার কারণ আলোচনা প্রসংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পের কয়েকটি সুবিধার আলোচনা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু করা হইয়াছে (২৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)। এখ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি হিসাবে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে।

আবার, উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে বৃহদায়তন কারখানা শিল্প এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা বিচার বিবেচনা করিবার সময় কেবল উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের (private cost) কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, সমাজকে কি ব্যয়ভার বহন (social cost) করিতে হয় তাহার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভংগি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহৎ কারখানা শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার অধিক। সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পের ফলে স্বাস্থ্য, আবাসগৃহ, বেকারত্ব নিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। সুতরাং সামাজিক ব্যয়ভারকে গণ্য করা হইলে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য অনেক কমিয়া যাইবে।*

। ক্ষুদ্র শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার স্বল্প

বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের দিক হইতেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাই প্রমাণিত হয়। বোরসোদির (Ralph Borsodi) মত বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোট দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদন সুবিধাজনক। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের বেলায় ব্যক্তিবিশেষ বা সমবায় সংগঠন কর্তৃক স্বল্পায়তনে উৎপাদন ব্যয়সংক্ষেপ করে।

। উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প

পরিশেষে, ভারতীয় ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব নির্দেশ করিবার সময় ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনার প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়করণের যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

২। বিক্রয় বাজার অত্যন্ত ব্যাপক

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলটিকে (The Ford Foundation International Planning Team) ১৯৫৩ সালে ভারতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, সেই বিশেষজ্ঞ দলও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের এই বৃহৎ বাজারের কথা উল্লেখ করে। দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে ৩০ কোটি লোক এবং সহরাঞ্চলে ৬ কোটি লোক শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের এক বিরাট বাজারের সন্ধান দেয়। দেশের বাহিরে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, এবং মধ্য প্রাচ্য দেশগুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং বিক্রয়-ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত করিতে পারিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব হইবে না।

* Report of the Fiscal Commission (1949-50) দ্রষ্টব্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগ সংস্থানের প্রসারসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখি গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কথা বিশেষভ উল্লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে যে দুইটি প্রধান পন্থা অবলম্বন কর তাহা হইল—(১) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা, এবং খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, তাঁত শিল্প, হস্তচালিত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃ সমস্যার বিচার-বিবেচন ও প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার কয়েকটি সর্ব ভারতীয় বোর্ড স্থাপন করা। অধিকতর সরক মনোযোগ এবং এই সকল সর্ব-ভারতীয় বোর্ডের বর্ণিত কার্যের ফলে উক্ত শিল্পসমূহ অনেকগুলিতে উৎপাদন ও নিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

উপসংহার

প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প

ইহার উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থ ব্যব বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) সুদক্ষ এবং সম্প্রসারণশীল অংশ হিসাবে দেখা হইয়া অর্থ-ব্যবস্থার এই অংশ একদিকে কৃষি এবং অপরদিকে বৃহদায় যন্ত্রশিল্পের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত। উপরন্তু, পরিকল্পনা সময়ে কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করা হইবে।† এ-সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অসুবিধা এবং তাহাদের প্রতিবিধান উপায় (Difficulties of Cottage and Small-scale Industr and their Remedies) : ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বি গুরুত্ব থাকিলেও কতকগুলি অসুবিধা বা দুর্বলতার দরুন এই শিল্পগুলি প্রসারলাভ করি পারিতেছে না। মূলধনের অভাব, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি বা কলাকৌশল, বি করণের অব্যবস্থা, শিল্পীদের অজ্ঞতা, উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যব অভাব হইল এই অসুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান।

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা : নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎ ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকায় কারিগরদের বিশেষ অসুবিধা ভো করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কাঁচামাল মিল বা কারখা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সময়মত এবং পর্যাপ্ত পরিমা উহা পাইবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁত

প্রধান প্রধান অসুবিধা

* Second Five Year Plan—৪১৯ পৃষ্ঠা।

† „ „ „ „—৪৩১-৩৩ পৃষ্ঠা।

ল মিলে বুনা সুতা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সুতাকল নিজস্ব কাপড়ের মিলের চাহিদা সর্বাগ্রে পূরণ করে। গত যুদ্ধের সময় সুতার দুষ্প্রাপ্যতার দরুন তাঁত শিল্পের উৎপাদন বিশেষ ব্যাহত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ থাকার জন্যও কাঁচামালের মূল্য অধিক হয়, এবং ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বাড়িয়া যায়। সুতরাং শিল্পিগণকে উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজন সমবায়িক পন্থার সাহায্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। সমবায়িক পন্থা যে শুধু কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে তাহাই নহে, উহাতে দামেও সুবিধা হয়।

কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধার ফলে মূল্য বৃদ্ধি

সমবায়িক পন্থায় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ

(২) পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব: কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। সম্বলহীন বলিয়া তাহারা মহাজন বা কারখানাদারের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। চড়া সুদ আদায় ব্যতীত কারখানাদার স্বল্প মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সর্তে ঋণদান করিয়া থাকে। এইভাবে শিল্পিগণ তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। অন্যান্য দেশে সমবায় সংগঠনগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকলা সংরক্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত সমবায়িক আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। অথচ এ সম্পর্কে সমবায়িক সংগঠন ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্টতর পন্থা নাই। রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শক্তিশালী সমবায় সংগঠন গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির এই সুপারিশ বিশেষ সমর্থনযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল (The Ford Foundation International Planning Team) সুপারিশ করে যে, (ক) সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে; (খ) প্রত্যেক রাজ্যেই রাজ্য অর্থ করপোরেশন (State Financial Corporation) প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অধিক পরিমাণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণদান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে, এবং (ঘ) সম্পত্তির ভিত্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার আলোচনা একটু পরেই করা হইবে। তাহার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের 'গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) কমিটি' [The Village and Small Industries (Second Five Year Plan) Committee] যাহা সাধারণত 'কার্ভে কমিটি' (The Karve Committee) নামে সুপরিচিত এই সম্পর্কে যে-সুপারিশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। কমিটির মতে, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও শিল্পস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যে অর্থসাহায্য করিবে তাহা রাজ্য অর্থ করপোরেশনের মাধ্যমে করা সমীচীন।

পুঁজির অভাবের ফল

পুঁজির অভাব দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দলের সুপারিশ

কার্ভে কমিটির সুপারিশ

এই করপোরেশন দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। যে-সর্তে বর্তমান শস্য-ঋণ (cro loans) দেওয়া হয় অনুরূপ সর্তে কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পকে চলতি মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (The State Bank of India) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে অ লক্ষ্য দিতে হইবে। এই প্রসংগে শ্রোফ কমিটির (The Shroff Committee) এক মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। সরকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত যে-সকল দ্র ক্রয় করে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে অযথা বিলম্ব করে ইহাতে স্বল্প সম্বলসম্পন্ন উৎপাদককে কার্যকরী মূলধন সম্পর্কে অসুবিধায় পড়িতে হ সুতরাং উৎপাদক যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার প্রাপ্য মূল্য পাইতে পারে তাহ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রোফ কমিটির মন্তব্য

(৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল: এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধু পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্যাপ্ত। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনাও সুসংগঠিত ক হয় নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধর পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, কুটির ও শিল্পগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। সুত স্বল্প উৎপাদন-ব্যয়ে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়বাজা সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শিল্পগুলিকে সংগঠিত করিতে হই আধুনিক উন্নত ধরনের ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন কর হইবে এবং দেশী ও বিদেশী বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রা ডিজাইন ও প্যাটার্ণের বিভিন্নতা প্রবর্তন করিতে হইবে।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল * কয়েকটি মূল্যবা সুপারিশ করে। এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারিটি শিল্প সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Institutes of Technology) স্থাপন প্রস্তাব করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শি কলাকৌশল এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করি গবেষণার ফলাফল, উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রভৃ সম্পর্কে তথ্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প ও কারিগরগণকে জানাইয়া দিবে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতি পরিকল্পনা দল 'ডিজাইন' বা নক্সার উন্নয়নের জন্য 'ডিজাইন' সম্পর্কিত একটি জা স্কুল প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করে।

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের সুপারিশ:

সম্প্রতি অবশ্য সর্ব-ভারতীয় খাদি এবং গ্রাম্য শিল্প-বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তপরিচা তাঁতশিল্প বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষাদান, কলাকৌশ..

---

* ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

[ডি]জাইন প্রভৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। মোটকথা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন [এব]ং প্রসার করিতে হইলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের প্রবর্তন, উত্তম ধরনের [দ্রব]্য উৎপাদন, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রদর্শনী ও প্রচারকার্যের ব্যাপক প্রসার [প্র]ভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত [ও] সহজলভ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও [উৎ]পাদনপদ্ধতির ব্যবহার কারিগরগণ যথাযথভাবে শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা সহ-উৎপাদন (training cum production) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য গবেষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির (The National Laboratories) সহিত যোগাযোগ [রা]খিয়া এই গবেষণাগারগুলিকে চলিতে হইবে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, [বি]জ্ঞানসম্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা অবশ্য প্রয়োজন হইলেও যন্ত্রিকরণের [ফ]লে বেকারের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

[বেকা]রের সংখ্যাবৃদ্ধির [প্রতি]রোধে সতর্কতা [অব]লম্বনের [প্রয়ো]জনীয়তা

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা: বিক্রয়করণের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আর [এ]কটি প্রধান অসুবিধা। একাধিক মধ্যবর্তী ব্যবসাদারের শোষণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের নিকৃষ্টতার দরুন উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পাইতে সমর্থ হয় না। এই অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়িক পন্থায় বিক্রয়করণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করা। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্থাপিত জাতীয় সমবায়িক উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ [বো]র্ড, সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী কৃষিজ [প]ণ্যের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও বিক্রয়করণের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যতীতও বিদেশে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব দেশী ও বিদেশী বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাকে বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থায় সম্প্রসারিত করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়করণের অসুবিধা হইতেছে—কারণ যে-পরিমাণে এবং যে নমুনা অনুযায়ী দ্রব্যাদি তাহারা চাহিতেছে তাহা সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আবার অন্যান্য দেশের ক্রেতারা ভারতীয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে খবরাখবর জানে না। সুতরাং অন্যান্য দেশে অবস্থিত শিল্প প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ, বাণিজ্য প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ ও প্রেরণ, বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, ব্যাপক প্রচারকার্য প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

[সম]বায়িক পন্থাই [বি]ক্রয়করণের একমাত্র [শ্রে]ষ্ঠ প্রতিকার

বিক্রয় বাজার প্রসারের বিভিন্ন পন্থা

দল বিদেশী বাজার প্রসারের জন্য 'রপ্তানী উন্নয়ন অফিস' (Export Development Offices) প্রতিষ্ঠা করিবার সুপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী স্থায়ী মিউজিয়াম, প্রচারকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যা

এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা

জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার এ বিষয় সচেতন হইয়াছে। তাঁত শিল্প, খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃ সংক্রান্ত বোর্ডগুলি বিক্রয় কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সরকা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ব্যাপারে উপযুক্ত ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজা দ্রব্যকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সহায় করিতে পারে।

(৫) বৃহৎ শিল্পজাত ও আমদানীকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা : অনেক ক্ষেত্রে কুটি বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন, তাঁত বস্ত্র) বৃহৎ শিল্পজাত বা বিদেশ হইতে আমদানীকৃ দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। এই অদক্ষতা বা অক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতার প্রতিবিধানের চূড়ান্ত ও আশু উপায়

কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের যে সহজাত দুর্বলতা তাহা নহে; বহুলাং ইহা হইল বহুদিনের অবহেলা ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার ফল সুতরাং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা। যে পর্যন্ত না প্রতিযোগিত ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে সে পর্যন্ত সাময়িকভাবে বৃহৎ শিল্পগুলির উ উৎপাদন শুল্ক (cess) বসাইয়া, কতিপয় ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনকে নিষিদ্ধ সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া, বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানির উপর বাধানিষেধ বসাইয়া, কুটি বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ বা ছাড় (rebates) বাদ দিয়া, কুটির ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনে অর্থসাহায্য করিয়া সরকারকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষ সচেষ্ট হইতে হইবে।

(৬) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন : কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এ বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষ

সমন্বয়সাধনের প্রকৃতি ও পন্থা

শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক বা সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে ক করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা আংশিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যা বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার বৃহৎ শিে জন্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারে—যে যন্ত্রপাতির জন্য স্ক্রু, বল্টু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যেই সহজে উৎপাদিত হইতে পা ১৯৫৫ সালে যে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (National Small Industri Corporation Ltd.) স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যতম কর্তব্য হইল ক্ষুদ্রায়তন বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে এই প্রকার সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা।

রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (The State and Cottage & Small-scale Industries) ঃ স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহার প্রসারসাধনের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার শিল্পনীতি সম্পর্কে যে-ইস্তাহার প্রকাশ করে তাহাতে জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the First Five Year Plan): তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য এবং ক্ষুদ্রায়তন ও হস্ত শিল্প গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগের সংস্থা হিসাবে বিশেষ স্থান পায়। প্রাচীন শিল্পগুলির সমস্যার ভালভাবে বিচার বিবেচনার জন্য কেন্দ্রে একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কলা-কৌশলের উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি পন্থার কথা ব্যতীত পরিকল্পনায় বলা হয় যে, যেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাগুলি হইল: (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ; (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধ করা, (৩) বৃহৎ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বসান; (৪) কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, এবং (৫) গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতির সমন্বয়সাধন। গ্রাম্য তৈলশিল্প, তিল তৈলের সাহায্যে সাবান তৈয়ারি, ধান ভানা, তালের গুড় তৈয়ারি, হস্তনির্মিত কাগজ, মক্ষিকা পালন প্রভৃতির উন্নয়ন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্পের প্রসারের জন্য কলাকৌশলের উন্নয়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, অর্থসাহায্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। খেলার সরঞ্জাম, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, কাঁসা পিতলের শিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নও পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়। সর্বক্ষেত্রে সমবায়ের সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয়িত হয় ৩৩.৮ কোটি টাকা।* এখন ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় সংক্ষেপে তাহাদের পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

এই সকল শিল্পের উন্নয়নকল্পে অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থা

সমবায়িক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ

ব্যয় বরাদ্দ

(১) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত রাজ্য সরকারসমূহের দায়িত্ব হইলেও প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচার বিবেচনা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কতকগুলি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রধান বোর্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

---

* India—1959

১। বিভিন্ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা

(ক) সর্ব ভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board): ১৯৫৩ সালে খাদি ও গ্রাম্য শিল্প উন্নয়নের জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, উৎপাদন, বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা এই বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে।

(খ) সর্ব ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board): তাঁতশিল্পকে সুসংগঠিত এবং তাঁতদ্রব্য বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই বোর্ড ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধানত তন্তুবায়দের মধ্যে সমবায় সংগঠন প্রসারের জন্য বোর্ড অর্থসাহায্য করে। বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। একটি নক্সা বা ডিজাইন বিভাগও খোলা হইয়াছে। বিদেশী বাজারে বিক্রয় যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে বিক্রয়-কেন্দ্র খোলারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) সর্ব-ভারতীয় হস্ত শিল্প বোর্ড (All-India Handicrafts Board): হস্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হস্তশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষত উৎপাদন এবং দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের প্রসারসাধন সম্পর্কে বোর্ড সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। ইহা ব্যতীত হস্তশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান ও অর্থসাহায্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বোর্ড পরামর্শ দান করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরে উন্নত ধরনের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন গুণাগুণের মান নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা, নূতন ডিজাইন ও প্যাটার্ণ প্রবর্তন এবং কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে। হস্তশিল্পের দ্রব্যাদিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড দিল্লীতে একটি সর্ব ভারতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিযাছে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড (Central Silk Board): ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৫২ সালে বোর্ডকে ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয় এবং সমস্ত রেশমশিল্পকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হয়। গত কয়েক বৎসরে রেশমশিল্প বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। অত্যধিক মূল্য ও বিদেশ হইতে আমদানির ফলে রেশমশিল্পের যথোপযুক্তভাবে প্রসার হয় না। বোর্ড কাঁচা রেশমের মূল্যহ্রাস, রেশম-শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে রেশমশিল্পের প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনাসমূহকে বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কলাকৌশল উন্নয়ন কমিটিও (a Technical Development Committee) নিযুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scal eIndustries Board): ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কার্যের সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য সম্প্রতি এই বোর্ড সংগঠি তহইয়াছে।

(চ) নারিকেল-কাতা শিল্প বোর্ড (Coir Board): কিছুদিন পূর্ব হইতে বিদেশী বাজারে নারিকেল-কাতাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় নারিকেল-কাতা শিল্প সংকটাবস্থায় পড়ে, এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশী ও বিদেশী বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা করিয়া যাহাতে এই শিল্পকে সংরক্ষিত করা যায় তাহার জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

রাজ্যগুলিকেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য অনুরূপ ধরনের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ খাদি ও গ্রামা শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and Village Industries Board), রাজ্য তাঁতশিল্প বোর্ড (The State Handloom Board) এবং রাজ্য কুটির শিল্প বোর্ড (The State Cottage Industries Board) রহিয়াছে।

পশ্চিমবংগে বিভিন্ন বোর্ড

(২) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহাতে প্রসারলাভের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং যাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার জন্য কতকগুলি নীতির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যার্থে বৃহৎ শিল্পের উপর সেস (cess) বসান হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁত ও খাদি শিল্পের উন্নয়নের জন্য মিলের কাপড়ের উপর প্রতি গজে শতকরা ২ ভাগ শুল্ক বসানর কথা পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। এইভাবে সেস হইতে প্রাপ্ত অর্থ তাঁত শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়।* দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সরকার কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-প্রসারের জন্য রিবেট বা রেয়াৎ (rebates) দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। যথা, সাধারণত তুলাতাঁত বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৬ ভাগ রিবেট বা রেয়াৎ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। খাদির ক্ষেত্রে এই রেয়াতের হার হইল অনধিক শতকরা ১৯ ভাগ। তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়—যেমন, তাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য মিলগুলি পূর্বের উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধুতি কাপড় উৎপাদন করিতে পারে।

২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা

(৩) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মূলধনের অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাও করা হয়। 'শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের' (State Aid to Industries Acts) অর্থসাহায্যের সর্তাবলীকে অধিকতর সহজ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য অর্থ করপোরেশন' (State Financial Corporations) স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর

৩। মূলধনের অভাব দূরিকরণের প্রচেষ্টা

* ২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ করপোরেশনের সংখ্যা ছিল মোট ১২। রিজার্ভ ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ যোগান দিয়াছে ইহা ব্যতীত ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন লিমিটেড' (National Small Industries Corporation Ltd.) নামে এক সংস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। এই করপোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল: (ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিকট হইতে যাহাতে সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটা মোটা অংশ ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করা; (খ) প্রাপ্ত ক্রয়নির্দেশ যাহাতে পূরণ করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে ঋণদান ও কলাকৌশল বিষয়ে সাহায্য করা; (গ) যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বা দ্রব্যের অংশবিশেষ উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। ইহা ছাড়া যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ব্যাংক এবং অনুরূপ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সহজে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য করপোরেশন গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারে।* রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণের সাহায্যার্থে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে অর্থ-সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ও উহার কার্যাবলী

এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ৯টি নির্বাচিত অঞ্চলে 'পাইলট স্কীমের' (Pilot Scheme) প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ঐ 'স্কীম' ৩৫টি কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে রাজ্য ব্যাংকের যেখানে যেখানে শাখা আছে সেই সকল কেন্দ্রেই স্কীমটি চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে এই কার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা হইবে।

পাইলট স্কীম

(৪) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যাদির সরকারী ক্রয় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সরকারী ক্রয়নীতির বিচার-বিবেচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি (Stores Purchase Committee) নিযুক্ত করিয়াছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকারের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহের ভার একমাত্র গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকেই দেওয়া হয়।

৪। ক্রয় ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

(৫) ভারতীয় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল ১৯৫৩ সালে ভারতে আসে এবং ১৯৫৪ সালে এক রিপোর্ট দাখিল করে।

---

* Report on Banking and Currency for 1954-55—৫১ পৃষ্ঠা

এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল চারিটি কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান Regional Small Industries Service Institute or Regional Institutes of Technology), একটি বিক্রয়করণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (A Marketing Service Corporation) এবং একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (A Small Industries Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কায হইল কলাকৌশল ও সংগঠনের উন্নয়ন, ঋণ ও অর্থ সংগ্রহ, বিক্রয়করণ, সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন, প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা। প্রতিষ্ঠানগুলির কাযের সমন্বয়সাধনের ভার হইল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডের উপর।

৫। আন্তর্জাতিক দল ও উহার সুপারিশ

পরিকল্পনাধীন সময়ে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ফরিদাবাদে চারিটি কলা-কৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশনও স্থাপিত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।* ইহার উপর খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নকল্পে কলা-কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে।

(৬) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমাজোন্নয়ন ব্লকগুলিতে একজন করিয়া 'ব্লক শিল্পোন্নয়ন কর্মচারী' (Block Industrial Development Officer) নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক ব্লকে হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন-দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত।

৬। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ৩০ কোটি টাকা, কিন্তু মোট ব্যয় হয় ৩৩·৬ কোটি টাকা। এই ব্যয় ও অন্যান্য পন্থা অবলম্বনের ফলে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান চারিটি নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। বিভিন্ন বোর্ড তাহাদের বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

সরকারী ক্রয়নীতি কমিটির সুপারিশ অনুসারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের সরকারী ক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য দিন দিন অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। বিক্রয়-সংগঠনের উন্নতির জন্য সাধারণ বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* Report on Banking and Currency for 1955-56—৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the Second Five Year Plan)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্তর কার্যক্রম

Plan) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পের উন্নয়নকল্পে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম হইতে অনেকাংশে বৃহত্তর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে প্রধানত ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নিযুক্ত 'গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) কমিটি' বা কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া। সুপারিশ করিবার সময় কার্ভে কমিটি তিনটি প্রধান লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়—যথা,

কার্যক্রমের তিনটি প্রধান লক্ষ্য

(ক) কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে শিল্পে নিয়োগের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ;

(খ) পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে ,

(গ) বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ-ব্যবস্থা (decentralised society) এবং ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

১। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ ব্যবস্থা

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ ব্যবস্থা বলিতে কেবল পদ্ধতি বা কৌশলগত পরিবর্তনই বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল, কৌশলগত পরিবর্তন এইভাবে করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শিল্প একক যেন অর্থ নৈতিক কর্মসম্পাদনে সমর্থ হয়। ইহার প্রয়োজন হইল "উন্নয়নশীল ব্যাপক গ্রাম্য অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তিতে পিরামিডের ন্যায় শিল্পগত সংগঠন।"

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে নানাভাবে রক্ষা করা হইলেও, সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইল উক্ত বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ক্ষেত্রাংশকে (decentralised sector) স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা এবং উহাকে বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করা। সুতরাং রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান মাধ্যম হইল পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিল্পগত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় এইরূপ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এই অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়িক ভিত্তি

দ্বিতীয়ত, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কার্যক্রমের সমতার (Common Production Programme) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনটি প্রধান পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল—যথা, (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধকরণ, এবং (৩) বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্ বা শুল্ক বসান। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই পন্থাগুলি

২। উৎপাদন কার্যক্রমের সমতা

বশেষভাবে অনুসৃত হইবে। ইহার উপর সরাসরি উৎপাদনের উপর অর্থসাহায্য subsidy on production) অথবা বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ (rebates on sales) দেওয়ারও ব্যবস্থা কর হইবে। তাঁতশিল্পজাত ও খাদিদ্রব্যের উপর রেয়াতের দরুন মোট ২৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

৩। সরকারী ক্রয়নীতি

তৃতীয়ত, সরকারী ক্রয়নীতিকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আরও অনুপন্থী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হইবে।

৪। বিক্রয়করণ ব্যবস্থার সংগঠন

চতুর্থত, সমবায় পন্থা এবং সরকারী ক্রয়নীতি ছাড়াও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা বিক্রয়করণ ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করা হইবে।

৫। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার

পঞ্চমত, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহকে যথাসম্ভব এই বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়োগ করা হইবে।

৬। বাসস্থানের উন্নয়ন

ষষ্ঠত, শিল্পিগণের বাসস্থানের উন্নয়ন হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭। ঋণ ও মূলধন সরবরাহ

সপ্তম স্থলে আছে, ঋণ ও মূলধন সরবরাহের কথা। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পিগণের পক্ষে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য স্বল্পকালীন বা চলতি মূলধন ছাড়াও সমবায়িক সমিতির শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই অর্থ বা ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল রিজার্ভ ব্যাংক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রাজ্য অর্থ করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সমবায়িক ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি সংহতিপূর্ণ নীতির। পূর্বোল্লিখিত 'পাইলট পরিকল্পনা'র দ্বারা ইতিমধ্যেই এই দিকে কার্যারম্ভ করা হইয়াছে।

অষ্টমত, শুধু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (গ্রাম্য শিল্প বাদ দিয়া) সম্বন্ধেও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে

৮। শিল্প শিক্ষার সম্প্রসারণ

প্রথমত, 'শিল্প-শিক্ষা সম্প্রসারণ সেবার (Industrial Extension Service) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সেবার কর্মিগণ কারিগরদিগকে নূতন নূতন কলাকৌশল অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, চারিটি আঞ্চলিক শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Regional Institute of Technology) উপর ১২টি উচ্চ শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি শাখা প্রতিষ্ঠান এবং ৬২টি শাখা শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহার উপর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া 'শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান' (Institute of Technology) স্থাপন করা হইবে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় উপরি-উক্ত শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হয় এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলি হইতে শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি শিল্পগত উপনিবেশ (Industrial Estates) প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি উৎপাদনে সমতা

আনয়ন এবং মালমশলা ও যন্ত্রপাতির সুযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শিল্প-উপনিবেশের উদ্দেশ্য হইল কতক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এককে (small-scale units) অবস্থ বৈদ্যুতিক শক্তি, জল সরবরাহ, রেলপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। এই শিল্প-উপনিবেশের অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে কার্ভে কমিটি সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, ইহাদের স্থাপনের ফলে যেন গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বিশেষ স্থানান্তরিকরণ না ঘটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ৯২টি শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করিবার কথা। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৭টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বাকী ৬৫টির স্থাপন কার্য শেষ দুই বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং ছোট ছোট সহরের নিকটেই ইহাদের স্থাপন করা হইতেছে, নগর বা মহানগরের নিকটে নহে।

শিল্পগত সম্প্রসারণ সেবা

৯। শিল্প উপনিবেশ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয় করা হইয়াছিল ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে ২০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে অবশ্য অম্বর চরকার উপর কোন বরাদ্দ-ব্যবস্থা নাই। অম্বর চরকা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বরাদ্দ এবং অম্বর চরকা লইয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা সমাপ্ত হইলে ঘোষিত হইবে। সুতরাং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে মোট ব্যয়-বরাদ্দ উক্ত ২০০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে।

ব্যয়-বরাদ্দ

অম্বর চরকা (Ambar Charka): তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খস ছাপাখানার পর্যায় পর্যন্ত বাহির হয় নাই। তবে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হইয় তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও ক শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার কম হইবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কার্য সংক্রান্ত আলোচনা পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে 'অম্বর চরকা' সম্বন্ধে আরও দু'এ কথা বলা প্রয়োজন। সুতাকাটা শিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত করা এবং ইহার উৎপাদন-হ্রাস করার প্রচেষ্টায় বহুদিন ধরিয়া যে-পরীক্ষা চালাইয়া আসা হইতেছে তাহারই ফ অম্বর চরকার জন্ম। ১৯৫৬ সালের অম্বর চরকা অনুসন্ধান কমিটি (Ambar Chark Enquiry Committee) অম্বর চরকা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কমিটি বলে যে, চরম চরকার প্রবর্তনের ফলে খাদি শিল্পের সুতা সংগ্রহের সমস্যা অনেকাংশে মিটিবে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানেরও বেশ কিছু ব্যবস্থা হইবে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৭৫ হাজার অম্বর চরকা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে। ঠিক হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ১৫ কোটি গজ কাপড় অম্বর চরকার সূতা দিয়া তৈয়ারি করা হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ গজের মত কাপড় অম্বর চরকার সূতা হইতে বয়ন করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

প্রশ্নোত্তর

1. What role would you assign to cottage and small-scale industries in the economy of India ?

[ইংগিত : শিল্পোন্নত দেশের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে : (১) নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। (২) মূলধনের স্বল্পতা এবং বৃহৎ শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করাই সমীচীন। (৩) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান হিসাবেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত। (৪) সংগঠন-দক্ষতা ও প্রয়োগ-কৌশলের দিক হইতে কুটির শিল্পের প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ। (৫) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কেন্দ্রীভূত শিল্প-সংগঠনের বিপদ হইতে মুক্ত। (৬) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে আর্থিক বৈষম্যের অপসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব। (৭) কৃষিকার্যের পরিপূরক হিসাবে কুটির ও হস্ত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। (৮) অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিতে সমর্থ। (৯) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সামাজিক ব্যয়ভার (social costs) অপেক্ষাকৃত কম। (১০) ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যয়ও অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কম। (১১) বাজারের দিক হইতেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনাও রহিয়াছে যথেষ্ট। ২৮৭-২৯২ পৃষ্ঠা]

2. On what lines and by what methods would you like to devolop our ttege and small-scale industris so that they may play a useful part in India's nomic development ? (C.U. B.A. 1959.) [২৯২-২৯৬পৃষ্ঠা]

3. What measures have been taken by the Government to help cottage and small-scale industries under our planned economy ? [২৯৭-৩০৪ পৃষ্ঠা]

4. What are the reasons for the survival of cottage and small-scale industries side by side with large-scale industries in India ? [২৭৯-২৮০ পৃষ্ঠা]

5. Examine the present position of cotton handloom industry in India. What measures have been adopted for its improvement ? [২৮২-২৮৬ পৃষ্ঠা]

6. Briefly describe the development of cottage and small-scale industries under the Second Five Year Plan. [৩০২-৩০৪ পৃষ্ঠা]

7. Discuss how far it is practicable to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of small-scale and cottage industries. (C. U. B. Com. 1958)

[ইংগিত: এইরূপ ভোগ্যপণের মধ্যে তাঁতের কাপড়, গুড়, সাবান, কাঁসা-পিতলের বাসন ইত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে ইহাদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে অন্তরায়ও বহুসংখ্যক। এই সকল অন্তরায় দূর করা এক প্রকা দীর্ঘকালীন ব্যাপার; অতএব রাতারাতি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি বিশে সম্ভব হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তুলাতাঁত শিল্পের দ্বারা বস্ত্র উৎপাদ বৃদ্ধি মাত্র ৫০ কোটি গজ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ২৮৯ এবং ২৯২ পৃষ্ঠা]
